স্মৃতিকথা

তৃতীয় পর্ব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরি
৪২, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা-৬

এক বৎসরের অধিক কাল হতে সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রে 'স্মৃতিকথা' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। যে পর্যন্ত লেখবার কল্পনা নিয়ে লেখা আরম্ভ করেছিলাম, তা শেষ হতে আর সামান্য কিছুদিন লাগবে। স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে 'স্মৃতিকথা' প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে; তৃতীয় পর্বও প্রকাশিত হ'ল। তৃতীয় পর্বের উদ্বর্ত যেটুকু লেখা 'দেশে' প্রকাশিত হয়েছে এবং যা প্রকাশিত হতে বাকি আছে, উভয় মিলে হবে চতুর্থ পর্বের বিষয়বস্তু।

চতুর্থ পর্ব শেষ হওয়ার পরও লিখিত হবার উপযুক্ত অনেক কথাই বাকি থেকে যাবে। হয়তো, এমন কিছু কিছু কথাও, যা প্রকাশিত কোনো কোনো কথার পরিবর্তে লিখিত হ'লেও মন্দ হ'ত না। সেই জন্য চতুর্থ পর্বেই দাঁড়ি না টানতে অনেকেই আমাকে অনুরোধ করছেন। কিন্তু জীবনেও তো অনেক সময়ে পরিপূর্ণতার অর্ধপথেই দাঁড়ি টানতে হয়। সুতরাং, চতুর্থ পর্বের শেষে দাঁড়ি টানলে ছন্দ-পতন হবে না।

কিছুকাল পূর্বে 'আমার দেখা তিনজন' নামে একটি পুস্তক রচিত করবার ইচ্ছা হয়েছিল। তিনজনের প্রথম জন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিতীয় জন চিত্তরঞ্জন এবং তৃতীয় শরৎচন্দ্র। এঁদের মধ্যে প্রথম দুজনের সঙ্গে কার্যগতিকে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, আর শরৎচন্দ্র আমার আত্মীয়।

পুস্তকের নাম শুনে আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন; আর প্রলুব্ধ হয়েছিলেন কয়েকজন প্রকাশক। তথাপি, যে কারণেই হোক, বইখানা শেষ পর্যন্ত লেখা হয়ে ওঠে নি। 'স্মৃতিকথায়' কিন্তু 'আমার দেখা তিনজন' পরিকল্পিত পুস্তকের অধিকাংশ

বক্তব্যই অধিকার বিস্তার করেছে। শরৎচন্দ্রের বিষয়ে প্রধানত প্রথম পর্বে; চিত্তরঞ্জনের বিষয়ে তৃতীয় পর্বে; রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে করবে চতুর্থ পর্বে। সুতরাং, প্রথম পর্বকে শরৎচন্দ্র-প্রধান, তৃতীয় পর্বকে চিত্তরঞ্জন-প্রধান, এবং চতুর্থ পর্বকে রবীন্দ্রনাথ-প্রধান খণ্ড বলা যেতে পারে।

পরিশেষে একটি কৈফিয়ৎ দেবার আছে। সমগ্র 'স্মৃতিকথা'র মধ্যে মাত্র এক-আধস্থানে, চিত্তরঞ্জন-প্রসঙ্গে, সামান্য অংশের পুনরুক্তি পরিলক্ষিত হতে পারে। এরূপ হয়েছে একই পরিবেশের সাহায্যে দুটি বিভিন্ন ঘটনাকে পরিস্ফুট করবার প্রয়োজনে। সুতরাং মার্জনীয়।

৩৬-৫বি, বালিগঞ্জ প্লেস
কলিকাতা ১৯
১লা ফাল্গুন, ১৩৫৮

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

কল্যাণীয়

শ্রীমান অমলপ্রসাদ, বিমলকুমার ও

কমলকুমার পুত্রদিগকে

দিলাম

স্মৃতিকথা

তৃতীয় পর্ব

এই লেখকের বই :

মায়াবতী পথে	৩৷৹
স্মৃতিকথা—১ম পর্ব	৩৷৹
স্মৃতিকথা—২য় পর্ব	৩৷৹
স্মৃতিকথা—৩য় পর্ব	৩৷৹
অভিজ্ঞান (২য় সংস্করণ)	৫৲
অন্তরাগ (২য় সংস্করণ)	৪৷৹
বিদুষী ভার্যা (৩য় সংস্করণ)	৩৷৹
যৌতুক (২য় সংস্করণ)	৪৲
শশিনাথ (৩য় সংস্করণ)	৪৷৹
অমলা (২য় সংস্করণ)	৩৷৹
সোনালী রঙ (২য় সংস্করণ)	৪৷৹
রাজপথ (৫ম সংস্করণ)	৪৲
ছদ্মবেশী (৩য় সংস্করণ)	৩৲
অমূল তরু (৩য় সংস্করণ)	৩৲
দিক্‌শূল (২য় সংস্করণ)	৪৷৹
আশাবরী (২য় সংস্করণ)	৪৲
রাতজাগা (২য় সংস্করণ)	১৷৹
রাজপথ (নাটক)	২৲
নাস্তিক	৩৲
কমিউনিস্ট্ প্রিয়া	২৸৹
নবগ্রহ	১৷৹
বৈতানিক	১৷৹
গিরিকা	১৷৹
ভারত-মঙ্গল (নাটিকা)	১৷৹

স্মৃতিকথা

তৃতীয় পর্ব

১

আমার বারো বৎসরের স্বল্পকাল ওকালতী জীবনের মধ্যে যে-কয়টি বড় আকারের প্রথম শ্রেণীর মকদ্দমায় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ লাভ করেছিলাম, তার মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে বিখ্যাত লছমীপুর মকদ্দমা নিঃসংশয়ে সর্বপ্রধান।

একজন আড়াই বৎসরের উকিল আমার প্রতি সে মকদ্দমায় লক্ষ্মী আশাতীত কৃপাবর্ষণ করেছিলেন, সেজন্য বলছি নে; অতবড় বিরাট দিগ্‌গজ মামলায় কাজ করবার সুবিধা পেয়ে ওকালতী ব্যবসায়ের খাঁজ-খোঁজ কলাকৌশল আয়ত্ত করবার প্রচুর সুযোগ পেয়েছিলাম, সেজন্যেও বলছি নে; সে মামলায় 'সাগর-সঙ্গীতে'র কবি চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত পরিচিত এবং অন্তরঙ্গ হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম, প্রধানত সেই কারণেই বলছি।

যে অপরিমিত সৌহৃদ্য ও ভালবাসা চিত্তরঞ্জনের কাছে অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলাম, তা আমার নিজের কোন্ গুণের প্রভাবে, সে কথা নির্ণয় করবার জন্য যখন আত্মানুসন্ধান করি, তখন একমাত্র অদৃষ্টের সুপ্রসন্নতা ভিন্ন আর কিছুই হাতে ঠেকে না। বস্তুত, অত বড় সৌভাগ্যের ব্যাখ্যা একমাত্র অদৃষ্টের আনুকূল্য ভিন্ন আর কিছু দিয়েই করা যায় না।

১৯১৫ সালের জুলাই মাসের শেষভাগে ভাগলপুরে লছমীপুর মকদ্দমা উপলক্ষে চিত্তরঞ্জনের সহিত আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে। তার মাস আড়াই পরে, অর্থাৎ অক্টোবর মাসের ৮ই তারিখে পূজার ছুটিতে মায়াবতী যাওয়ার পথে ট্রেনহীন জনতাহীন কিউল স্টেশনের উন্মুক্ত আপ্ প্ল্যাটফর্মে পাশাপাশি পাদচারণা করতে করতে চিত্তরঞ্জন আমাকে বলেছিলেন, "উপেনবাবু, আমার মনে হয়, পূর্বজন্মে আপনি আমার আপনজন ছিলেন।"

এত বড় কথার উত্তরে আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা নির্গত হতে পারে নি। কিন্তু মুখের ভাষাই তো মানুষের একমাত্র ভাষা নয়,—আমার নির্বাক ভাষার উত্তর তিনি নিশ্চয় শুনতে পেয়েছিলেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

আমার সত্তর বৎসর বয়সের সুবিস্তীর্ণ জীবন-পরিধির মধ্যে এমন সুদূরপ্রসারী আত্মীয়তার দাবি খুব বেশি লোকের মুখে শোনবার সৌভাগ্য হয় নি।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রতি চিত্তরঞ্জনের অপরিসীম স্নেহের পরিচায়ক আর একটি যৎপরোনাস্তি করুণ কাহিনী মনে পড়ছে।

১৯২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের কথা; অর্থাৎ, 'দেশবন্ধু'র মহাপ্রয়াণের মাস চারেক আগেকার ঘটনা। দেশোদ্ধারের সুতীব্র দুশ্চিন্তা এবং কঠোর পরিশ্রমের তাড়নায় নিরুপায়ভাবে চিত্তরঞ্জনের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে। চিকিৎসায় কোনো ফল হচ্ছে না, বায়ুপরিবর্তনও কিছুমাত্র সাড়া দিচ্ছে না। চিত্তরঞ্জনের অনুজ শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ তখন পাটনা হাইকোর্টের জজ। সপরিবারে চিত্তরঞ্জন তাঁর গৃহে অবস্থান করছেন।

হাইকোর্টের একটা আপীলের কাজে ভাগলপুর থেকে পাটনায়

এসেছি। আমার দাদা লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তখন পাটনা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। প্রত্যুষে দাদার গৃহে পৌঁছে স্নান সেরে চা পান ক'রে রওনা হলাম প্রফুল্লরঞ্জনের গৃহের উদ্দেশে। চিত্তরঞ্জন পাটনায় এসে তাঁর গৃহে অবস্থান করছেন, সে কথা আমার জানা ছিল।

পৌঁছলাম যখন, তখন সাড়ে দশটা বাজে। জজ সাহেব কোর্টে গিয়েছেন এবং চিত্তরঞ্জন স্নানের ঘরে প্রবেশ করেছেন;—স্নানের পর আহারে বসবেন। বুঝলাম, অতটা খেয়াল না ক'রে মনের আবেগে অসময়ে হাজির হয়েছি। ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে বাসন্তী দেবীকে বললাম, "এখন যাই, ও-বেলা আসব অখন।"

বাসন্তী দেবী বললেন, "দাঁড়ান, আগে ওঁকে খবর দিই। ওঁকে না জানিয়ে আপনাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে শুনলে রাগ করবেন।"

আমার আসার কথা অবগত হয়ে বাথরুম থেকেই চিত্তরঞ্জন আমাকে অপেক্ষা করবার জন্য ব'লে পাঠালেন। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি হাসতে হাসতে এসে দাঁড়ালেন। হাসতে হাসতে বটে,—কিন্তু মেঘে-ঢাকা সূর্যকরের মতো স্তিমিত সে হাসি দেখে আমার চোখে জল ভ'রে এল। সেই বলিষ্ঠ উজ্জ্বল উন্নত দেহ কৃশ হয়ে গেছে। সমস্ত অবয়ব-জোড়া দারুণ পরিশ্রান্তির এমন একটা ঢিলা ভাব যে, দেখেই মনে হয়, জীবন-নদীর উপকূল থেকে ভাঁটার টানে জল নেমে যেতে আরম্ভ করেছে। আর যে কোনো দিন জোয়ার এসে দু কূল উপচে দেবে, মনে হ'ল, সে আশা দুরাশা।

আনন্দোচ্ছল মুখে চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, "কবে এলেন উপেনবাবু?"

বললাম, "কবে নয়, আজই ঘণ্টা তিনেক আগে।"

"আসবার উপলক্ষ?"

বললাম, "একটা আপীলের consultation-এ (পরামর্শ-বৈঠকে) যোগ দিতে। তা ছাড়া, আপনাকে দেখতে।"

"কন্সাল্‌টেশন কবে?"

"আজ সন্ধ্যাকালেই হবার কথা ছিল, কিন্তু একদিন পেছিয়ে গেছে; কাল সন্ধ্যার পর হবে।"

চিত্তরঞ্জনের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল; বললেন, "ভালই হয়েছে; আজ তা হ'লে সমস্ত দিন আপনি আমাদের এখানে বন্দী।"

ঈষৎ কুণ্ঠিতস্বরে বললাম, "কিন্তু সে বিষয়ে একটু বাধা আছে।"

বাধার কথা অনুমান করতে চিত্তরঞ্জনের বিলম্ব হয় নি; তথাপি স্মিতমুখে বললেন, "কি বাধা?"

বললাম, "ভাত খেয়ে আসি নি।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "ওটা অনতিক্রমণীয় বাধা নয়; ওর ব্যবস্থা এখানে হতে পারবে।"

"তা ছাড়া, মেয়েরা না খেয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবেন।"

"তার ব্যবস্থা করাও কঠিন হবে না।" বাসন্তী দেবীর প্রতি দৃষ্টি-পাত ক'রে বললেন, "বাসন্তী, উপেনবাবুকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে লালমোহনবাবুর বাড়ি পাঠিয়ে দাও।" আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন, "লিখে দিন—এবেলা এখানে আহার করবেন আর বৈকালে চা খেয়ে তারপর বাড়ি যাবেন।"

কুণ্ঠিতভাবে সামান্য একটু আপত্তি করলাম। বললাম, "দেখুন, আমি ভাল ক'রে চা-খাবার খেয়ে এসেছি, এখন অন্তত ঘণ্টা-দুই কিছু না খেলেও অসুবিধা হবে না। আপনি খেতে বসুন, আমি আপনার সঙ্গে গল্প করি।"

প্রবল জলস্রোতে বালুকা-বাঁধের ন্যায় আমার আপত্তি অবলীলায়

সহিত ভেঙে গেল। আপত্তি খণ্ডিত করবার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকতে পারে, তেমন কোনো ভাবকে আদৌ আমল না দিয়ে চিত্তরঞ্জন সরাসরি বললেন, "বাসন্তী, আমার আর উপেনবাবুর খাবার দিতে বল।"

অগত্যা হার মানতে হ'ল—ভাগলপুরে সুদীর্ঘ আট মাস কাল লছমীপুর মামলা চলবার সময়ে যেমন হার বহুবার মানতে হয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে চিত্তরঞ্জন ও আমি সামনাসামনি আহারে বসলাম। আমার ভাগে মাছ, মাংস, বিবিধ ব্যঞ্জন এবং অন্যান্য সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্যের সমাবেশ; চিত্তরঞ্জনের ভাগে রোগীজনোচিত সহজপাচ্য সামান্য কয়েকটি আহার্যদ্রব্য। কিন্তু তার মধ্যে একটি ডিশে এমন-এক উপাদেয় বস্তুর ব্যবস্থা, যা শুধু রোগীরই নয়, ভোগীর পর্যন্ত লোভ উদ্রিক্ত করে। বড় ডিশ-জোড়া একটি বৃহৎ কইমাছ; ওজনে পোয়া দেড়েকের কম হবে না।

পাটনায় কইমাছ দুষ্প্রাপ্য বস্তু; বিশেষত অত বড় আকারের। কলকাতা থেকে কয়েকদিন অন্তর কইমাছ আসে। যদি পঁচিশটা পাঠানো হয়, পথে আসতে গোটা দশেক মারা পড়ে। বাকিগুলো যত্ন-সহকারে জীইয়ে রাখা হয়। তার মধ্যেও প্রতিদিন এক-আধটা ক'রে মরতে থাকে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত হয়তো দেখা যায়, পঁচিশটা মাছের মধ্যে কাজে লাগল মাত্র গোটা দশেক। যৎপরোনাস্তি অল্প মশলার সংযোগে বিশেষ এক প্রক্রিয়া অবলম্বনে রোগীর উপযুক্ত ক'রে প্রতিদিন একটি ক'রে মাছ রাঁধা হয়। এই খাদ্যদ্রব্যটি চিত্তরঞ্জনের পক্ষে শুধু উপকারীই নয়, নিতান্ত অল্প কয়েকটি খাদ্যবস্তুর মধ্যে এইটিই তিনি রুচির সহিত আহার করেন।

খেতে ব'সেই চিত্তরঞ্জন বললেন, "বাসন্তী, আজ কইমাছটা উপেন-বাবুকে দাও।"

এই নিরতিশয় অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত প্রস্তাবে আমি তো বিহ্বল হয়ে উঠলাম। প্রবল প্রতিবাদের স্বরে বললাম, "না, ও-মাছ আমি একবিন্দু স্পর্শ করব না। আমার এত রকম ভাল ভাল খাবার জিনিস থাকতে আমাকে আপনার পথ্যের ও-মাছ খাওয়ালে আমাকে শাস্তি দেওয়াই হবে।"

আমার প্রতিবাদে মৃদুভাবে যোগ দিয়ে বাসন্তী দেবীও বললেন, "তা ছাড়া, ও-রকম বিনা মশলায় রাঁধা মাছ উপেনবাবুর ভাল লাগবেই বা কেন? ও-মাছ তুমিই খাও।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "বিনা মশলায় রাঁধা মাছ কত ভাল লাগে, উপেনবাবু আজ তা পরীক্ষা ক'রে দেখুন। যদি ভাল না লাগে আর কোনদিন ওঁকে না খাওয়ালেই চলবে। আজ কিন্তু ওঁকে খেতেই হবে।"

কোনো বিষয়ে প্রবৃত্ত হ'লে তা থেকে চিত্তরঞ্জনকে নিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য ব্যাপার, সে কথা আমার অবিদিত ছিল না। পরাজয়ের নিশ্চয়তা দেখে আপোস-মীমাংসার প্রস্তাব তুললাম; বললাম, "তা হ'লে ভাগাভাগি ক'রে খাওয়া যাক।"

মাথা নেড়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "একখানা মাছ ভাগাভাগি হয় না। ল্যাজা-মুড়ো দুই আপনাকে খেতে হবে।"

অগত্যা খেতেই হ'ল। কিন্তু সে যে কত দুঃখে আর কত আনন্দে খেয়েছিলাম, সে কথা শুধু আমার অন্তর্যামীই জেনেছিলেন।

সেদিন সেই মাছ খাওয়ানোর মধ্য দিয়ে চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ের অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পেয়ে ধন্য বোধ করেছিলাম। একখানা কই-মাছ খাওয়ানো অসতর্ক দৃষ্টিতে হয়তো সামান্য ব্যাপার ব'লেই মনে হবে। কিন্তু জীবনে আমরা অনেক সময়েই সামান্য ব্যাপারের মধ্য দিয়ে অসামান্য ব্যাপারের সন্ধান লাভ করি।

আহার শেষ হ'লে বসবার ঘরে গিয়ে বসলাম। মিনিট দুই পরে চিত্তরঞ্জন এসে পাশের সোফায় উপবেশন করলেন। আমি বললাম, "এবার আপনি বিশ্রাম করুন।"

চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি করবেন?"

বললাম, "কাগজ-টাগজ কিংবা বই-টই নিয়ে একটু পড়ি-টড়ি।"

মৃদু হাসি হেসে চিত্তরঞ্জন বললেন, "আপনিও আমার পাশে অবস্থান ক'রে বিশ্রাম করবেন।"

পাশে অবস্থান করে! সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়?"

"লতানিকুঞ্জে।" ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন। তারপর দাঁড়িয়ে বললেন, "চলুন, আমাদের বিশ্রামাগারে গিয়ে বসা যাক।"

বারান্দার সিঁড়ি ভেঙে ময়দানে অবতরণ ক'রে বাঁ দিকে একটি লতাগৃহ (Green house)। তার মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখি, পাশাপাশি দুখানা ঈজি-চেয়ার পাতা। চেয়ার দুটি অধিকার ক'রে আমরা দুজনে বসলাম। চিত্তরঞ্জনের মুখে শুনলাম, চিকিৎসকের উপদেশে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর এই লতাকুঞ্জে তিনি দু-তিন ঘণ্টা অবস্থান করেন। হরিদ্বর্ণ লতাজাল ভেদ ক'রে যে প্রশমিত সূর্যরশ্মি এবং উত্তাপ নিম্নে অবতরণ করে, কিছুকাল তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকা ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের পক্ষে বিশেষভাবে উপকারক ব্যবস্থা।

নানা বিষয়ে কথোপকথন করতে করতে এক সময়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "এ সব কষ্ট সহ্য হয় উপেনবাবু, কিন্তু যে দারুণ insomnia-য় (নিদ্রা-হীনতায়) ভুগছি, তার কষ্ট অসহ্য। রাত্রি বারোটা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কতকটা ঘুম হয়। কিন্তু তার পর থেকে সকাল হওয়া পর্যন্ত এক মিনিট চোখ বুজতে পারি নে। সমস্ত বাড়ি নিঃসাড় নিঃশব্দ; যে যার নিজ নিজ শয্যায় সুখনিদ্রায় মগ্ন;—শুধু আমি নিদ্রাহীন হয়ে শীতের দীর্ঘ

রাত্রি বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কাটাচ্ছি,—স্নায়ুর ওপর এ যে কত বড় পীড়ন, সে কথা অপরে বুঝতে পারবে না।"

আমি বললাম, "আমি বুঝতে পারছি। আমার ঠিক আপনার মতই ইন্‌সম্‌নিয়া হয়েছিল। সাধু-নির্দিষ্ট এক অতি সহজ প্রক্রিয়ার ফলে প্রথম দিন থেকেই আমি সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হই। পালন করবেন আপনি সে প্রক্রিয়া? অত্যন্ত সহজ সরল প্রক্রিয়া—পালন করতে আধ মিনিট সময়ও লাগে না।"

অতিশয় আগ্রহসহকারে চিত্তরঞ্জন বললেন, "নিশ্চয় পালন করব। কি প্রক্রিয়া, বলুন।"

বললাম, "দুটি শর্ত আছে কিন্তু। নিষ্প্রয়োজনে এ প্রক্রিয়ার কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারবেন না। কিন্তু নিদ্রাহীনতায় কেউ কষ্ট পাচ্ছে জানলে তাকে নিশ্চয়ই প্রক্রিয়ার কথা জানাবেন। তারপর সে যদি পালন করতে উৎসুক হয়, তখন তাকে প্রক্রিয়াটি শিখিয়ে দেবেন।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "দুটি শর্তই যুক্তিপূর্ণ;—দুটিতেই স্বীকৃত হলাম।"

দু-চার কথায় চিত্তরঞ্জনকে প্রক্রিয়াটি বুঝিয়ে দিলাম।

প্রক্রিয়াটি বুঝে নিয়ে প্রসন্নকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বললেন, "আজই পালন করব।"

বললাম, "আজই উপকার পাবেন। সারা রাত্রি সুখে নিদ্রা যাবেন।"

নানা বিষয়ে অল্প-স্বল্প ক'রে কথাবার্তা চলতে লাগল। তার মধ্যে দেশোদ্ধারের কথাই সর্বপ্রধান। জীবনীশক্তি স্তিমিত হয়ে এসেছে, কিন্তু আগ্রহ-উদ্দীপনার ঘাটতি নেই। কাজ করবার জন্য অক্ষম দেহ চঞ্চল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর লতাবিতান পরিত্যাগ ক'রে আমরা

ঘরের ভিতরে উঠে এলাম। সেখানে দেখি, কয়েকটি মহিলা সমবেত হয়েছেন। চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে কয়েকটা গান গেয়ে ও চা পান ক'রে যখন বাড়ির দিকে রওনা হলাম, তখন শীতের হ্রস্ব দিন অপরাহ্ণের দিকে ঢ'লে পড়েছে।

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথমেই মনে পড়ল চিত্তরঞ্জনের কথা। কি জানি, কেমনভাবে রাত্রি কাটল। ঘুম হ'ল কি না কে জানে!

তাড়তাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে চা পান ক'রে ছুটলাম প্রফুল্লরঞ্জনের গৃহাভিমুখে। পৌঁছে দেখি, বাইরে বারান্দায় ব'সে আছেন চিত্তরঞ্জন, বাসন্তী দেবী, প্রফুল্লরঞ্জন, চিত্তরঞ্জনের পুত্রবধূ সুজাতা দেবী প্রভৃতি অনেকেই। সকলের মুখে আনন্দের সুমিষ্ট হাসি।

আমাকে দেখে সানন্দে উঠে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বললেন, "উপেনবাবু, মার্ভালাস! কাল সমস্ত রাত সুখে নিদ্রা দিয়েছি— সাড়ে দশটা থেকে একেবারে ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত। একদিনেই বেশ খানিকটা তাজা বোধ করছি।"

সহাস্যমুখে আমি বললাম, "আমিও বেশ খানিকটা আরাম বোধ করছি।"

১৯১৫ সালের জুলাই মাসে ভাগলপুরের প্রথম সবজজের এজলাসে লছমীপুর কেস আরম্ভ হয়। কেসটির সমাপ্তি ঘটে ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এজলাসে কেস আরম্ভ হবার পূর্বে বছর দুই-আড়াই ধ'রে কমিশনের সাহায্যে বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষে বহু সাক্ষীর জবানবন্দি নেওয়া হয়েছিল।

মকদ্দমায় বাদীপক্ষ সমগ্র লছমীপুর এস্টেট দাবি করেছেন; এবং মকদ্দমার কোর্ট-ফিস ও জুরিসডিক্‌শনের জন্য মকদ্দমার মূল্য, অর্থাৎ সমগ্র লছমীপুর এস্টেটের মূল্য, নির্ধারিত করেছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা। এ মূল্যনির্ধারণ কিন্তু মকদ্দমার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিতান্তই মোটামুটি একটা নির্ধারণ; বহু মূল্যবান খাদ-খনি-পাহাড়-পর্বত-অরণ্যানী-সমাকীর্ণ সুবিস্তৃত জমিদারির প্রকৃত মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকার অনেক বেশি। মকদ্দমায় নিষ্পন্ন হওয়ার জন্য চল্লিশটি বিভিন্ন ইস্যু ধার্য হয়েছে। সুতরাং আকারে এবং প্রকারে সর্ব্বতোভাবে, লছমীপুর মামলা যে একটি বৃহৎ গোত্রের মকদ্দমা, সে কথা না বললেও চলে।

ইস্যু ধার্য হবার সময়ে প্রতিবাদিনী রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষে এসেছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিশ্ববিশ্রুত অ্যাডভোকেট ডক্টর (পরে সার্) রাসবিহারী ঘোষ। মামলার শুনানির (Hearing-এর) সময়ে এসেছেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশ। বাদীপক্ষের আইনবাজগণের শীর্ষস্থানে আছেন কলিকাতা হাইকোর্টের সুবিখ্যাত ব্যারিস্টার প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (পরে পাটনা হাইকোর্টের জজ মিঃ পি. আর. দাশ) এবং সার্ (পরে লর্ড) এস. পি. সিংহ। এ ছাড়া

উভয় পক্ষে দশ-বারো জন ক'রে বড় ছোট ও মাঝারি শ্রেণীর উকিল ব্যারিস্টার ও অ্যাটর্নি আছেন। বাদিনী পক্ষের যে আকাশে চিত্তরঞ্জন পূর্ণচন্দ্র, আড়াই বৎসরের জুনিয়র উকিল আমি সে আকাশের এক কোণে নিতান্তই এক ক্ষীণপ্রভ তারকা।

উভয় পক্ষে কলিকাতা হাইকোর্টের দুই দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার আগমন করায় ভাগলপুর শহরে, বিশেষত আদালত মহলে, রীতিমত সোরগোল প'ড়ে গেল। স্থানীয় বিহারী উকিল এবং বিহারী জনসাধারণ লছমীপুর মকদ্দমার নামকরণ করেছেন 'সিংহ্ ঔর শিয়ারকা লড়াই'; অর্থাৎ, সিংহ এবং শৃগালের যুদ্ধ। সিংহ অর্থে বাদীপক্ষের ব্যারিস্টার সার্ এস. পি. সিংহ, এবং শিয়ার অর্থে প্রতিবাদিনী পক্ষের ব্যারিস্টার সি. আর. (শিয়ার) দাশ। এই সিংহ এবং শৃগালের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত শৃগালের নিকট সিংহকেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল।

ভাগলপুরের বাঙালীরা কিন্তু লছমীপুর কেসের নাম দিয়েছিলেন নাতি-মাতামহর মামলা। সিংহ-শিয়ালের ন্যায় এই নাতি-মাতামহ নামও রচিত হয়েছিল উভয় পক্ষের সর্দার ব্যারিস্টারদ্বয়ের নাম অবলম্বন ক'রে। নাতি অর্থে সার্ এস. পি. সিংহ এবং মাতামহ অর্থে সি. আর. দাশ। অবশ্য উভয়ের মধ্যে বস্তুত এমন কোনো সম্পর্কের অস্তিত্ব ছিল না; কিন্তু অকাট্য এক যুক্তির সাহায্যে এই সম্পর্ক আবিষ্কৃত হতে পেরেছিল। চিত্তরঞ্জনের পুত্র চিররঞ্জনের ডাকনাম ছিল ভোম্বল, তার সঙ্গে উপাধিও ছিল দাস। আর ভোম্বলদাস যে সিংহের মামা, এ কথা বাঙালীদের মধ্যে কার না জানা আছে? সুতরাং চিররঞ্জন যদি এস. পি. সিংহের মামা হলেন, তা হ'লে পিতা চিত্তরঞ্জনের পক্ষে মাতামহ না হয়ে উপায় ছিল না। এই অকাট্য যুক্তির বলে লছমীপুর মামলার নাম হয়েছিল নাতি-মাতামহর মামলা।

চিত্তরঞ্জন ভাগলপুরে এসে বিহারের জনপ্রিয় নেতা পরলোকগত দীপনারায়ণ সিংহের বৈঠকখানা-বাড়িতে উঠেছেন। সেখানে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করেছেন তাঁর মক্কেল লছমীপুর-রাজ। শহরের মধ্য-স্থলে ক্লীভল্যাণ্ড রোডের উপর এই প্রশস্ত এবং মনোরম বৈঠকখানা-বাড়ি অবস্থিত। নগরের মেরুদণ্ডস্বরূপ পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ক্লীভল্যাণ্ড রোড ভাগলপুরের দীর্ঘতম এবং প্রধানতম রাজপথ। সেই পথ থেকে তোরণ অতিক্রম ক'রে ভিতরে প্রবেশ করলেই বিস্তৃত প্রাঙ্গণ; তার দিকে দিকে সুবিন্যস্ত কেয়ারি-করা ফুলের গাছ। প্রাঙ্গণশেষে বেশ-খানিকটা জায়গা জুড়ে বৈঠকখানা-বাড়ি; তার অব্যবহিত উত্তরে এক-টানা খরস্রোতা ভাগীরথী নদী। নদীর পরপারে সুদূরবিস্তৃত তৃষ্ণার্ত চরভূমি উত্তর জলপ্রান্ত লেহন করছে, এবং তারও বহু উত্তরে আকাশ ও ধরিত্রীর অস্পষ্ট মিলন-রেখা। এই সুন্দর মনোরম পরিবেশ শুধু ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জনের পক্ষেই নয়, কবি চিত্তরঞ্জনের পক্ষেও অনুপযুক্ত হয় নি।

চিত্তরঞ্জন ভাগলপুরে পৌঁছেছেন। প্রত্যূষে আমরা উকিল মোক্তার ও রাজকর্মচারী মিলে দশ-বারো জন ব্যক্তি তাঁর বাসগৃহে প্রথম মন্ত্রণা-সভায় সমবেত হয়েছি। আমাদের দলপতি ভাগলপুরের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল চন্দ্রশেখর সরকার। দক্ষিণ দিকের বিস্তীর্ণ বারান্দায় বৈঠকের ব্যবস্থা হয়েছে। পাশাপাশি খান তিনেক টেবিল পড়েছে, তার ধারে ধারে গোটা পনের-ষোল চেয়ার; টেবিলের অপর দিকে চিত্তরঞ্জনের বসবার আসন। আসন গ্রহণ ক'রে উকিলেরা মৃদুস্বরে কথোপকথন করছেন। আমি কিন্তু চিত্তরঞ্জনের আগমনের প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে ব'সে আছি,—ব্যারিস্টার অথবা কবি, কোন্ চিত্তরঞ্জনের প্রতীক্ষায় বেশি, সে কথা বলা কঠিন।

কিছুক্ষণ পরে ড্রেসিং-গাউন-পরিহিত দীর্ঘকায় সৌম্যমূর্তি চিত্তরঞ্জন সবেগে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করলেন। আমরা তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মাথা নেড়ে নেড়ে সকলকে অভিবাদন ক'রে বসতে ব'লে নিজের চেয়ারে তিনি ব'সে পড়লেন। দেখে খুশি হয়ে মনে মনে বললাম, হাঁ, অধিনায়ক হবার উপযুক্ত আকৃতি বটে। বলিষ্ঠ অবয়ব—দুই চক্ষুর মধ্যে প্রতিভা এবং বুদ্ধির সুস্পষ্ট দীপ্তি, এবং সমস্ত অঙ্গ জুড়ে অপরাজেয় পৌরুষের এমন এক উচ্ছল প্রকাশ, যার মধ্যে আশ্বাস বাসা বাঁধতে ক্ষণমাত্র দ্বিধা বোধ করে না।

প্রথমে সাধারণভাবে দু-চারটে কথাবার্তার পর চিত্তরঞ্জন মকদ্দমার প্রসঙ্গে প্রবেশ করলেন। মকদ্দমার প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, বাদী এবং প্রতিবাদিনীর বংশে ও জাতিতে হিন্দু আইন অনুযায়ী দত্তক-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে অথবা নেই। বাদীগণের মতে নেই; সুতরাং প্রতিবাদিনী রাণী কুসুমকুমারীর তথাকথিত পুত্রের একান্তই যদি দত্তক গ্রহণ হয়ে থাকে, তা হ'লে তা অবৈধ হয়েছে, অতএব রাণী কুসুমকুমারীর পরলোকগত স্বামীর অবর্তমানে বাদীগণ সমগ্র লছমীপুর এস্টেটের অধিকার পাবার উপযুক্ত। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, যদিও তাঁরা নিজেদের বংশকে সূর্যবংশী রাজপুত বংশ নামে অভিহিত ক'রে থাকেন, কিন্তু মূলত তাঁরা আদিবাসী অহিন্দু। হিন্দু আইনের যে কয়েকটি বিধি তাঁরা বহুব্যবহারের ফলে জাতির সুস্পষ্ট সম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন তদ্ব্যতীত অপর সকল বিধিই তাঁদের ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। হিন্দুদের আচরিত দত্তক-গ্রহণ প্রথা এ পর্যন্ত তাঁদের বাইশি-চুরাশি গাদিতে অবলম্বিত হয় নি; সুতরাং হিন্দু আইন অনুযায়ী দত্তক-গ্রহণ প্রথা তাঁদের জাতিতে প্রযোজ্য নয়।

এ উক্তির উত্তরে প্রতিবাদিনী বলেন, মূলত তাঁরা হিন্দু, সুতরাং

হিন্দু আইনের সকল সূত্রই তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। বহু দীর্ঘকাল অনার্য ভূখণ্ডে ঘাটোয়ালি বৃত্তি অবলম্বনের সূত্রে বাস করার ফলে অনার্য জাতির কোনো কোনো প্রথা যদি তাঁদের মধ্যে প্রবেশ ক'রে থাকে, তার জন্য তাঁরা হিন্দুত্ব থেকে স্খলিত হন নি। আর তর্কের খাতিরে যদি ধ'রেই নেওয়া যায় যে, স্খলিত হয়েছেন, তা হ'লেও হিন্দু-আইনসম্মত দত্তক-গ্রহণ প্রথা তাঁদের বাইশি-চুরাশি গাদির মধ্যে প্রবর্তিত আছে, তার বহু বহু দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে।

পাঠকগণ প্রতিবাদিনীর যুক্তির মধ্যে এই পারস্পরিক বিরোধ লক্ষ্য ক'রে বিস্মিত হবেন না। বিধাতা আমাদিগকে দুটি ক'রে চর্মচক্ষু দিয়ে তার সঙ্গে অল্প-বিস্তর চক্ষুলজ্জাও দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, চক্ষুলজ্জার জন্য দুটি চক্ষুর একান্ত প্রয়োজন। 'বাইনোকুলার ভিসন' ব্যতীত চক্ষুলজ্জার খোলতাই হয় না। লক্ষ্য ক'রে দেখবেন, একচক্ষু মানুষের সাধারণ মানুষের চেয়ে চক্ষুলজ্জা একটু কম হয়ে থাকে। আইনের প্রাণ হয়তো নেই, কিন্তু চক্ষু আছে। তাই আইন-বিষয়ক অনেক গ্রন্থে 'in the eye of law' বাক্যটির প্রয়োগ দেখা যায়। আইনের এই অচর্ম অদ্বিতীয় চক্ষুতে চক্ষুলজ্জার কিন্তু কোনো বালাই নেই। সেই জন্য আইনের প্রসঙ্গে পরস্পরবিরোধী যুক্তি প্রদর্শন করবার পক্ষে তেমন কোনো বাধা দেখা যায় না। হাঁড়ি বিক্রয়ের মামলায় প্রতিবাদীর পক্ষ থেকে এমন উত্তরও অনেক সময়ে শুনতে পাওয়া যায় যে—প্রথমত, বাদী প্রতিবাদীকে আদৌ কোন হাঁড়ি বিক্রয় করেন নি, সুতরাং বাদীর মামলা খরচা ডিস্‌মিস্‌ হবার উপযুক্ত; দ্বিতীয়ত, বাদী যদি প্রতিবাদীকে একান্তই হাঁড়ি বিক্রয় ক'রে থাকেন, তা হ'লে ফুটো হাঁড়ি বিক্রয় করেছেন, সুতরাং বাদীর মামলা খরচা ডিস্‌মিস্‌ হবার উপযুক্ত। ঠিক এতটা চক্ষুলজ্জার অভাব না দেখা গেলেও, আইন-

আদালতের জগতে এর কাছাকাছি চক্ষুলজ্জার অভাব হামেশাই দেখা যায়।

কথোপকথনের মধ্যে হঠাৎ এক সময়ে চিত্তরঞ্জন হাঁক দিলেন, "বদরী!"

বদরী যে কোন-এক ভৃত্যের নাম, সে অনুমান করতে ভুল হ'ল না। পর-মুহূর্তেই ধুতি-চাপকান-পরা গোলগাল-চেহারা বদরী এসে উপস্থিত হ'ল। মুখে অখণ্ড পরিতৃপ্তির অনাবিল প্রশান্তি। বোঝা গেল, খায়-দায় ভাল—খোশ মেজাজে আছে।

বদরীকে দেখে চিত্তরঞ্জন বললেন, "ডাঁটা নিয়ে আয়।"

ডাঁটা নিয়ে আয়! আইনের এ পরামর্শ-সভায় ডাঁটা কি হবে? আর, কিসেরই বা ডাঁটা! ভুল শুনলাম না তো?

কিন্তু না, ঠিকই তো শুনেছি। এক গোছা, দশ-বারোটার কম হবে না, সরু সরু ছোট ছোট কিসের ডাঁটা নিয়ে এসে বদরী চিত্তরঞ্জনের ডান দিকে টেবিলের উপর রেখে গেল।

কৌতূহল উদগ্র হয়ে উঠল। ডাঁটায় কি হয় দেখতে হবে। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। ডান হাতে একটা ডাঁটা তুলে নিয়ে ডান কানের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে এদিক ওদিক থরথর ক'রে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে চিত্তরঞ্জন নির্মমভাবে কান চুলকোতে লাগলেন;—এমন নির্মমভাবে যে, সে যেন নিজের কানই নয়, যেন বাদীপক্ষের ব্যারিস্টারের কান। সে ডাঁটাটা ফেলে দিয়ে আবার একটা ডাঁটা নিয়ে বাঁ কানে ঢুকিয়ে ঠিক একই ব্যাপার করলেন।

সেদিন জানতে পারি নি, কিন্তু কয়েক দিন পরে জেনেছিলাম যে, ডাঁটাগুলি সাধারণ কচুগাছের ডাঁটা। চিত্তরঞ্জনের সামান্য একটু বধিরতা ছিল। কোন-এক প্রবীণ কবিরাজের পরামর্শে, কান চুলকোতে

তিনি কচুর ডাঁটা দিয়ে চুলকোতেন। তাতে ক্ষতি তো কিছু হ'তই না, অধিকন্তু কচুর রসের ভেষজগুণ বধিরতার কিছু উপকার সাধনই করত। দেখতে দেখতে কয়েকটা ডাঁটা খরচ হয়ে গেল।

একটা জটিল প্রশ্ন উঠেছিল। প্রশ্নটা ঠিক মনে নেই, কিন্তু সব দিক বাঁচিয়ে তার একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হয়ে উঠছিল না। চিত্তরঞ্জনের আহ্বানে চন্দ্রশেখরবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে অন্যান্য কয়েকজন প্রধান উকিল তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন, কিন্তু কেউই ঠিক পথটি নির্দেশ করতে সক্ষম হচ্ছিলেন না।

"আচ্ছা, আমার মনে হয়, ও case-lawটা (নজিরটা) ওদের পক্ষে অব্যবহার্য ক'রে দেবার জন্যে—"

যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের সঙ্গে উপলব্ধি করি, আমি কথা কইতে আরম্ভ করেছি,—আমি অর্থাৎ বছর আড়াইয়ের দু-টাকায়-এজাহার-লেখা একজন অর্বাচীন উকিল! হাতী ঘোড়া যেখানে গেল তল, সেখানে আমি বলছি কত জল? ইংরিজীতে একটা কথা আছে, Fools rush in where angels fear to tread—যে ভূমিতে পদার্পণ করতে পণ্ডিত ব্যক্তিরা ভয় পায়, নির্বোধেরা সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ সত্যের প্রমাণ পূর্বে আরও এক-আধবার দিয়েছি,—এই বারই প্রথম নয়। ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যাস খানিকটা আছে। ঔৎসুক্যের সহিত আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে চিত্তরঞ্জন বললেন, "কি আপনার মনে হয়, বলুন।"

তখন আর না ব'লে উপায় ছিল না। যথাসাধ্য গুছিয়ে-গাছিয়ে আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম।

মনোযোগসহকারে সমস্ত কথা শুনে মৃদুভাবে মাথা নেড়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "না, এটা আপনার wrong view (ভুল অভিমত) হচ্ছে; ও-পথে গেলে আমাদের অন্য অসুবিধের সম্মুখীন হতে হবে।"

মনে মনে নিজের কান ম'লে দিয়ে চেয়ারে কুঁকড়ে বসলাম ধৃষ্টতার দণ্ড হাতে হাতে পাওয়া গেছে।

মিনিট দশেক পরে সেদিনকার মতো বৈঠক শেষ হ'ল। সমস্যার বিশেষ কোনো সমাধান হ'ল না; প্রশ্ন প্রশ্নই র'য়ে গেল।

চিত্তরঞ্জন উঠে দাঁড়াতেই সকলে হুড়মুড় ক'রে উঠে প'ড়ে নিজ নিজ ব্রীফ গোছাতে প্রবৃত্ত হলেন। অন্দরের দিকে খানিকটা এগিয়ে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে চিত্তরঞ্জন আমার প্রতি ইঙ্গিত করলেন, "শুনুন।"

তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে যেতে রেলিঙের ধারে একটু স'রে গিয়ে বললেন, "দেখুন, আপনার সাজেস্‌শানটা ইন্‌টেলিজেন্ট সাজেস্‌শান হয়েছিল। গ্রহণ করতে না পারলেও আমি মনে-মনে খুশি হয়েছিলাম।"

কানটা তখনো জলছিল, মনে মনে একটু হাত বুলিয়ে দিলাম।

চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি এ কেসে কি করবেন? কি ডিউটি আপনার?"

বললাম, "Deposition (এজাহার) লেখাই প্রধান ডিউটি।"

মাথা নেড়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "না, ডিপোজিশন লিখতে হবে না। আপনাকে অন্য একটা কাজ করতে হবে।"

মনে মনে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললাম, "কি কাজ বলুন।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "Adoption (দত্তক গ্রহণ) বিষয়ে শিবগঙ্গা-প্রিভিকাউন্সিল কেসটা আপনার জানা আছে?"

বললাম, "আছে। সম্প্রতি ভাল ক'রে ও-কেসটা প'ড়ে রেখেছি।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "ও-কেসটা একটা অতি পুরাতন বটগাছের মতো; হাজারটা ঝুরি নেমেছে, কিন্তু আসল গুঁড়ি এখনো তাজা আছে, শুকিয়ে যায় নি। আমাদের ভারতবর্ষের গোটা পাঁচ-ছয় হাইকোর্টে, আর

বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে ও-কেস হাজারবার আলোচিত হয়েছে ; কিন্তু এ পর্যন্ত কোথাও over-ruled (বাতিল) হয় নি। ঐ কেসের মধ্যে আমাদের উভয় পক্ষের জীবন-কাঠি আর মরণ-কাঠি রাখা আছে। জীবন-কাঠির সন্ধান প্রথম যারা পাবে, তারাই হবে জয়ী। ঐ কেসের একটি ভাল রকম Synopsis (সারসংগ্রহ) আপনাকে তৈরি করতে হবে।"

সাগ্রহে বললাম, "আজ থেকেই আরম্ভ করব।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "কিন্তু সাধারণ সিনপ্‌সিস হ'লে চলবে না, যত হাইকোর্ট আর প্রিভিকাউন্সিল কেসে শিবগঙ্গা কেস আলোচিত হয়েছে, সবগুলিকে জড়িয়ে সিনপ্‌সিস করতে হবে।"

হাসিমুখে বললাম, "তাই করব।"

দাশ সাহেব বললেন, "এ কাজে আপনার অন্তত মাস দুই-আড়াই সময় লাগবে। ও-সময়টা আপনাকে কোর্টে আসতে হবে না, বাড়ি ব'সে কাজ করবেন। আমি অনন্তকে ব'লে দেব।"

অনন্ত, অর্থাৎ অনন্তপ্রসাদ, আমাদের বারেরই একজন উকিল ; উপস্থিত সে লছম্‌পুর এস্টেটের ম্যানেজার।

চিত্তরঞ্জনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "অনুগ্রহ ক'রে সে রকম ব্যবস্থা করবেন না। আপনি কোর্টে মামলা চালাবেন, আর তা দেখা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাড়ি ব'সে আমি কাজ করব, সে আমার পক্ষে একটা দণ্ড হবে। আমি রাত জেগে আপনার কাজ ক'রে দেব। রাত জাগা আমার অভ্যাস আছে।"

স্মিতমুখে চিত্তরঞ্জন বললেন, "আচ্ছা, তাই হবে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনাকে ফিস্ কত দিচ্ছে এরা ?"

মৃদু হেসে বললাম, "বোধ হয় গোটা পাঁচেক ক'রে দেবে।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন ব'ললেন, "মোটে! আচ্ছা, এ বিষয়ে আমি অনন্তর সঙ্গে কথা কইব।"

আমার নাম জেনে নিয়ে চিত্তরঞ্জন ভিতরে প্রবেশ করলেন।

দিন-দুই পরে অনন্ত আমাকে বললে, "দাশ সাহেব তোমার ফি কত ঠিক করেছেন জান উপেন?"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কত?"

"বিশ রুপৈয়া।"

"তুমি রাজী হয়েছ?"

অনন্ত বললে, "দাশ সাহেবকা হুকুম,—ইসমে রাজি ঔর গৈররাজিকা কৌন্ বাত হ্যায়!" (দাশ সাহেবের হুকুম,—এতে রাজী আর গররাজীর কোন্ কথা থাকতে পারে!)

বললাম, "তুমি দুঃখিত হ'য়ো না। তোমার কাজের জন্যে পাঁচ টাকাই আমি পাব; আর পনেরো টাকা পাব দাশ সাহেবের কাজের জন্যে।"

"বড়া চালাক হো।"—ব'লে পিঠে একটা চড় বসিয়ে হাসতে হাসতে অনন্ত প্রস্থান করলে।

৩

পূর্বেই বলেছি লছমীপুর মকদ্দমা চলেছিল ভাগলপুরের প্রথম সবজজের এজলাসে। হাকিম ছিলেন বর্ধমাননিবাসী বাঙালী মুসলমান মৌলবী বেদার বখৎ। নিতান্ত নিরীহপ্রকৃতির মানুষ; উভয় পক্ষের দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টারের দাপট সামলাতে সামলাতে ভদ্রলোককে সাত-আট মাসকাল সঙ্কটের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছিল। উচ্ছ্বসিত প্রশংসার তাড়নায় কখনো চিত্তরঞ্জন মৌলবী সাহেবকে আনন্দের সপ্তম স্বর্গে তুলে দিতেন, আবার হয়তো পর-মুহূর্তেই নামিয়ে দিতেন ঠিক ততটাই পাতালের দিকে। হাকিম নিয়ে এমন ছিনিমিনি খেলতে আর কখনো কোনো উকিল-ব্যারিস্টারকে দেখি নি।

মকদ্দমার প্রথম দিকে, অর্থাৎ যে পাঁচ-ছ মাসকাল সাক্ষীদের এজাহার চলেছিল, চিত্তরঞ্জনের গৃহে মন্ত্রণা-বৈঠক বসত শুধু সকালবেলা। সন্ধ্যার পর বসত সাহিত্য এবং সঙ্গীতের স্পৃহণীয় আসর।

সকালবেলাকার বৈঠকে বিতর্ক এবং বিবেচনার সুনিপুণ যন্ত্রে যে-সকল মারাত্মক অস্ত্র নির্মিত হ'ত, তার দ্বারা চিত্তরঞ্জন আদালতে বৈরীপক্ষের সাক্ষীগণকে ক্ষতবিক্ষত করতেন। আমরা সানন্দবিস্ময়ে চিত্তরঞ্জনের অস্ত্রচালনার অপরূপ কৌশল দেখতাম।

সাধারণত জেরা দু-রকমের আছে; প্রথমত গঠননৈতিক (constructive), আর দ্বিতীয়ত ধ্বংসনৈতিক (destructive)। গঠন-নৈতিক জেরায় জেরাকারী উকিল অথবা ব্যারিস্টার বিপক্ষের সাক্ষীর মুখ দিয়ে সুকৌশলে এমন কতকগুলি উক্তি করিয়ে নেন, যার দ্বারা তাঁর নিজ পক্ষের মামলা খানিকটা 'highly probable' (বিশেষরূপে

সম্ভবপর) হয়ে ওঠে; অর্থাৎ খানিকটা গ'ড়ে ওঠে। অপর পক্ষে ধ্বংসনৈতিক জেরায় জেরাকারী উকিল বিপক্ষের সাক্ষীর উক্তির দ্বারা বিপক্ষের মামলার ধ্বংসসাধন করেন; অর্থাৎ আইনের ভাষায়, বিপক্ষের মামলা 'highly improbable' (বিশেষরূপে অসম্ভাব্য) ক'রে তোলেন।

ধ্বংসনৈতিক জেরা অপেক্ষা গঠননৈতিক জেরা কঠিনতর কার্য। সকল বিষয়েই গড়ার চেয়ে ভাঙা অনেক সহজ ব্যাপার। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রতিদিনকার অভিজ্ঞতা থেকে এ কথার সত্যতা তো আমরা হাড়ে-হাড়ে উপলব্ধি করছি। ধ্বংসনৈতিক জেরা হয়তো যেমন-তেমন ক'রে সকলেই করতে পারে, কিন্তু গঠননৈতিক জেরায় অনেক উন্নত দরের বুদ্ধি বিবেচনা এবং লোকচরিত্রজ্ঞানের প্রয়োজন। ঠিক সময়মতো থামতে না জানলে অনেক সময়ে এ অস্ত্র নিজের গলাও কাটে। একই সাক্ষীর মুখ দিয়ে সব কথা বলিয়ে নেবার লোভ গঠননৈতিক জেরার ক্ষেত্রে পাপ।

ব্যারিস্টার দাশ সাহেব যৎপরোনাস্তি নিপুণতার সঙ্গে এ অস্ত্র পরিচালিত করতে জানতেন। অবশ্য এ অস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধ্বংস-নৈতিক জেরার অস্ত্রও চালিয়ে যেতেন। ফলে যুগপৎ ভাঙা ও গড়ার কার্য চলতে থাকত। এই দ্বিমুখী শিল্পকলার অপূর্ব ব্যবহার-চাতুর্য দেখে আমরা একসঙ্গে শিক্ষা এবং আনন্দ লাভ করতাম। জেরার শেষভাগে "I put it to you, I put it to you" ব'লে দাশ সাহেব যখন সাক্ষীর প্রতি গোটা কয়েক শেষ গোলা নিক্ষেপ করতেন, তখন আমাদের বুঝতে আর বাকি থাকত না, সাক্ষী গণেশ উলটেছে।

আদালতে সাক্ষী-হননের কার্য শেষ ক'রে রণক্লান্ত চিত্তরঞ্জন বৈকালে গৃহে ফিরতেন। গৃহে পৌঁছানোর পর আদালতের বেশভূষা থেকে তাঁর দেহ মুক্তিলাভ করত, আইন-আদালতের পরিবেশ থেকে তাঁর মন কিন্তু

মুক্তিলাভ করত আদালত থেকে গৃহে ফেরবার পথেই। সন্ধ্যার পর দীপনারায়ণ সিংহের বৈঠকখানা-গৃহে উপনীত হয়ে ব্যারিস্টার দাশ সাহেবকে আর খুঁজে পেতাম না; তৎপরিবর্তে দেখতাম কবি এবং রসিক চিত্তরঞ্জন আমাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার জন্য উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করছেন। আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ আমার এবং আমার তিন-চারটি বন্ধুর সঙ্গে। আমার বন্ধুগণের মধ্যে উকিল যতিনাথ ঘোষ, উকিল সুধাংশু রায়, টি. এন. জুবিলি কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, কলিকাতা সায়ান্স কলেজের অধুনাতন সুবিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্র এবং আরও এক-আধজন ছিলেন। চিত্তরঞ্জন ব্যতীত আমিই ছিলাম একমাত্র ব্যক্তি, যাকে সকাল এবং সন্ধ্যার উভয় বৈঠকে হাজিরা দিতে হ'ত;—সকালে ব্যারিস্টার দাশ সাহেবের জুনিয়ার-রূপে মন্ত্রণা-বৈঠকে এবং সন্ধ্যাকালে কবি চিত্তরঞ্জনের সুহৃদ্‌রূপে কলা-মজলিসে। দৈবাৎ কোনদিন সান্ধ্য আসরে উপস্থিত হতে না পারলে তার জন্য আমাকে চিত্তরঞ্জনের কাছে সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হ'ত।

আমাদের সান্ধ্য আসরে প্রধান বিষয়-সূচি ছিল সাহিত্য-আলোচনা এবং সঙ্গীত। ইংরেজী এবং বাংলা সাহিত্য উভয় বিষয় অবলম্বন ক'রেই সাহিত্য-আলোচনা হ'ত। ইংরেজ কবিদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন ব্রাউনিং-এর বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। ব্রাউনিং-কাব্যের দার্ঢ্য, সরলতা এবং বন্ধুরতা চিত্তরঞ্জনের বিশেষ ধাঁজের সাহিত্য-রুচি এবং কাব্যবোধের তন্ত্রীতে যেমন সাড়া তুলত, এমন আর কোনো ইংরেজ কবির কাব্য তুলতে পারত না। তিনি অতি হৃদয়গ্রাহীভাবে গভীর মধুর কণ্ঠে ব্রাউনিং পাঠ করতে পারতেন। মাঝে মাঝে এক-এক দিন আমাদের ব্রাউনিং-বৈঠক বসত। সেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর ব্রাউনিং খণ্ড থেকে অনর্গল কবিতার পর কবিতা পাঠ ক'রে যেতেন, আমরা আমাদের গ্রন্থের পাতা উল্টে উল্টে মুগ্ধচিত্তে

শুনতাম। পড়ার গুণে সুকঠিন ব্রাউনিং-কাব্যের মর্মকোষ আমাদের কাছে একে একে তার দলগুলি খুলতে বাধ্য হ'ত। Evelyn Hope নামে করুণরসাত্মক কবিতাটি চিত্তরঞ্জনের অতিশয় প্রিয় ছিল। কবিতাটির প্রথম ছত্র—Sweet Evelyn Hope is no more—এত দীর্ঘকাল পরেও চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠের সুমিষ্ট এবং সুস্পষ্ট অনুরণন নিয়ে আমার কানে ধ্বনিত হয়।

বাংলা কাব্য-সাহিত্যের মধ্যে চিত্তরঞ্জন বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত পদাবলী-কাব্যের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। আবার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে চণ্ডীদাস ছিলেন তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয়। "রাধার কি হ'ল অন্তরে ব্যথা! বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে, না শুনে কাহারো কথা" পদটি সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের প্রশংসার অন্ত ছিল না। তিনি বলতেন, শুধু চণ্ডীদাস-সাহিত্যেই নয়, সমস্ত বাংলা-সাহিত্যের মধ্যে এই পদটি সর্বশ্রেষ্ঠ লিরিক, অর্থাৎ গীতিকাব্য। তাঁর মতে—

"সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘপানে
না চলে নয়নের তারা।
বিরতি আহারে রাঙা বাস পরে
যেমতি যোগিনী পারা॥"

—পূর্বরাগের অর্থাৎ নব-পরিচয়ের এমন অপরূপ চিত্র শুধু বাংলা-সাহিত্যে কেন, যতদূর তাঁর জানা আছে, বিশ্বের কোনো সাহিত্যেই নেই।

"চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর"—পদটিও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বলতেন, "এই দুটি ছত্র যেমন গ্রাফিক তেমনি ইন্‌টেন্‌সিভ, আর তেমনি এক্সটেন্‌সিভ; পাঠমাত্রই যে চিত্র মনের পটভূমিকায় ফুটে ওঠে, তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি মধুর, তেমনি ভাবদ্যোতক।"

রবীন্দ্র-কাব্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জনের অভিমত খানিকটা অনুদার ছিল। তিনি বলতেন, রবীন্দ্র-কাব্য 'প্রিটি' নিশ্চয়ই, কিন্তু 'গ্র্যাণ্ড' নয়। আমরা, বন্ধুরা, এ মত পোষণ করতাম না এবং চিত্তরঞ্জনের এ মত আমাদের খানিকটা পীড়ন করত। আমাদের মধ্যে বিশেষ ক'রে দুজন—যতিনাথ ও আমি প্রবল রবীন্দ্র-ভক্ত ছিলাম। আমরা দুজনে এ মতের প্রতিবাদই শুধু করতাম না, সময়ে সময়ে খণ্ডন করবার চেষ্টাও করতাম।

সঙ্গীত, বিশেষত কণ্ঠসঙ্গীত, চিত্তরঞ্জনের বিশেষ প্রিয় বস্তু ছিল। সব শ্রেণীর গানই তিনি শুনতে ভালবাসতেন, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ভালবাসতেন বৈষ্ণব পদকর্তাদের রচিত কীর্তন-গান। কিন্তু তাই ব'লে উৎকৃষ্ট শ্যামা সঙ্গীতের প্রতিও তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যেত। তাঁর হৃদয়ের এক দিক জুড়ে ছিল যমুনাতটবিহারী মুরলীধর শ্যামসুন্দরের মূর্তি, অপর দিকে শ্মশানবাসিনী শবাসনা শ্যামার। শ্যাম এবং শ্যামাকে তিনি একই শক্তির দ্বিবিধ প্রকাশ ব'লে মনে করতেন।

আমার মুখে দুটি গান শুনতে তিনি অতিশয় ভালবাসতেন, প্রসিদ্ধ শ্যামাসঙ্গীত 'মনেরই বাসনা শ্যামা' এবং 'ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা'। এই দুটি গান শোনবার সময়ে তাঁর মনের কিন্তু সম্পূর্ণ পৃথক দু-রকম ভাব হ'ত। 'মনেরই বাসনা' শুনতে শুনতে তিনি ভাবাবেগে স্তব্ধ নিমীলিতনেত্র হয়ে যেতেন। এমন নিস্পন্দভাবে নিঃসাড়ে ব'সে থাকতেন যে, দেখে মনে হ'ত, দেহে সম্বিৎ আছে কি নেই। সম্বিতের প্রথম পরিচয় পাওয়া যেত দুই চক্ষের দরবিগলিত ধারায়। আস্থায়ী শেষ ক'রে যখন আমি অন্তরা ধরতাম—'তখন আমি মনে মনে তুলব জবা বনে বনে', তখন অকস্মাৎ দেখতাম দুই চক্ষের দু কূল প্লাবিত ক'রে অশ্রুর জল নেমেছে। দেহ কিন্তু তখনো তেমনি নিস্পন্দ অসাড়।

'ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা' গান শোনবার সময়ে কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাব দেখা যেত। চক্ষু তখন পূর্ণবিকশিত, মুখে সকৌতুক আনন্দের নিঃশব্দ মৃদু হাস্য এবং গানের স্থানে-অস্থানে দুই অবিমুক্ত অঙ্গুলির নীরব উচ্ছলিত তুড়ি। ভাবটা ঠিক এই রকম যে, যে কোন মুহূর্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে 'ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা' ব'লে হাসতে হাসতে সংসার ত্যাগ ক'রে বেরিয়ে গেলেও আশ্চর্যের কিছু হয় না।

'ধিন্‌তাধিনা' গানটি নিতান্তই ছোট। সম্পূর্ণ গানটি শুনলে এই গান অবলম্বন ক'রে চিত্তরঞ্জনের মনোভাব যেমন হ'ত, তা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করবার পক্ষে পাঠকের সুবিধা হবে মনে ক'রে গানটি এখানে উদ্ধৃত করলাম—

"ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা!
ও তোর হাতের ফাঁসি রইল হাতে
আমায় ধরতে পারলি না!
ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা!
পিছনে তোর মোটা-সোটা
দাঁড়িয়ে আছে গুণ্ডা ছটা।
মনে করেছিস ধরবি আমায়,
আমি বন্ধন দশায় থাকব না!
ধিন্‌তাধিনা পাকা নোনা!"

চিত্তরঞ্জন বলতেন, গানটার মধ্যে সংসারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার এমন একটা সহজ বেপরোয়া ভাব আছে যে, মনে হয় বন্ধন-দশা থেকে মুক্ত হওয়া খুব বেশি কঠিন কাজ নয়।

বস্তুত, ঠিক এই সময় থেকেই চিত্তরঞ্জনের মনে বন্ধন-দশা থেকে মুক্ত হবার বাসনা দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। এই সময় থেকে, অর্থাৎ

যে সময়ে চিত্তরঞ্জনের কর্মজীবনের সফলতার সূর্য মধ্যাহ্ন-গগনে অবস্থিত; যে সময়ে একদা-রিক্ত দুই হস্তে রাশি রাশি অর্থ অযাচিত ভাবে এসে জমাট বাঁধছে; যে সময়ে প্রথম শ্রেণীর আইন ব্যবসায়ী এবং দুর্বার দেশনায়করূপে সারা ভারতবর্ষে খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অন্ত নেই। এই সময় থেকেই চিত্তরঞ্জন স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিলেন ত্যাগের, রিক্ততার। স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, মহাভোগীর মধ্যে মহাত্যাগী বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে।

সান্ধ্য আসরের পর প্রতি সপ্তাহে বার-দুই চিত্তরঞ্জন আমাদের খাওয়াতেন। সে খাওয়ানো সাধারণ খাওয়ানো নয়। উপাদেয় খাদ্য-বস্তুর প্রকার এবং পরিমাণের বাহুল্যে আমরা বিপন্ন হয়ে উঠতাম। চিত্তরঞ্জনও আমাদের সঙ্গে খেতে বসতেন। তিনিও খেতেন, আমরাও খেতাম; কিন্তু প্রভেদ এই ছিল যে, আমরা খেতে খেতে গল্প করতাম, আর তিনি গল্প করতে করতে খেতেন। সুতরাং আমরা যদি দশ রকম খাদ্যসামগ্রী খেতাম তো তিনি খেতেন তিন রকম।

আমি একদিন তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলাম, "আমাদের খাওয়াবার জন্যে আপনি এত রকম ব্যবস্থা করেন, কিন্তু আপনি অত কম খান কেন?"

উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "খাদ্যবস্তু উপভোগ করবার দুটি উপায় আছে। এক খেয়ে আর এক খাইয়ে। আমি কতকগুলি খাদ্যবস্তু উপভোগ করি খেয়ে, আর বাদ বাকি উপভোগ করি খাইয়ে। সুতরাং মোটের উপর নিজেকে একটুও বঞ্চিত করি নে।" ব'লে হা-হা ক'রে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠেছিলেন।

এ অবশ্য হয়েছিল চমৎকার ব্যারিস্টারি উত্তর। কিন্তু আসল কথা, তিনি করছিলেন আহার্য-বস্তুর সমারোহের মধ্যে অবস্থান ক'রে নিজের

রসনাকে সম্বৃত করবার কঠোর অনুশীলন। রসনাকে সম্বৃত করা যে কত কঠোর কাজ, সে কথা শুধু সে-ই বলতে পারে না, রসনা হতে যে হতভাগ্য বঞ্চিত।

ভাবে-ভঙ্গিতে এ সকল কথা আমরা ভাগলপুরে থাকতে অনুমান করতাম। কিন্তু আমাদের অনুমান যে ভুল হয় নি, স্বয়ং চিত্তরঞ্জনের কাছ থেকে তার সুস্পষ্ট মৌখিক স্বীকৃতি পেয়েছিলাম মাস দুয়েক পরে মায়াবতীতে অবস্থানকালে।

সুদূর হিমালয়ে অবস্থিত আলমোরা শহর থেকে আরও মাইল বাহান্ন-তিপ্পান্ন দূরবর্তী অঞ্চলে মায়াবতী একটি ক্ষুদ্র পার্বত্য গ্রাম। এই গ্রামটির অধিপতি সুবিখ্যাত রামকৃষ্ণ মিশন। এখানে তাঁদের অদ্বৈত আশ্রম অবস্থিত। পূজার ছুটিতে অদ্বৈত আশ্রমের আমন্ত্রণে চিত্তরঞ্জন সপরিবারে মায়াবতী ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সঙ্গে আমিও ছিলাম।

প্রত্যহ সকালে চা-পানের পর চিত্তরঞ্জন ও আমি প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হতাম। যে গৃহে আমরা বাস করছিলাম, তার অনতিদূরে মাদার্স ওয়াক্ (Mother's Walk) নামে একটি নিভৃত নির্জন পথ ছিল। যে দানশীলা পুণ্যবতী আমেরিকান মহিলা ভারতবর্ষ ত্যাগ ক'রে যাবার সময় সমগ্র মায়াবতী এস্টেট রামকৃষ্ণ মিশনকে দান ক'রে যান, তিনি প্রত্যহ এই পথটিতে বেড়াতেন ব'লে এ পথের নাম রাখা হয়েছে—মাদার্স ওয়াক্। অদ্বৈত আশ্রমে সেই আমেরিকান মহিলা 'মাদার' নামে সম্মানিত।

ছায়াঢাকা জনহীন মাদার্স ওয়াক অতিশয় মনোরম স্থান ব'লে প্রায় প্রতিদিন সকালে এই পথটিতে উপস্থিত হয়ে কিছুক্ষণ আমরা বিচরণ করতাম। পরস্পরের মন খোলবার উপযুক্ত এমন স্থান, এমন কি সমাজ-

সংসার হতে বিচ্ছিন্ন সুদূর মায়াবতীতেও দুর্লভ। এখানে বেড়াতে বেড়াতে চিত্তরঞ্জন মাঝে মাঝে আমাকে তাঁর আশা-আশঙ্কার কথা, তাঁর সফলতা বিফলতার কথা, তাঁর সঙ্কট-সমস্যার কথা শোনাতেন। একদিন বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ তিনি বললেন, "একজন বড় জ্যোতিষী আমার কোষ্ঠি-বিচার ক'রে কি বলেছেন জানেন উপেনবাবু?"

সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বলেছেন?"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "বলেছেন, আর পাঁচ বছর পরে আমার সন্ন্যাস-যোগ আছে।"

বললাম, "এ আপনি বিশ্বাস করেন?"

অল্প হেসে চিত্তরঞ্জন উত্তর দিলেন, "করি বইকি; নিশ্চয় করি। তার ইশারা আসতে আরম্ভ করেছে।" তারপর ক্ষণকাল নিঃশব্দে পাদচারণা ক'রে পুনরায় বললেন, "বছর পাঁচেক আইন-আদালতের জগতে থাকতে হবে, কারণ টাকার কিছু দরকার আছে। তারপর এসব ছেড়ে-ছুড়ে দোব।"

ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করলাম, "ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কি করবেন?"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "দু বৎসর রাজনৈতিক জীবনের দ্বারা দেশের সেবা। তারপর, তাও ছেড়ে দিয়ে ভাগীরথী-তীরে কুটির বেঁধে সাহিত্যের সাধনা আর আত্মসাধনা। এই আমার ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ঘণ্ট।" ব'লে হাসতে লাগলেন।

মনটা একটা অনিরূপেয় বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল। ভবিষ্যৎ জীবনের নির্ঘণ্ট, কি জানি কেন, তেমন ভাল লাগল না। যে শক্তি যেদিকে তার সফলতার পথ কেটেছে, সেই দিকেই তার সিদ্ধি, বোধ হয় এই ধরনের কোনো চিন্তা মনকে অধিকার করেছিল।

সে যাই হোক, নিয়তির বিধানে নির্ঘণ্ট সম্পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হতে

পারে নি। কিন্তু সন্ন্যাসযোগের কথা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হয়েছিল। আর ভাগলপুরে আমরা যে ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতাম, তা যে এই সন্ন্যাসযোগেরই ইশারা, সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ ছিল না।

এই সংসারত্যাগেচ্ছু বিগতস্পৃহ অর্ধতাপস চিত্তরঞ্জন,—এই দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার দাশ সাহেব, ঠিক এই একই সময়ে তাঁর সাংসারিক জীবনে কিরূপ বালকের চেয়েও বালক ছিলেন, এবার তার একটা কৌতুকজনক-কাহিনী বলি।

পূজার ছুটি উপলক্ষে লছমীপুর কেস বন্ধ হওয়ায় কয়েকদিন পরে ১৯১৫ সালের ৮ই অক্টোবর অমাবস্যার দিন ভাগলপুর থেকে যাত্রা ক'রে দশ দিন পরে ১৮ই অক্টোবর অপরাহ্নে আমরা মায়াবতী পৌঁছুই।

আমরা দলে ছিলাম আটজন,—চিত্তরঞ্জন, তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী, দুই কন্যা অপর্ণা ও কল্যাণী ওরফে যথাক্রমে মোনা ও বেবি, পুত্র চিররঞ্জন ওরফে ভোম্বল, বাসন্তী দেবীর সম্পর্কিত ভাই সতীনাথ ওরফে টগর, চিত্তরঞ্জনের দূরসম্পর্কিত আত্মীয় এবং ল' ক্লার্ক ললিতমোহন সেন এবং আমি। তা ছাড়া, একজন আয়া এবং চাকর-বাকর বাবুর্চি খানসামা সমেত আরও ছিল পাঁচ-ছয়জন।

যে বাংলোয় আমরা বাস করতাম, তাতে পাশাপাশি তিনটি শয়নকক্ষ। পশ্চিম প্রান্তের ঘরে চিত্তরঞ্জন এবং বাসন্তী দেবী থাকতেন। মাঝের ঘরে চার কোণে চারটি খাটে আমরা চারজন,—অর্থাৎ ললিতবাবু, টগর, ভোম্বল ও আমি শয়ন করতাম। পূর্ব প্রান্তের তৃতীয় কক্ষে থাকতেন আয়াসহ অপর্ণা এবং কল্যাণী।

মায়াবতী পৌঁছবার দু-তিন দিনের মধ্যেই আমাদের প্রাত্যহিক কার্যক্রম আপনা-আপনি একরকম অনড় অপরিবর্তনীয় ভাবে বেঁধে গেল। অদ্বৈত আশ্রম ও চিরতুষারমালা ভিন্ন মায়াবতীতে চিত্তবিক্ষেপের পক্ষে আর বিশেষ কোনও উপচার না থাকায়, ওরূপ ভাবে কার্যক্রম না বেঁধে উপায় ছিল না।

মায়াবতী নগর তো নয়ই, বস্তুত গ্রামও ঠিক নয়। জনসাধারণ বলতে সাধারণতঃ যা বোঝায়, তার অস্তিত্ব এখানে অবর্তমান। এখানে 'জন'

অর্থেই আশ্রম-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি। আশ্রম-নিরপেক্ষ কোন ব্যক্তির এখানে জমি কিনে গৃহনির্মাণ ক'রে বসবাস করবার উপায় নেই। বাড়ি ভাড়া ক'রে সাময়িক ভাবে বাস করবার কথাই ওঠে না, যেহেতু ভাড়াটে বাড়ির, শুধু অস্তিত্বই নয়, কল্পনাও এখানে নেই। এখানে আশ্রম-নিরপেক্ষ কেউ যদি থাকে তো সে একমাত্র অতিথি;—কিন্তু তাও স্বয়মাগত নয়, আশ্রম কর্তৃক আমন্ত্রিত। সুতরাং সে হিসাবে অতিথিও এখানে সম্পূর্ণ আশ্রম-নিরপেক্ষ ব্যক্তি নয়।

এখানে হাট নেই, বাজার নেই; দোকান নেই, পশার নেই; হোটেল নেই, রেস্তোরাঁ নেই; এমন কি একটা ব্যাঙ্ক পর্যন্ত নেই যে, একদিন টাকা তুলতে গিয়ে একটানা কার্যক্রমের মধ্যে একটু বৈচিত্র্যসাধন করা যায়। থিয়েটার-সিনেমার তো স্বপ্ন পর্যন্ত এখানে নেই। থাকবার মধ্যে শুধু আছে আশ্রম আর তুষার-পর্বত;—অর্থাৎ থোড় আর খাড়া। কিন্তু এমনই সরস ও মধুর, আর এতই বৈচিত্র্যরসে টস্‌টসে থোড় আর খাড়া যে, কোনদিনই আমাদের মুহূর্তের জন্য একঘেয়েমির ক্লান্তিবোধ করতে হয় নি,—কোনরকম একটা বড়ির অভাবের দরুনও নয়।

প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গের পর ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে তাড়াতাড়ি গরম জামাজোড়া চড়িয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম। সম্মুখে দৃষ্টিপাত ক'রে মনে হ'ত, কে যেন তুষার-পর্বতের গায়ে ফিকে এক পোঁছ নীল রঙ মাখিয়ে রেখেছে। দেখে চক্ষু জুড়িয়ে যেত। তারপর মিনিট কুড়ি-পঁচিশ ধ'রে এই নীলাভ রঙ ক্রমশ বেগুনে, রক্তাভ এবং ঘন রক্তবর্ণের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণে পরিণত হ'ত। তুষারের উপর বর্ণবিবর্তনের এই অপরূপ লীলা প্রতিদিন নূতন দৃষ্টি দিয়ে নূতন আনন্দের সহিত উপভোগ করতাম।

পাহাড়ে জায়গায় শীতের দিনে প্রত্যূষের এই সময়টা শয্যার মধ্যে

আর একবার পাশ ফিরে লেপ জড়িয়ে শেষ পালার ঘুম দেওয়া একটা উপভোগের ব্যাপার সন্দেহ নেই। প্রতিদিন রাত্রে শয্যা গ্রহণ ক'রে দেহে লেপ টেনে নিয়ে মনে মনে সঙ্কল্প করি, প্রত্যূষের তুষার দেখা যথেষ্টই তো হ'ল, কাল সকালে ঘরের আর তিনজনের শয্যাত্যাগ করার আগে লেপ ত্যাগ করা কিছুতেই নয়। শীতের দেশে এসে প্রত্যূষের তুষার দেখার অতি-আগ্রহে প্রত্যূষের লেপ থেকে নিজেকে যদি একেবারে বঞ্চিত করি, তা হ'লে মায়াবতী ভ্রমণে খুঁত থেকে যায়। সঙ্কল্প করি, কিন্তু সকালে ঘুম ভাঙলেই কে যেন গায়ে ঠেলা মেরে বলে—চল চল, ছবি দেখবে চল। আজ হয়তো নূতন পোঁচের নূতন আভা। পায়ের দিকে লেপ ঠেলে দিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসি।

ছবি দেখার পালা সাঙ্গ হ'লে হাত-মুখ ধোয়ার ক্ষণকাল পরে আরম্ভ হ'ত চা-পান এবং প্রাতরাশের পর্ব। সকলে মিলে কথোপকথন করতে করতে সে পর্ব শেষ করতে প্রায় ঘণ্টাখানেক অতিবাহিত হ'ত। তারপর চিত্তরঞ্জন ও আমি প্রাতর্ভ্রমণে নির্গত হতাম। এপথ ওপথ, এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে, কোনদিন আশ্রমে অল্প-স্বল্প ঢুঁ মেরে শেষ পর্যন্ত আমরা নিভৃত নির্জন মাদার্স ওয়াকে উপনীত হতাম। সেখানে কিছুক্ষণ গল্পে ও পদচারণায় অতিবাহিত ক'রে বেলা দশটা আন্দাজ আমরা প্রত্যাবর্তন করতাম।

গৃহে ফিরে দেখতাম, কেউ বই পড়ছে, কেউ গল্প করছে, বাসন্তী দেবী হয়তো মধ্যাহ্নভোজনের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত, অপর্ণা হয়তো হারমোনিয়ম খুলে আমার দেওয়া সুরে চিত্তরঞ্জনের রচিত গান অভ্যাস করছেন। আমরা দুজনে ফিরে আসার পর একটা প্রাক্-মধ্যাহ্নভোজন আড্ডা জমতে আরম্ভ করত। গল্পে, আলোচনায়, হাস্যকৌতুকে, একটু-আধটু গান-বাজনায় দেখতে দেখতে আড্ডা চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠত।

আড্ডা যখন চরমে উঠেছে, হঠাৎ এক সময়ে বাসন্তী দেবী দিতেন স্নানাহারের তাড়া। ধীরে ধীরে আড্ডা ভাঙতে আরম্ভ করত। তারপর চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় চতুরঙ্গ আহার-কার্য সমাপনান্তে গুরুভোজন-জনিত অলস দেহ ও মন নিয়ে ক্ষণকাল আলগা কথোপকথনের পর মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামের লালসায় যে যার আপন আপন আস্তানায় গিয়ে আশ্রয় নিত। এই সময়টায় কেউ বই পড়ত, কেউ লিখত, কেউ বা সকল কাজের সেরা কাজ লেপ গায়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত আয়াসে দিবানিদ্রায় মগ্ন হ'ত।

বেলা তিনটে বাজতে না বাজতে পুনরায় মিলিত হবার আগ্রহে আমরা উন্মুখ হয়ে উঠতাম। একে একে সকলে এসে জুটতাম চায়ের বৈঠকে। তখনো চায়ের হয়তো কিছু দেরি আছে;—আরম্ভ হয়ে যেত লঘু চটুল আড্ডা। যথাসময়ে চা এবং বিবিধ খাদ্যবস্তু এসে পড়ত। গুরুভার চা-পানের পর দল বেঁধে অথবা একাধিক দলে বিভক্ত হয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তাম বৈকালিক ভ্রমণে।

সন্ধ্যাকালে ফিরে এসে আরম্ভ হ'ত আমাদের সারাদিনের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈঠক—গানের মজলিস। এ বৈঠকের প্রধান উপকরণ গান হ'লেও, গানের ভিতরে ভিতরে হাস্য-পরিহাস, তর্ক-বিতর্ক, গল্প ও কথোপকথনের দ্বারা সম্প্রসারিত হয়ে বৈঠক হয়ে উঠত বিচিত্র। মাঝে মাঝে এক-আধ-দিন আশ্রমের মহারাজরা এসে কালীকীর্তন করতেন। তার পাল্টা আমরা দিতাম বৈষ্ণব-পদাবলীর গান গেয়ে।

নটা পৌনে নটার সময় ডাক পড়ত নৈশ আহারের। সান্ধ্য-বৈঠক ভেঙে দিয়ে আমরা উপস্থিত হতাম খাবার টেবিলে; কিন্তু সঙ্গে নিয়ে আসতাম আমাদের শেষ আলোচনার সূত্রটুকু। তাই দিয়ে জাল-বোনা আরম্ভ হ'ত আহার-টেবিলের কথোপকথনের।

আহারের পর বসত যৎপরোনাস্তি আনন্দময় ও উত্তেজনাপূর্ণ তাসের বৈঠক। এই বৈঠকের স্থান ছিল মাঝের ঘরে আমার খাটের উপরে, এবং কাল ছিল রাত্রি সাড়ে নটা থেকে আরম্ভ ক'রে যতক্ষণ না চার জোড়া চক্ষু বুজে আসে ততক্ষণ। তাসের বৈঠকের পর ঘরে ঘরে আরম্ভ হ'ত পরিতৃপ্ত দিনাতিপাতের নিশ্চিন্ত নাসিকাগুঞ্জনের ঐকতান।

মনোজ্ঞ আড্ডার দ্বারা মাঝে মাঝে খচিত এই ছিল আমাদের দৈনিক কার্যক্রমের অপরিবর্তনীয় চক্র। যে কাহিনী বলতে উদ্যত হয়েছি, সে কাহিনী তাসের বৈঠকের ঘটনা।

চিত্তরঞ্জন তাস খেলতে যেমন ভালবাসতেন, খেলতে পারতেনও তেমনি অদ্ভুত। ব্রীজ, পোকার কিংবা অপর কোনও ইয়োরোপীয় খেলা তিনি খেলতেন না;—একমাত্র খেলতেন বত্রিশখানা তাসের গ্রাবু খেলা। আর খেলবার সময়ে সেই বত্রিশখানা তাসের এমন বিস্ময়জনক সন্ধান রাখতেন যে, তাঁর গোলামের হাতে নিজের চোদ্দ ধরা দিয়ে বাসন্তী দেবী যে কুপিত হয়ে বলতেন, 'তুমি চুরি ক'রে আমার হাত দেখ,' ওরূপ ঘটনার পৌনঃপুনিকতা দেখে সে কথা একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হ'ত না।

প্রতিদিন আমরা ঠিক একইভাবে দল বেঁধে খেলতে বসতাম। বাসন্তী দেবী আর আমি বসতাম এক দিকে, অপর দিকে বসতেন চিত্তরঞ্জন এবং ললিতবাবু। বাসন্তী দেবী ছিলেন হালদার-বংশের কন্যা; সুতরাং দৈবক্রমে প্রতিযোগিতাটা দাঁড়িয়েছিল ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যের মধ্যে। চিত্তরঞ্জন তাই খেলার নাম দিয়েছিলেন বামুন-বদ্যির, অর্থাৎ বামুন বনাম, বদ্যির খেলা।

এই তাসখেলার বৈঠকের প্রতি চিত্তরঞ্জন সমস্ত দিন সাগ্রহ প্রতীক্ষায় তাকিয়ে থাকতেন; বাসন্তী দেবীর এবং আমার আগ্রহও এর প্রতি কম ছিল না; কিন্তু চতুর্থ খেলোয়াড় ললিতবাবুর পক্ষে আগ্রহ তো বহুদূরের

কথা, এ তাস খেলা হয়েছিল একটা দণ্ড। চিত্তরঞ্জন নিজে একেবারে নির্ভুল খেলতেন; তাই তাঁর খেঁড়ির অর্থাৎ সহ-খেলুড়ির খেলার মধ্যে ভুলভ্রান্তি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। ললিতবাবু ভুল করলেই বিরক্ত হয়ে উঠে তিনি ললিতবাবুকে তিরস্কার করতেন, আর চিত্তরঞ্জনের দ্বারা তিরস্কৃত হ'লেই ললিতবাবুর ভুল করবার শক্তি উৎসাহলাভ করত। ফলে, সমস্ত খেলা জুড়ে ভুল করা আর তিরস্কৃত হওয়া এবং তিরস্কৃত হওয়া আর ভুল করার একটা পাপচক্র চলত। ললিতবাবুর মুখ দেখে মনে হ'ত না, তিনি তাস খেলছেন; মনে হ'ত, যেন কুইনিন গিলছেন। খেলা ভেঙে গেলে তখন তাঁর মুখে হাসি দেখা দিত; কিন্তু সে হাসি বেদনার আবরণ ভেদ ক'রে নিষ্ক্রান্ত দুঃখের বিষণ্ণ হাসি।

এ বিষয়ে একদিন ললিতবাবুর সঙ্গে আমার নিম্নলিখিতভাবে কৌতুকাবহ কিন্তু করুণ আলোচনা হয়।

বিরসমুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ললিতবাবু বলেন, "দেখুন উপেনবাবু, খাসা স্বাস্থ্যকর জায়গা এই মায়াবতী, খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা যা হচ্ছে, তা চরম। বলতে নেই, এই কয়দিনেই আপনাদের সকলের দেহে একটু ক'রে চেকনাই দেখা দিয়েছে। আমার এই কৃশ শরীর দিন দিন আরও কৃশ হয়ে যাচ্ছে কেন জানেন?"

সহানুভূতির কণ্ঠে বলি, "ক্রিমি-দোষটোষ নেই তো?"

বিরক্ত হয়ে ললিতবাবু উছলে ওঠেন, "আরে দূর মশাই, আপনার ক্রিমি-দোষটোষ। এর জন্যে দায়ী আপনাদের ঐ তাস খেলা।"

ব্যাপারটা বুঝতে বাকি থাকে না; তবু নিরীহভাবে বলি, "কেন, তাস খেলা দায়ী কেন?—তাসখেলা তো আনন্দের কথা।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ললিতবাবু উত্তর দেন, "আনন্দের কথা আপনাদের, আমার কিন্তু যার নাম ঠেলা। সায়েবের কাছে বকুনি খেয়ে খেয়ে রোগা

মেরে যাচ্ছি, আর বলেন কিনা—আনন্দের কথা! তিনটে থেকে যেমন যেমন বেলা প'ড়ে আসে, আমার মনও তেমনি অন্ধকার হতে থাকে। রাত্রে খাবার টেবিলে অত রকম তো খাবার; কিন্তু ফাঁসির আগের খাবারে শরীরে রক্ত বাড়ে, না, যে রক্ত থাকে তারও খানিকটা জল হয়ে যায়? বলুন।"

সত্যি। ললিতবাবুর কথা শুনে দুঃখও হয়, হাসিও পায়। যে ইক্ষু-দণ্ড তিনজনকে রস জোগায়, সেই ইক্ষুদণ্ডই চতুর্থ ব্যক্তির পিঠ ভাঙে।

অথচ ললিতবাবুর অত ভুল-ভ্রান্তি সত্বেও ললিতবাবুদের কাছে আমাদের হারার সীমাপরিসীমা থাকে না। আর সে কি সাধারণ হার? যাকে বলে গো-হারান, একেবারে ঠিক তাই। ছক্কা-পঞ্জা-বোম-তিরি—খরবার কুড়িখানা ছুটো তাস শেষ হয়ে আসে। তাই কি একদিন? নিত্য এই ব্যাপার।

ললিতবাবু রঙ খেলেছেন; বাসন্তী দেবীর হাতে রঙের চোদ্দ, অন্য রঙও আছে; হয়তো চিত্তরঞ্জনের হাতে গোলাম নেই—এই ভরসায় কপাল ঠুকে বাসন্তী দেবী চোদ্দ ছাড়েন। সঙ্গে সঙ্গে বাসন্তী দেবীর চোদ্দর ওপর চিত্তরঞ্জনের গোলামের সশব্দ সোল্লাস পতন। স্ত্রী ব'লে বিন্দুমাত্র রেয়াৎ অথবা করুণা নেই।

পরদিন বাসন্তী দেবী স্থান পরিবর্তন ক'রে চিত্তরঞ্জনের দক্ষিণ দিকে বসেন। রঙের খেলা পড়েছে, চিত্তরঞ্জনের খেলবার পালা—ধীরে ধীরে গোলামটি আমার খেলা তাসের উপর স্থাপন ক'রে সপুলক মুখে চিত্তরঞ্জন বাসন্তী দেবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। বাসন্তী দেবীর হাতে একমাত্র রঙ চোদ্দ,—না দিয়ে উপায় নেই। সরোষে চোদ্দখানা ফেলে দিয়ে তর্জন ক'রে ওঠেন, "তুমি দেখে দেখে তাস দাও, দেখে দেখে খেলো।"

সহাস্যমুখে চিত্তরঞ্জন বলেন, "তা ছাড়া কি আর বলবে বল! এ তো

নৈবিদ্যির চাল-কলা নয় যে, গামছা খুলে বাঁধলেই হ'ল। এ বত্রিশখানা তাসের রীতিমতো হিসেব রাখার খেলা।"

নৈবেদ্যর চাল-কলা ব্রাহ্মণদের অপটুতার নির্দেশক।

বাসন্তী দেবী বলেন, "তোমার মতো জোচ্চুরি করলে আমরাও হিসেব রাখার খেলা খেলতে পারি।"

মানুষ যখন জিতের ওপর থাকে, তখন তার মেজাজ থাকে ঠাণ্ডা, মনের ঔদার্য থাকে প্রসারিত, কটূক্তি সহ্য করবার শক্তি থাকে অক্ষুণ্ণ। প্রসন্নকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বলেন, "একবার আমার মতো জোচ্চুরি ক'রে দেখ না, কত হারান হারাতে পার আমাদের।"

এইরূপ একটানা হারের খেলা এবং বাক্‌বিতণ্ডা প্রতিদিনই চলে।

একদিন কিন্তু অকস্মাৎ চাকা ঘুরল। পড়তা ব'লে একটা জিনিস সব তাতেই দেখা যায়,—তাসে তো বিশেষভাবে। সেই পড়তা দেখা দিলে আমাদের দিকে; বিজয়লক্ষ্মী সেদিনকার খেলার প্রারম্ভ থেকেই প্রসন্ন হলেন আমাদের প্রতি। ছক্কার পর ছক্কা, পঞ্জার পর পঞ্জা—যাকে বলেছিলাম গো-হারান, একেবারে ঠিক তাই। জিতের পর জিতে আমাদের উৎসাহ যত বেড়ে চলে, হারের পর হারে অপর পক্ষের মনের বল তত কমতে থাকে।

স্রোতের গতি ফেরাবার জন্য চিত্তরঞ্জন ভাল ক'রে হিসাবপত্র রেখে মনস্থির ক'রে খেলতে সচেষ্ট হন; কিন্তু গোলাম চোদ্দ টেক্কা যদি আমাদের হাতে আসে, তা হ'লে হিসাবপত্রের যে কোন পরিমাণ, বন্যার মুখে তৃণখণ্ডের ন্যায় ভেসে চ'লে যেতে বাধ্য হয়। পরাজয়ের মেঘসঞ্চার দেখে ঝটিকার আশঙ্কায় ললিতবাবুর মুখ শুকিয়ে ওঠে।

ওদিকে চিত্তরঞ্জন মনে মনে বারুদ হয়ে উঠেছেন। তাঁর রুষ্ট বিরস মুখের উপর বারুদের ছাপ এসে পড়েছে। মকদ্দমাতেই হোক অথবা

তাস খেলাতেই হোক, কোন আকারেরই পরাজয় বরদাস্ত করবার অভ্যাস তাঁর নেই। অবস্থা তখন এমন হয়ে এসেছে যে, একটিমাত্র স্ফুলিঙ্গপাতের অপেক্ষা, তার পরই বিস্ফোরণ।

বেশি বিলম্ব হ'ল না—ক্ষণকাল পরেই সহসা স্ফুলিঙ্গপাত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বিস্ফোরণও ঘটল।

এক সময়ে বাসন্তী দেবী স্মিতমুখে আমাকে বললেন, "দেখেছেন উপেনবাবু, প্রতিদিন জোচ্চুরি ক'রে জেতেন,—আজ আমরা একটু সতর্ক হয়েছি, আর হারের কাণ্ডখানা দেখুন!"

বাস্! আর যায় কোথায়! জিতের ওপর যে 'জোচ্চুরি' শব্দ হাসিমুখে পরিপাক করা গিয়েছিল, হারের মুখে তা অসহ্য হয়ে উঠল। রোষায়িত লোচনে বাসন্তী দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বললেন, "কিঃ! আমি জোচ্চোর?—আমি জোচ্চোর?—আমি জোচ্চোর?—তবে এইঃ!" ব'লে দু হাতে এক গোছা তাস ধ'রে পড়্-পড় ক'রে ছিঁড়ে শয্যার ওপর ফেলে দিয়ে ঘর থেকে দুদ্দাড় ক'রে বেরিয়ে গেলেন। তখন রাত্রি প্রায় এগারোটা; চিত্তরঞ্জন কিন্তু তাঁর শয়নকক্ষে প্রবেশ না ক'রে তক্তা-বাঁধানো খোলা বারান্দার উপর খটাখট খটাখট ক'রে বেড়িয়ে বেড়াতে লাগলেন, প্রবল উত্তেজনার বশে মস্তিষ্কে যে রক্তাধিক্য উপস্থিত হয়েছিল, তুষারস্পৃক্ত বায়ুর সংস্পর্শে বোধ হয় তা কতকটা প্রশমিত করবার উদ্দেশ্যে।

একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘ'টে গেল। লাল টকটকে মুখ নিয়ে বাসন্তী দেবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন; তারপর সহসা এক সময়ে আমাকে লক্ষ্য ক'রে বললেন, "কি ছেলেমানুষ দেখুন, প্রতিদিন আমাদের কত কথা শোনান,—আজ আমি সামান্য একটা কথা বলেছি, আর রেগে অগ্নিশর্মা!"

সান্ত্বনা দেবার উদ্দেশ্যে বললাম, "এ এমন কিছুই নয়। নামে খেলা হ'লেও, এর চেয়ে অনেক বড় বড় কাণ্ডও খেলার মধ্যে ঘটতে দেখা যায়।" মনে মনে বললাম, শুধু তাস ছিঁড়েই তিনি নিরস্ত হয়েছেন, রেগে মেগে আমাদের লেপ ছিঁড়েই যে দেন নি, এর জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

আর কিছু না ব'লে বাসন্তী দেবী ধীরে ধীরে স'রে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও যে যার শয্যায় লম্বা দিয়ে লেপ মুড়ি দিলাম।

তখনও বারান্দায় ত্বরিত পদের শব্দ শোনা যাচ্ছে, খটাখট খটাখট।

তুষার দেখবার নেশায় প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করি সে কথা সত্যি, কিন্তু তাই ব'লে শেষরাত্রে করি নে। চার কোণে চারজন নিশ্চিন্ত সুখে নাক ডাকাচ্ছি, এমন সময়ে রুদ্ধ দ্বারে প্রচণ্ড শব্দ—ধাঁই ধাঁই ধাঁই ধাঁই। তড়িৎসংযুক্তের মতো চার কোণে চারজন ধড়মড় ক'রে উঠে বসি। কি ব্যাপার!

"উপেনবাবু জেগে আছেন?"

চিত্তরঞ্জনের কণ্ঠস্বর। মনে মনে কাতরভাবে উত্তর দিই, "আজ্ঞে, ছিলাম না।' প্রকাশ্যে বলি, "আছি।"

"একবার বেরিয়ে আসুন তো!"

তাড়াতাড়ি গরম বস্ত্র পরতে আরম্ভ করি। তিন কোণে তিনজন পুনরায় শুয়ে প'ড়ে লেপ মুড়ি দেয়।

দোর খুলে চিত্তরঞ্জনকে দেখে ঈষৎ চিন্তিত হয়ে বলি, "কি বলুন তো? শেষরাত্রে যে!"

চিত্তরঞ্জন বলেন, "না না, শেষরাত্রি কোথায়? চারটে অনেকক্ষণ বেজে গেছে।" এক মুহূর্ত অপেক্ষা ক'রে বলেন, "কাল রাত্রে ভার

অন্যায় হয়ে গেছে। বাসন্তী ভয়ানক রাগ করেছে। আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা ক'চ্ছে না। বলেছে, আর তাস খেলবে না।"

বুঝতে বাকি থাকে না, শেষোক্ত কথাটাই হয়েছে আসল চিন্তার কারণ। যে সান্ত্বনা বাসন্তী দেবীকে দিয়েছিলাম, চিত্তরঞ্জনকেও তাই দিই, বলি, "ও এমন কিছুই হয় নি। খেলতে খেলতে অমন কত হয়ে থাকে। রাগের মাথায় খেলবেন না বলছেন; নিশ্চয় খেলবেন।"

ব্যগ্রকণ্ঠে চিত্তরঞ্জন বলেন, "না না, বুঝছেন না আপনি—ভারি বেঁকে বসেছে। আপনি খেলবার জন্যে অনুরোধ করবেন, তা হ'লে খেলবে।"

"নিশ্চয় অনুরোধ করব।"

"চা-খাবার আগে করবেন।"

"তাই করব।"

চা-পানের পূর্বেই বাসন্তী দেবীর নিকট কথাটা একান্তে উত্থাপিত করি। বলি, "শোবার আগে খানিকক্ষণ তাস না খেললে সারা রাত তাসের স্বপ্ন দেখতে হবে। সুনিদ্রা হবে না।"

পূর্বরাত্রের ক্ষোভের থমথমে ভাব তখনও বাসন্তী দেবীর মুখে সামান্য একটু লেগে ছিল। ঈষৎ গভীর স্বরে বলেন, "বেশ তো, খেলবেন।"

স্মিতমুখে বলি, "যেমন প্রতিদিন খেলি, সেইভাবেই তো?"

মাথা নেড়ে বাসন্ত ী দেবী বলেন, "না, সে ভাবে নয়। আমি আর খেলব না।"

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলি, "তবে আমার পার্টনার হবে কে?"

বাসন্তী দেবী বলেন, "কেন, টগর।"

বলি, "রাজী আছি, যদি আপনি দাশ সাহেবের সঙ্গে বসেন। তা হলে—" কথাটা শেষ করি নে।

বাসন্তী দেবী কিন্তু কথাটা অনুক্ত থাকতে দেন না; জিজ্ঞাসা করেন, "তা হ'লে কি হয়?"

মনে মনে বলি, তা হ'লে ললিতবাবুর হাড়ে শুধু বাতাসই লাগে না, মাংসও একটু লাগে। মুখে বলি, "তা হ'লে আপনার চোদ্দগুলো অনেকটা নিরাপদ হয়।"

সবেগে মাথা নেড়ে বাসন্তী দেবী বলেন, "আমার চোদ্দ নিরাপদ হয়ে কাজ নেই। অমন ছেলেমানুষের সঙ্গে কিছুতেই খেলা হবে না।"

খেলায় ছেলেমানুষেরই অগ্রাধিকার,—সুতরাং ছেলেমানুষের সঙ্গে

খেলা করার স্বপক্ষে কয়েকটি সারগর্ভ যুক্তি দেখাই। যুক্তিগুলি ধৈর্য-সহকারে শুনেও বাসন্তী দেবী মাথা নাড়েন, না, কিছুতেই নয়।

অগত্যা তখনকার মতো রণে ভঙ্গ দিই।

চা-পানের পর পথে বেরিয়েই চিত্তরঞ্জন জিজ্ঞাসা করেন, "বলেছেন বাসন্তীকে?"

বলি, "বলেছি, কিন্তু রাজী হতে চান না। সত্যিই, বেশ একটু বেঁকে রয়েছেন।"

ঈষৎ অধীরভাবে চিত্তরঞ্জন বলেন, "কিন্তু তা বললে তো চলবে না উপেনবাবু, রাজী আপনাকে করাতেই হবে।"

বলি, "শেষ পর্যন্ত রাজী নিশ্চয়ই হবেন। খেলার বিবাদ বেশিক্ষণ টেঁকে না।" এ কথায় আশ্বাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে একটি গল্পের অবতারণা করি। গল্প শুনতে চিত্তরঞ্জন অতিশয় ভালবাসতেন, নিবিষ্টমনে গল্প শুনতে থাকেন।

ভবানীপুরে আমাদের বাড়ির ঠিক সামনে এক বৃদ্ধ বাস করত। তার সমবয়স্ক অপর এক বৃদ্ধ যখন-তখন এসে তার সঙ্গে দাবা খেলত। দাবা খেলার বিষয়ে বৃদ্ধ দুজনের সময়—অসময়ের কোনো বিবেচনা ছিল না। দেখা হওয়া, আর দাবার ছক পেতে দুজনে মুখোমুখি উবু হয়ে বসা।

সে সময়ে ভবানীপুরে আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ড্রেন হয় নি। সদর-দরজার সম্মুখে কাঁচা ড্রেনের ওপর সিমেণ্ট-বাঁধানো সাঁকো; তার দু ধারে দুই মঞ্চ; প্রত্যেক মঞ্চে জন তিনেক লোক বসতে পারে। তারই একটি মঞ্চে উবু হয়ে ব'সে দুই বৃদ্ধ দাবা খেলত। খেলতে খেলতে তাদের তর্ক-বিতর্ক চেঁচামেচির অন্ত থাকত না। সময়ে সময়ে অবস্থা এমন হয়ে উঠত যে, মনে হ'ত মুখের ঝগড়া হাতেই বুঝি নেমে আসে।

একদিন বেলা দশটার সময়ে দুজনে মুখোমুখি উবু হয়ে খেলতে বসেছে। খেলা কিন্তু আরম্ভ হতে পারছে না। প্রথমে কে চালবে তাই নিয়ে বিষম ঝগড়া বেধেছে। ঝগড়াটা বোধ হয় পূর্বদিনের কোনও বিবাদের জের।

ঝগড়ার এক সময়ে দুই বৃদ্ধের মধ্যে একজন চীৎকার ক'রে উঠল, "কাল কে হেরেছিল আর জিতেছিল, সে কথা কালই শেষ হয়ে গেছে। আজকে আমার প্রথমে চালবার অধিকার আছে।"

ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে অপর বৃদ্ধ বললে, "কি তোর অধিকার, শুনি?"

প্রথম বৃদ্ধ বললে, "তুই শুদ্দুর, আমি ব্রাহ্মণ—তাই আমি আগে চালব।"

উত্তরে চোখ পাকিয়ে দ্বিতীয় বৃদ্ধ বললে, "এ কি বাপের ছেরাদ্দো হচ্ছে যে, বামুন ব'লে তুই আগে চালবি?"

আর যায় কোথায়! প্রথম বৃদ্ধ গর্জন ক'রে উঠল, "তবে রে হারামজাদা! শুদ্দুর হয়ে তুই আমাকে বাপের ছেরাদ্দো দেখাস!"

তারপর লেগে গেল হাতাহাতি, ধ্বস্তাধ্বস্তি; অবশেষে জাপটাজাপটি ক'রে উভয়ে ফুট—তিনেক নীচে একেবারে ঘন থক্‌থকে কৃষ্ণদধির ড্রেনের ভিতরে ঝপাং। ইতিপূর্বেই পথে লোক জ'মে গিয়েছিল; তাদের মধ্যে জন দুই যখন দয়াপরবশ হয়ে দুজনকে টেনে তুললে, তখন ড্রেনের পঙ্কিলতা উভয়কে এমন অভিন্ন আবরণে এক ক'রে দিয়েছে যে, কে বামুন কে শুদ্দুর তা নির্ণয় করবার উপায় নেই।

আমরা ভাবলাম, বাঁচা গেল, এর পর নিশ্চয়ই উভয়ের মধ্যে মুখদেখাদেখি থাকবে না। কিন্তু হরি, হরি! সেই দিনই বৈকালে দেখি মঞ্চের উপর মুখোমুখি উবু হয়ে ব'সে যেন অনালোড়িতপূর্ব সৌহৃদ্যের সঙ্গে দুজনে বোড়ে টিপছে। ঘণ্টা-পাচেক পূর্বে জড়াজড়ি ক'রে উভয়ে

যে ড্রেনে পড়েছিল, উভয়ের তৈলচিক্কণ দেহে তার কোনও চিহ্ন যেমন নেই, উভয়ের আচরণের মধ্যেও তেমনি তার পরিচয়ের একান্ত অভাব।

গল্প শুনে চিত্তরঞ্জন বললেন, "গল্পটি আপনার ভাল, তবে আমাদের ক্ষেত্রে এ গল্প ঠিক খাটে না, কারণ এ গল্পে উভয় পক্ষই সমান অপরাধী। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে, বলতে গেলে, এক পক্ষই অপরাধী। আপনি ফিরে গিয়ে আবার ভাল ক'রে বলবেন।"

বললাম, "নিশ্চয়ই বলব।"

সেদিন আমরা একটু শীঘ্র শীঘ্রই গৃহে ফিরি।

বাসন্তী দেবীকে একান্তে পেয়ে সনির্বন্ধে বলি, "দয়া ক'রে আপনাকে পুনর্বিবেচনা করতেই হবে।"

মাথা নেড়ে বাসন্তী দেবী বলেন, "না, না, বিবেচনা যা করেছি, তার আর পুনর্বিবেচনা নেই।"

তখন মনে মনে বাগ্‌দেবীর শরণাপন্ন হয়ে কলকাতা হাইকোর্টের একজন পরাক্রান্ত ব্যারিস্টারের পক্ষ অবলম্বন ক'রে বেশ খানিকটা ওকালতি করি।

ওকালতি ফলপ্রদ হয়। মনে মনে একটু কি চিন্তা ক'রে বাসন্তী দেবী বলেন, "দেখুন উপেনবাবু, আপনার অনুরোধে প'ড়েই হোক বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, খেলতে শেষ পর্যন্ত হবেই; কিন্তু তার আগে ওঁকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

উত্তরে বলি, "দণ্ডের দ্বারা যদি শিক্ষা দেওয়ার আপনার অভিপ্রায় থাকে, তা হ'লে আমার নিবেদন—সে শিক্ষা যথেষ্ট দেওয়া হয়েছে। এর পরও আপনার দণ্ডের ভার বাড়তে থাকলে ও-পক্ষের অপরাধ কি ক্রমশ লঘু হতে থাকবে।"

বাসন্তী দেবী চুপ ক'রে থাকেন। লক্ষণ শুভ ব'লে মনে করি।

কিছুক্ষণ পরে দেখি, উৎফুল্ল মুখে চিত্তরঞ্জন আমার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। নিকটে এসে স্মিতমুখে বলেন, "উপেনবাবু, বাসন্তী খেলতে রাজী হয়েছে।"

মনে মনে হেসে ফেলি, মুখেও বোধ হয় সে হাসির খানিকটা আভাস ভেসে আসে; বলি, "খুবই আনন্দের কথা।"

চিত্তরঞ্জন বলেন, "এ শুধু আপনার অনুরোধেই হ'ল।"

মাথা নেড়ে বলি, "না না, তা কেন! আপনার অনুরোধই কি তিনি শেষ পর্যন্ত অমান্য করতে পারতেন!" মনে মনে বলি, বাইরের জলসেচনের ফলে অঙ্কুর উদ্গত হয় বটে, কিন্তু উদ্গত হবার মূল কারণ মাটির ভিতরেই লুকিয়ে থাকে।

সেদিন চ-পানের পর একটু সকাল সকালই আমরা বৈকালিক ভ্রমণে নির্গত হই। বাসন্তী দেবী রাত্রে তাস খেলতে যে স্বীকৃত হয়েছেন, তার কৃতজ্ঞতায় ভরপুর চিত্তরঞ্জনের মন তাঁর প্রতি সুপ্রকাশ আগ্রহে উদগ্র হয়ে আছে। পথ চলতে চলতে হঠাৎ এক সময়ে তিনি বলেন, "দেখ, দেখ বাসন্তী, চেয়ে দেখ, আজকের আকাশটা কি 'ওয়াণ্ডারফুলি' নীল! তুমি বেশ ক'রে ভেবে দেখ, প্রতিদিন এতটা নীল আকাশ দেখতে পাওয়া যায় না।"

আরক্ত মুখে বাসন্তী দেবী নিত্যকার মতোই সাধারণ নীল আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। মেয়েরা মুখ ফিরিয়ে বোধ করি মুখ টিপে টিপে হাসে। মনে মনে আমি বলি, আকাশে নীল যেমন থাকে তেমনিই আছে;—শুধু 'নয়নে তোমার নীল অঞ্জন লেগেছে, নয়নে লেগেছে'।

ক্ষণকাল পরে পাহাড়ের গা থেকে একটা অতি ক্ষুদ্র ফুল ছিঁড়ে নিয়ে বাসন্তী দেবীর হাতে দিতে দিতে চিত্তরঞ্জন বলেন, "দেখ, দেখ বাসন্তী, চেয়ে দেখ, সামান্য একটি ফুল; অবহেলায় অনাদরে পাহাড়ের

গায়ে ফুটে থাকে, কেউ ভুলেও একবার চেয়ে দেখে না; অথচ এর মধ্যে কত বিচিত্র কলাকৌশল, কি অপরূপ 'কালার স্কিম' ! আমি ভাবি, কেই বা কোথায় ব'সে এসব করে, আর কিসের জন্যেই বা করে! খুব অদ্ভুত নয় কি ?"

ফুলটি নিজের হাতে গ্রহণ ক'রে সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বাসন্তী দেবী বলেন, "হ্যাঁ, অদ্ভুত।"

আমিও মনে মনে বলি, অদ্ভুত! অদ্ভুত এই সাক্ষীর-বাপের-নাম-ভোলানো দুর্দান্ত ব্যারিস্টারের সঙ্গে বালকের চেয়েও বালক চিত্তরঞ্জনের নিরন্তর একত্র বাস! এ চিত্তরঞ্জনকে দেখলে কে বলবে, এ সেই ভাগলপুরের এজলাসে হাকিম-নিয়ে-ছিনিমিনি-খেলা করা ব্যারিস্টার সি. আর. দাশ ?

সে রাত্রে যথাকালে যথারীতি তাসের বৈঠক বসে। কিন্তু উভয় পক্ষকে উভয় পক্ষের কোনো প্রকার ক্ষোভ না দেওয়ার অতি-সচেতনতা-বশত সেদিনকার খেলা ঠিকমতো জমতে পারে না। কিন্তু সে ঐ এক রাত্রির জন্য। পরদিন থেকে বিবাদ-বিতর্কমণ্ডিত হয়ে পুনরায় বৈঠক পূর্বের মতোই মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

তাস খেলার এই কাহিনীর সঙ্গে আর একটি অতি ক্ষুদ্র উপকাহিনী জড়িত আছে। সেই উপকাহিনীটিকে এখানে স্মরণ করলে আশা করি সুরসিক পাঠক-পাঠিকাগণ খুশিই হবেন।

মায়াবতী পৌঁছানোর পর দু-চার দিন কামিয়েই অনাবশ্যক বোধে চিত্তরঞ্জন দাড়ি-গোঁফ কামানো বন্ধ ক'রে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ বেরিয়ে মুখ একেবারে চ্যাড়বেড়িয়ে উঠল। জেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর ক্ষৌরকার্য করবার পূর্বে যে রকম আকৃতি হয়েছিল, চেহারাটা কতকটা যেন সেই পথেই পা বাড়িয়েছে

হঠাৎ একদিন খেয়াল হয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বাসন্তী দেবী বললেন, "আচ্ছা, দাড়ি-গোঁফ কামাও না কেন বল তো? দাড়ি-গোঁফ না কামিয়ে চেহারাটা কেমন চমৎকার হয়েছে, একবার আয়নায় তাকিয়ে দেখেছ?"

উত্তরে চিত্তরঞ্জন সেদিন যে কথা বলেছিলেন, জীবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়ে বুঝতে পারি, কত মূল্যবান সে কথা। চিত্তরঞ্জন বলেছিলেন, "আঃ বাসন্তী, তুমি স্ত্রীলোক, দাড়ি-গোঁফ কামানোর দুঃখ তুমি কি ক'রে বুঝবে? কলকাতায় থাকি, ভাগলপুরে থাকি, সভ্য-সমাজে চলা-ফেরা করি, দাড়ি-গোঁফ কামাতে বাধ্য হই। এই সমাজ-সম্প্রদায়হীন মায়াবতীতে এসেও যদি সেই দাড়ি-গোঁফ কামানোর দুঃখ ভোগ করতে হ'ল, তা হ'লে এত খরচপত্র ক'রে এই দুর্গম স্থানে কেন এলাম বল দেখি?"

এ কথার সমীচীন উত্তর বাসন্তী দেবী সেদিন হয়তো খুঁজে পান নি; কিন্তু বিরোধ-নিবৃত্তির পরদিন সকালে চিত্তরঞ্জন যখন চা-পান করবার জন্য চায়ের টেবিলে উপস্থিত হলেন, তখন দেখা গেল গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে তিনি পরিচ্ছন্ন হয়েছেন।

সুধী পাঠকপাঠিকাগণের নিকট এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

৬

পূর্বেঃ বলেছি, মায়াবতীতে নিমন্ত্রিত অতিথিগণের বাসের জন্য একটি অতিথিশালা বা 'গেস্ট হাউস' আছে। সাধারণত সেই গৃহটিই অতিথিগণের বাসের জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষ সম্ভ্রান্ত অতিথি হ'লে অথবা অতিথি-পরিবারের সদস্যসংখ্যা অধিক হ'লে, আমরা যে গৃহে অবস্থান করছি, সেই 'মাদার্স কট' বাংলোটি ব্যবহার করবার জন্য দেওয়া হয়।

আশ্রমের কর্তৃপক্ষ কিন্তু সেই সাধারণ অতিথিশালাটিও আমাদের ব্যবহারের জন্য অর্পণ করেছিলেন। বাসের উদ্দেশ্যে অবশ্য নয়, আমাদের বসবাসের পক্ষে মাদার্স কট বাংলোই যথেষ্ট প্রশস্ত ছিল। তাঁরা ঐ গৃহটিতে চিত্তরঞ্জন এবং আমার লেখাপড়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। 'মালঞ্চ' এবং 'সাগর-সঙ্গীতে'র কবি, 'নারায়ণ' মাসিক-পত্রিকার সম্পাদক চিত্তরঞ্জন দাশ তো নিঃসন্দেহ একজন লেখক; 'যমুনা' 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি মাসিক-পত্রের গল্প-লেখক এবং এবং 'সপ্তক' নামক গল্প-পুস্তকের গ্রন্থকার হিসাবে আশ্রম-কর্তৃপক্ষ আমাকেও একজন লেখক ব'লে গণ্য করেছিলেন। কাব্য এবং কাহিনীর সৃষ্টিভূমিরূপে তাঁদের অতিথি-শালাটি ধন্য হবে, এই অভিলাষে তাঁরা তথায় আমাদের সাহিত্য-সাধনার ক্ষেত্র রচিত ক'রে রেখেছিলেন।

পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত হওয়ার পর একদিন সকালবেলা চিত্তরঞ্জন বললেন, "এ পর্যন্ত একদিনও আমাদের লেখার আড্ডায় যাওয়া হ'ল না,—এ কিন্তু ভারি খারাপ দেখাচ্ছে উপেনবাবু। আজ চা খাওয়ার পর চলুন সেইখানেই যাওয়া যাক।"

খুশি হয়ে বললাম, "বেশ, তাই চলুন।"

চা-পানের পর অতিথিশালায় উপস্থিত হয়ে গৃহ দেখে বেশ ভাল লাগল। সুনির্মিত পরিচ্ছন্ন একটি মনোরম গৃহ; পাশাপাশি দুখানি চতুষ্কোণ ঘর। ঘরের কোলে দু পাশে দুটি টানা বারান্দা। বারান্দায় দাঁড়ালে চতুর্দিকের দৃশ্য দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়।

আমাদের সাধন-মন্দিরের বহিরাবরণ তো তৃপ্তিপ্রদ, কিন্তু ভিতরের ব্যবস্থা দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গেলাম।

অতিথিশালার অভ্যন্তর ভাগ সদ্য চুনকাম করার দরুন ঝকঝক করছে। দুটি ঘরের মধ্যস্থলে দুজন লেখকের লেখাপড়ার উপযুক্ত দুই প্রস্থ সম্ভ্রান্ত আয়োজন। সে আয়োজনের চেয়ার নূতন, টেবিল নূতন, টেবিলের উপরকার দোয়াতদান নূতন, দোয়াতদানে আঁটা কলমদানের ডালে ডালে নূতন কলমগুলির মুখে ঝিক্‌ঝিক করছে নূতন নিব। নূতন ব্লটিং প্যাডের ব্লটিং কাগজের সারা আয়তনের মধ্যে কোথাও একটু মসীর স্পর্শ খুঁজে পাবার উপায় নেই। পিতলের কাগজচাপাগুলির দেহে নূতনত্বের রসান এখনো পরিপূর্ণ উজ্জ্বলতায় বর্তমান।

ঘরের কোণে নূতন জলপাত্রের উপর রাখা কাচের গেলাসটিও যে এই নূতনত্বের সমারোহের মধ্যে পূর্বব্যবহৃত পুরাতন বস্তু নয়, সে কথা হলপ নিয়ে বলা যেতে পারে।

সবই তো সুন্দর, কিন্তু সাধনক্ষেত্রের এই অনাবিল পরিচ্ছন্নতার মধ্যে সিদ্ধির পথ খুঁজে পাওয়া সহজ হবে তো? এই ছিমছাম পারিপাট্যের ভিতর অবস্থান ক'রে লছমীপুর মামলার কাগজপত্র হয়তো দেখা চলে; কিন্তু কাব্যরচনা?—কাহিনী-সংগঠন? সন্দেহ ভরে মন মাথা নাড়ে। নিখুঁত পরিবেশের মধ্যে কোথাও এমন একটু ভাঙাচোরা, এমন একটু ছেঁড়া-

খোঁড়া অথবা একটু ধুলো-ময়লা নেই, যার উপর আশ্রয় ক'রে মন সহজ হতে পারে। হাজার হোক, মানুষের মনই তো?—কলের মন তো আর নয়?

যাই হোক, চেষ্টা ক'রে দেখতে ক্ষতি নেই মনে ক'রে, দু ঘরে দু জনে ব'সে পড়া গেল। মধ্যে দরজা খোলা। সামনাসামনি আমরা বসেছি, সুতরাং কে কি করছে, না করছে, দেখতে পাওয়ার উন্মুক্ত সুযোগ বর্তমান। কলমদান থেকে কলম তুলে নিয়ে দেখি, দু দিকে দুই দোয়াতে দু রকমের কালি—কালো আর লাল। লাল কালি দেখে মনে মনে হেসে আর বাঁচি নে। কালোই হালে পানি পায় কি না তার ঠিক নেই, তার ওপর আবার লাল!

যাই হোক, মিনিট পাঁচেক ধ'রে সুগভীর নিদিধ্যাসনের পর লেখবার বিষয়বস্তু ঠিক ক'রে নিয়ে উৎফুল্ল মুখে কালো কালির দোয়াতে কলম ডোবাই; তারপর সবেগে লিখতে আরম্ভ করি—

Babu Ramanimohan Ganguli
Athol Cottage
Simla (Punjab)

Babu Jatinath Ghosh
Station Road,
Bhagalpur (Bihar)

Srimati Bibhabati Ganguli,
27, Beltala Road,
Bhowanipur, Calcutta,
(Bengal) [India].

তারপর, হঠাৎ লিখি—

কি যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে !

অবশ্য, মায়াবতীর অতিথিশালায় ব'সে আশীবিষে দংশনের কথা খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক হয়, কারণ মায়াবতীতে আশীবিষ নেই, তার বদলে আছে বড় বড় জোঁক ; কিন্তু আমার রচনার যা পরিকল্পনা, তাতে আশীবিষের কথাই লিখি, আর জোঁকের কথাই লিখি, কিছুই অপ্রাসঙ্গিক হয় না ; সুতরাং লিখি—

এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে, বাদল ঝরঝরে,
তপনহীন ঘন তমসায়।

পুনরায় বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনদের আর এক ঝাঁক ঠিকানা লিখি। হঠাৎ খেয়াল পড়ে লাল কালির দোয়াতে। কালো কালির কলম রেখে দিয়ে নূতন একটা কলম তুলে নিয়ে তাতে চোবাই ; তারপর যত ঠিকানার ডাকঘরের নামগুলো লাল কালি দিয়ে রেখাঙ্কিত করি। সে কার্য শেষ হ'লে লাল ও কালো কালির সাহায্যে ছবি আঁকতে বসি।

ওদিকে ও-ঘরে সুতীব্র চিন্তার তাড়সে চিত্তরঞ্জনের মুখ হয়ে উঠেছে কঠোর ; চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে চুলগুলো উস্কোখুস্কো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দোয়াতে কলম ডোবাচ্ছেন, কিন্তু কালি কাগজে অবতরণ করবার বাগ পাচ্ছে না ; কলমের কালি কলমেই শুকিয়ে যাচ্ছে, আবার কলম ডোবাচ্ছেন। বুঝতে পারছি, ছন্দ হাত-পা গুটিয়েছে, ভাব কোটরপ্রবিষ্ট হয়েছে।

এ ঘরে, আমি ছবি আঁকা ছেড়ে আবার অবিরত ঠিকানা লিখে

চলেছি। চিত্তরঞ্জন মাঝে মাঝে চেয়ে দেখেন আর ভাবেন. আমার গল্পলেখা হয়তো বা আধখানাই শেষ হয়ে এল। আমার লেখার অসচ্ছলতাই বোধ করি তাঁর লেখন-শক্তিকে আরও পঙ্গু ক'রে দিয়েছে। হয়তো তিনি মনে করেন, এই সামনা-সামনি দেখতে পাওয়ায় অসুবিধা না থাকলে কিছু সুবিধা তিনি করতে পারতেন।

'উঃ' শব্দ ক'রে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে এগিয়ে এসে মধ্যবর্তী দরজার এক পাশে ঠেলা সবুজ রঙের ভারী পুরু পর্দাটা দরজা জুড়ে টেনে দেন। আমিও অন্তরিত হয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে পুনরায় চিত্রাঙ্কণে মনোনিবেশ করি।

মিনিট দশেক পরে পর্দাটা ঈষৎ ন'ড়ে ওঠে। তাকিয়ে দেখি, এক পাশে পর্দাটা সামান্য একটু স'রে গেছে, আর সেই ফাঁকে একখানা চশমার দুটো পুরু লেন্স আগুনের মতো গনগন করছে। জিজ্ঞাসা করি, "কিছু লিখলেন নাকি?"

পর্দা সরিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ ক'রে চিত্তরঞ্জন বলেন, "একটা অক্ষরও নয়। আপনি?"

দুখানা স্লিপ লিখেছিলাম; চিত্তরঞ্জনের হাতে দিয়ে বলি, "এই লিখেছি।"

স্লিপ দুখানায় এক মুহূর্ত চোখ বুলিয়ে চিত্তরঞ্জন হো-হো ক'রে হেসে ওঠেন। বলেন, "চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক। এ বাড়িতে কোনদিন কিছু হবে না।"

স্লিপ দুখানা টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে একেবারে টাটকা নতুন ওয়েস্ট-পেপার-বাস্কেটে ফেলে দিয়ে দুজনে বেরিয়ে প'ড়ে সোজা উপস্থিত হই নিভৃত-নির্জন মাদার্স ওয়াকে।

'মায়াবতী'তে থাকতে চিত্তরঞ্জন কয়েকটা গান রচিত করেছিলেন,

আমিও কিছু লেখা লিখেছিলাম; কিন্তু সে সবই শব্দ-কোলাহলময় নানা-বাধাবিঘ্ন-আকীর্ণ মাদ্রাস কটেই ব'সে। অনাবিল শান্তিমণ্ডিত ঠায়-ঠিক ছিমছাম অতিথিশালায় সেই এক দিনেই প্রথম দিন আরম্ভ হয়েছিল এবং শেষ দিন শেষ হয়েছিল।

যে সময়ে আমরা মায়াবতী যাই, তখন অদ্বৈত আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রজ্ঞানন্দ স্বামী।

আমরা হচ্ছি সংসারানন্দ স্বামী। একমাত্র স্ত্রী গ্রহণের ফলে আমরা স্বামী হই; এবং সেই স্ত্রীরত্নকে মধ্যমণিরূপে সংসারের কেন্দ্রে স্থাপিত ক'রে তার চতুর্দিকে আনন্দের অনুসন্ধান ক'রে বেড়াই। এ ব্যাপারটা বিশেষ জটিল নয়, সুতরাং এর তত্ত্ব কতকটা বুঝি।

কিন্তু স্ত্রী পরিত্যাগ করার পর, অথবা কৌমার্য অবস্থা সত্ত্বেও, যাঁরা স্বামীত্ব লাভ করেন, তাঁদের ব্যাপারটা জটিল ব'লে মনে হয়। আমরা অর্ধাঙ্গ স্বামী, এঁরা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ। আমরা স্বামী শুধু স্ত্রীলোকদেরই, এঁরা স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলের। স্ত্রী নেই ব'লে সকল স্ত্রীলোকই এঁদের অবলীলাক্রমে স্বামী ব'লে সম্বোধন করতে পারে। থাকলে, হয় চুলোচুলি, নয় লাঠালাঠি, নয় দুই-ই লেগে যেত।

এই স্বামীজীদের প্রতি আমার মন শ্রদ্ধাশীল নিশ্চয়ই; কিন্তু শ্রদ্ধা জিনিসটাই একেবারে ষোল-আনা খাঁটি নয়, খানিকটা উদ্বেগ, কতকটা ভয় তার সঙ্গে অনিবার্যভাবে মিশে থাকে। এখন অবশ্য আমার দু-চার জন স্বামী-বন্ধু হয়েছেন, এখনকার কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যে সময়কার কথা বলছি তখন, নববিবাহিতা স্ত্রীর যেমন স্বামীর প্রতি ভালবাসা এবং ভয় দুই-ই থাকে, আমার মনেরও কতকটা সেই অবস্থা ছিল।

আমাদের নিমন্ত্রণ জানাতে ও মায়াবতী আসবার ব্যবস্থা করতে

অদ্বৈত আশ্রমের পক্ষ থেকে ভাগলপুরে উপস্থিত হয়েছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ। তাঁর মুখে আবার যখন অবগত হলাম আশ্রমাধ্যক্ষের নাম প্রজ্ঞানন্দ স্বামী, তখন উদ্বেগটা আরও একটু বর্ধিত হ'ল। একমাত্র প্রজ্ঞাতেই যাঁর আনন্দ, আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তি কোন্ উপায়ে তাঁর আনন্দের জোগান দেবে! মায়াবতী ভ্রমণের আনন্দের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম উদ্বেগ কাঁটার মতো খচখচ করতে লাগল। মনে হ'ল, দেখা হ'লেই গভীর গুরু তত্ত্বকথার আলোচনার দ্বারা প্রজ্ঞানন্দ আশ্রম-যাপনকাল খানিকটা নিরানন্দ ক'রে রাখবেন দেখছি। জীবনে অনেক দুঃখই আছে, তার উপর তত্ত্বকথার আলোচনার দ্বারা আর একটা সংখ্যা না বাড়াতে পারলেই ভাল হয়।

মায়াবতী যাত্রা আরম্ভ করার পথ যতই ক'মে আসতে লাগল, উদ্বেগটা ততই বেড়ে চলল। এমন কি, মায়াবতীর ঠিক পূর্ববর্তী চটি আট মাইল দূরবর্তী ধুনাঘাটের ডাকবাংলোয় রাত্রি-যাপনের পর সকালে উঠে যখন শুনলাম, আমাদের অভ্যর্থিত ক'রে নিয়ে যাবার জন্য মায়াবতী থেকে দল-বল এসেছে, তখন মনটা ঈষৎ চঞ্চল হ'ল। কিন্তু সে দল-বলের নেতারূপে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী আসেন নি জানতে পেরে আশ্বস্ত হলাম। অনীপ্সিত মুহূর্ত যতটা নিবর্তিত হয় ততই ভাল।

অপরাহ্ণে মায়াবতীতে উপস্থিত হয়ে প্রজ্ঞানন্দ স্বামীজীর সম্মুখে সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কিন্তু বুঝতে বাকি রইল না, এ পর্যন্ত তাঁর সম্বন্ধে যত কিছু অনুমান করছিলাম, সবই ভুল হচ্ছিল। সুশ্রী আকৃতি, প্রসন্ন মুখমণ্ডল, মধুর ব্যবহার। কথাবার্তার মধ্যে এমন একটা সোজাসুজি ভাব যে, শুনলেই মনে হয় যতখানি শোনবার সবটাই শুনলাম, কিছু বাকি রইল না। স্বামীজীর মধ্যে একটা মস্ত গুণ লক্ষ্য করলাম, কৌতুকের বিষয় উপস্থিত হ'লে তিনি কৌতুকান্বিত হন, এবং হাসি পেলে

আমাদেরই মতো হাসেন,—মহনীয়তার গাম্ভীর্যের লাগাম দিয়ে তাকে রোধ করেন না।

কয়েক দিন আলাপ-পরিচয়ের পর বুঝলাম, প্রজ্ঞানন্দ পাণ্ডিত্যের গুরুত্বকে পরিপাক ক'রে লঘু হতে পেরেছেন। বিদ্যার কচকচি তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারে নি।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে—

A man should not be considered to be sufficiently cultured until he forgets his Latin.

—প্রজ্ঞানন্দ তাঁর 'ল্যাটিন' ভুলতে পেরেছেন।

প্রজ্ঞানন্দের সঙ্গ আমার পক্ষে লোভনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল; কিন্তু সর্বদা সে সঙ্গলাভের সৌভাগ্য হ'ত না। সমগ্র মায়াবতী ব্যাপার পরিচালিত করবার ভার যাঁর উপর, নানাপ্রকার কার্যব্যাপৃততার মধ্যে তাঁর অবসর কতটুকু? কার্যে বিঘ্ন ঘটাবার আশঙ্কায় আমি তাঁর নিকট বেশি যেতাম না; গেলেও অল্পক্ষণ থেকে চ'লে আসতাম। তিনি কিন্তু অবসর পেলেই আমাদের কাছে এসে মিলিত হতেন।

আশ্রমের সকল সন্ন্যাসীর সঙ্গেই আমাদের আলাপ হয়েছিল; এতদিন পরে অনেকেরই নাম বিস্মৃত হয়েছি। তবে ভরত মহারাজকে আমার বেশ মনে পড়ে। তিনি তখন তরুণ যুবক। তাঁকেও আমার খুব ভাল লাগত। কিছুদিন পূর্বে বেলুড় মঠে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল। বেলুড় মঠে তিনি তখন অগ্রণীদের মধ্যে একজন।

এবার যে সন্ন্যাসীর কথা বলব, তিনি ভারতবর্ষীয় ছিলেন না। যতদূর মনে পড়ে, তিনি ছিলেন হল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী, অর্থাৎ জাতিতে তিনি ছিলেন ড্যাচ (Dutch)। তাঁর সন্ন্যাস-নাম কিছু ছিল কি না মনে নেই; আশ্রমে ডাকনামে তাঁর নাম ছিল গুরুদাস

মহারাজ। একই সন্ন্যাসীর একটি সন্ন্যাস-নাম ও আর একটি ডাকনাম—দুটি নাম প্রায়ই দেখা যায়। সন্ন্যাসে দীক্ষা গ্রহণের পূর্বে ব্রহ্মচারী অবস্থায় যে নাম থাকে, বোধ করি সেই নামটিই সন্ন্যাসগ্রহণের পরও ডাকনাম হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

গুরুদাস মহারাজের সঙ্গে আমার আলাপ হ'ত ইংরাজী ভাষায়। কে ভাল ইংরাজী বলত—গুরুদাস মহারাজ, না, আমি—তা ঠিক বুঝতে পারতাম না। এ কথাটা আমার ইংরাজী বলার সার্টিফিকেট ব'লে বিবেচিত হবার যোগ্য নয়,—কারণ, গুরুদাস মহারাজের চেয়ে ভাল বললেই ভাল ইংরাজী বলা হয়, এমন কথা জোর ক'রে বলা চলে না। গুরুদাস বলতেন হলাণ্ডীয় ইংরাজী, আমি বলতাম বঙ্গদেশীয়; সে ইংরাজী ভাষায় গুরুদাস দিতেন হল্যাণ্ড দেশের স্বরভঙ্গী (intonation), আমি দিতাম বাংলা দেশের। মনে-মনে-স্বীকার-পাওয়া একটা আপোস-নিষ্পত্তির হিসাবে আমরা উভয়ের ভাষাগত অপরাধ উভয়ে ক্ষমা ক'রে চলতাম।

দিনের মধ্যে অনেকখানি সময় গুরুদাস উন্মুক্ত স্থলে বৃক্ষতলে ব'সে কাটান। আমার বিশ্বাস, এ সময়টা তিনি ধ্যান-ধারণা নিদিধ্যাসনের মধ্যেই নিমগ্ন থাকেন। নির্বাক, নিঃসাড়, নিস্পন্দ অবস্থায় চক্ষু নিমীলিত থাকে না বটে, কিন্তু স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি তন্ময়ভাবে এমন 'কোন-কিছু-না'র মধ্যে নিবদ্ধ হয়ে থাকে যে, তা নিমীলিত নেত্রেরই সামিল।

ধীরে ধীরে সতর্ক পদক্ষেপে পিছন দিক থেকে এসে এমন একটু পাশ ক'রে বসি যে, আড়ালেও বসা হয়, অথচ মুখের একটা পাশ দেখাও চলে। স্তব্ধ নির্বাক হয়ে ব'সে থাকি, হয়তো মিনিট পনের, হয়তো মিনিট কুড়ি।

হঠাৎ এক সময়ে, কি কারণে বোঝা শক্ত, পাশের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে গুরুদাস বলেন, "এই যে মিস্টার গাঙ্গুলি! কতক্ষণ এসেছেন ?"

একটু সামনের দিকে স’রে ব’সে বলি, “বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পনের।”

গুরুদাস মহারাজের দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠে পুনরায় সঙ্কুচিত হয়ে যায়।

“ডাকেন নি কেন আমাকে ?”

বলি, “ডাকবার জন্যে তো আসি নি।”

“তবে ?”

“দেখবার জন্যে।”

এ কথার উত্তরে গুরুদাস আর কোন কথা বলেন না, চুপ ক’রে থাকেন। আমরা হ’লে, কি দেখবার জন্যে—সে কথা ভাল ক’রে জেনে নিয়ে খানিকটা আত্মপ্রসাদ লাভ করবার লোভে প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা উত্যক্ত ক’রে মারি। গুরুদাস কিন্তু সে লোভের বাইরে।

ক্ষণকাল পরে গুরুদাস হয়তো জিজ্ঞাসা করেন, “মায়াবতী আপনার ভাল লাগছে মিস্টার গাঙ্গুলি ?”

সাগ্রহে উত্তর দিই, “খুব ভাল লাগছে। আপনার কেমন লাগে ?”

প্রশ্ন শুনে গুরুদাসের অধরপ্রান্তে ক্ষীণ হাসি দেখা দেয়; মৃদুকণ্ঠে বলেন, “ভাল না লাগলে ঘর-বাড়ি ছেড়ে থাকি ?”

উত্তরে আমি বলি, “ও কোনও কাজের কথা নয় মহারাজ। আপনার মতো সাধু ব্যক্তির পক্ষে ঘর-বাড়ি কোথাও নেই, আবার সর্বত্রই ঘর-বাড়ি।”

“সাধু ব্যক্তি !” গুরুদাসের ওষ্ঠাধরে পুনরায় ক্ষীণ হাসি দেখা দেয়।

আবার তিনি নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে সমাহিতভাবে বসেন, আবার

সেই 'কোন-কিছু-না'র উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে সমাধিস্থ হবার উপক্রম করেন।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ব'সে থাকি। বুক-পকেট থেকে ঘড়ি বার ক'রে দেখি, বৈকালিক চায়ের সময় হয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে সন্তর্পণেই উঠে দাঁড়াই, কিন্তু তাইতেই গুরুদাসের ধ্যান ভেঙে যায়।

আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বলেন, "চললেন মিস্টার গাঙ্গুলি?"

বলি, "হ্যাঁ, মহারাজ। কাল আবার আসব।"

গুরুদাস সে কথার কোনও অনাবশ্যক উত্তর দেন না, চুপ ক'রে থাকেন।

গুরুদাসের কথা ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরি। আশ্চর্য এই মানুষের মন! কেউ সুদীর্ঘ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুদ ক'ষে ক'ষে অথবা লাভ-লোকসানের হিসেব মিলিয়ে মিলিয়ে জীবনটা খতম ক'রে দেয়; আবার কেউ বা সুদূর হল্যাণ্ড দেশ থেকে সাত সমুদ্র তেরো নদীর পাড়ি জমিয়ে ভারতবর্ষে উপনীত হয়ে হিমালয় পর্বতের অত্যুচ্চ শিখরদেশে আরোহণ ক'রে সম্পূর্ণ বৈদেশিক আবহাওয়ার মধ্যে পর-ধর্মের সাধনমার্গ অবলম্বনের দ্বারা পারমার্থিক সাধনায় দিনপাত করে।

হয়তো এই সুদ কষা আর পারমার্থিক সাধনা, দুই-ই একই মাত্রায় নিরর্থক বস্তু,—একই রকমের কর্মভোগ। শুধু চুলচেরা হিসাবের সুদই বা কেন, আসল ফেলেও একদিন অজানার দিকে পাড়ি মারতে হবে, তা তো চর্মচক্ষে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে একদিন; কিন্তু পারমার্থিক সাধনার জটিল ব্যাপারটা চর্মচক্ষুর অগোচর ব'লেই কি একদিন তার হিসেবের জের আত্মার কাঁধে চ'ড়ে ও-পারে গিয়ে হাজির হবে? কে জানে! ঘর-বাড়ি, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, হয়তো বা পুত্র-কলত্র, স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ব্যাপারগুলি পিছনে ফেলে কোন্ ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর লোভে গুরুদাস

এই সুদূর মায়াবতীতে ব'সে আধ্যাত্মিক সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন? ঈশ্বরপ্রাপ্তি? নির্বাণলাভ? প্রথম দুটি ব্যাপারের তো গোড়াতেই গলদ। প্রমাণের অভাবে বহু লোকের কাছে ঈশ্বর তো এ পর্যন্ত অসিদ্ধ হয়েই আছেন; আর নির্বাণের অর্থ যদি লয় হয়, তা হ'লে এই নরদেহের বিলোপের পরে পুনরায় কোন্ বস্তু অবলম্বনের দ্বারা নূতন ক'রে লয় হবে, সে কথা যৎপরোনাস্তি জটিল।

মরুকগে সে সকল দুরূহ তর্কসঙ্কুল তত্ত্বের আলোচনা। আধ্যাত্মিক সাধনায় দ্বারা সিদ্ধির বিস্তৃতি যদি ইহলোকেও খানিকটা ছড়িয়ে থাকতে পারে, তা হ'লে এই মিতভাষী জিতেন্দ্রিয় স্তব্ধগভীর মানুষটি তার খানিকটা আয়ত্ত করেছেন ব'লেই মনে হয়।

দেখতে দেখতে আমাদের অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী মায়াবতী যাপনের মেয়াদ শেষ হয়ে এল। শেষ পর্যন্ত একদিন যাত্রার দিনও এসে হাজির

আগের দিন জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদার কাজ একরকম শেষ হয়ে গেছে সকালে চা-পানের পর আমরা আশ্রমে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আজ সেখানেই সকালবেলাকার আহারকার্য সমাধা ক'রে কলকাতার পথে রওনা।

চা-পানের পর কিছুক্ষণ চিরতুষার পর্বতের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইলাম। তখন উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দীপ্তিতে তুষার ঝলমল করছে। বিষণ্ণগম্ভীর চিত্তে বিদায় নিয়ে মনে মনে বললাম, হে বিচিত্র বর্ণ-শোভা-সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার! হে সৌম্য, হে শুভ্র, পবিত্র! দিনের পর দিন আমার কৌতূহলোদ্দীপ্ত নেত্রে তুমি আনন্দের যে মায়া অঞ্জন বুলিয়েছ, তার জন্য আমার অন্তরের উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতা

রেখে গেলাম। তোমার শুদ্ধ মূর্তি চিরদিন আমার চিত্তে অঙ্কিত থেকে আমাকে প্রেরণা জোগাবে। তোমার মঙ্গল হোক।

মায়াবতীর গাছ-পালা তরু-লতা, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস সকলের প্রতি দৃষ্টি বুলিয়ে দিয়ে ও তাদের কাছে বিদায় নিয়ে গুরুদাস মহারাজের উদ্দেশ্যে ছুটলাম। আমি জানতাম, আর সকল মহারাজের দেখা পাব আশ্রমে, পাব না শুধু তাঁর।

তাঁকে খুঁজে বার করতে অসুবিধে হ'ল না। বললাম, "আমাদের যাত্রার সময় হ'ল মহারাজ।"

গুরুদাস বললেন, "উইস ইউ সাক্‌সেস মিস্টার গাঙ্গুলি। হোপ টু সি ইউ এগেন।"

উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে বললাম, "আপনার মতো সাধু পুরুষকে আমি আর কি 'উইস' করব মহারাজ? আপনার আশীর্বাদ মাথায় পেতে নিলাম। আমি শুধু এই প্রার্থনা করি, সিদ্ধির যদি কিছু অংশ বাকি থেকে থাকে, অচিরে যেন তা আপনার করতলগত হয়।"

কোনও উত্তর না দিয়ে গুরুদাস শুধু একটু হাসলেন।

আশ্রমে পৌঁছে দেখি, সেখানে হর্ষবিষাদের ধূপছায়া বৈঠক বসেছে;—সকলের মুখে মুখে হাসি, চোখে চোখে বিষণ্ণতা।

আমাকে দেখে প্রজ্ঞানন্দ স্বামী বললেন, "আনন্দের দিন ফুরোল উপেনবাবু।"

বললাম, "মহারাজ, ফুরোল আমাদের। আপনাদের নিকট আনন্দই বা কি, আর বিষাদই বা কি!"

চিত্তরঞ্জন এবং তাঁর দলকে অদ্বৈত আশ্রম রাজোচিত সম্মান এবং আতিথেয়তা দেখিয়েছিলেন, এ কথা বললে বিশেষ কিছু অত্যুক্তি করা হয় না। একটা কথা বললে এ কথার খানিকটা প্রমাণ দেওয়া হবে।

আমাদের ব্যবহারের জন্য যা-কিছু আসবাবপত্র, এমন কি সামান্য একটা টুল পর্যন্ত, আশ্রম বেরিলি থেকে একেবারে খরিদ ক'রে আনিয়েছিলেন। 'মাদার্স কট' এবং 'গেস্ট হাউসে'র যাবতীয় আসবাব-পত্রের কথাই বলছি। তখনকার দিনে এসব দ্রব্যের মোট মূল্য খুব বেশি অবশ্য ছিল না; বেরিলি থেকে বহন ক'রে আনবার খরচ সমেত হয়তো চারশো সাড়ে চারশো টাকার অধিক পড়ে নি। কিন্তু এ বিষয়ে টাকা-পয়সার কথা গৌণ; আসল কথা হচ্ছে পূর্ব-ব্যবহৃত কোন জিনিসের ছোঁয়াচ থেকে মুক্ত রাখার সুবিবেচনা এবং আগ্রহ।

আমাদের আহার-পর্ব শেষ হ'লে চিত্তরঞ্জন একখানা চেকের ওপর তাঁর আশ্রম-ঋণ পরিশোধ করলেন। এ অবশ্য অর্থঘটিত কোন ঋণের কথা নয়, আসবাবপত্রের মূল্যের কোনো হিসাবও এর মধ্যে ছিল না। এ শুধু একজন মুক্তহস্ত পুরাতন পৃষ্ঠপোষকের সাধারণ কর্তব্যের ঋণ-পরিশোধ।

চিত্তরঞ্জনের মতো দানশীল ব্যক্তি আমার অভিজ্ঞতায় আমি আর একটিও দেখি নি। এক সময়ে তিনি বাংলা দেশের দ্বিতীয় গৌরী সেন হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। যেদিকে অভাব, সেই দিকেই তাঁর দয়া; যেদিকে অনটন, সেইদিকেই দাক্ষিণ্য। মায়াবতী ত্যাগ ক'রে নেমে

যাওয়ার পূর্বে কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী আসবার পথে তাঁর দানশীলতার যে দুটি কৌতুকজনক দৃষ্টান্ত দেখেছিলাম, তা বাদ দিয়ে গেলে মায়াবতী কাহিনী অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসের ১০ই-১১ই তারিখের কথা। রামগড়ের ডাকবাংলো ত্যাগ ক'রে আমরা মাইল দশেক দূরবর্তী পিউড়া অভিমুখে যাত্রা আরম্ভ করেছি। কাঠগুদামে রেল থেকে অবতরণ করার পর ডাণ্ডি ও অশ্বপৃষ্ঠে আমাদের পর্বতারোহণ আরম্ভ হয়েছিল। কাঠগুদামের পর ভীমতাল; তৎপরে রামগড়।

রামগড় থেকে পিউড়া পর্যন্ত পথের দৃশ্য অপূর্ব। পাহাড়ে পাহাড়ে সুসজ্জিত দীর্ঘ পাইন গাছের কুঞ্জ এমনভাবে সজ্জিত যে, দেখলে মনে হয় কেউ যেন সেগুলিকে চারা অবস্থায় একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়ে রোপিত করেছিল। পথের এক পার্শ্বে নানা শ্রেণীর ফার্ন এবং বনপুষ্পে শোভিত পর্বতগাত্র; অপর পার্শ্বে গভীর খড্ বহু নিম্নে অধিত্যকায় গিয়ে শেষ হয়েছে,—তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, অধিত্যকা-ভূমির উপরে যেন নানা কারুকার্যখচিত একখানি মূল্যবান গালিচা পাতা রয়েছে। আকাশ সুনির্মল; এবং শেষ শরতের বর্ষণধারায় অচিরস্নাত গাছপালা লতাপাদপের মধ্যে প্রাণখোলা শ্যামলের অভিষেক।

কাঠগুদাম থেকে যাত্রা করবার কালে কুলির অনটনের জন্য সব জিনিসপত্র আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, অধিকংশই পিছনে ফেলে আসতে হয়েছিল। কাঠগুদামে যে বাঙালী ভদ্রলোক আমাদের মায়াবতী যাত্রার ব্যবস্থা করছিলেন, তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন, আমাদের রওনা হবার অনতিবিলম্বেই লোকজন সংগ্রহ ক'রে জিনিসপত্র পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন। সে আশ্বাস ব্যর্থ হয় নি। আমরা রামগড় পৌঁছবার কিছুক্ষণ পরেই কুলি ঘোড়া এবং দ্রব্যাদি

সবই এসে পৌঁছেছিল। পরদিন প্রাতে রামগড় থেকে আমরা যখন যাত্রা করলাম, তখন আটখানা ডাণ্ডি, একটা ডুলি, একশো তিনজন কুলি, আটাশটা লাদ্দু ঘোড়া ও গুটিকয়েক সওয়ারী ঘোড়ার দ্বারা গঠিত আমাদের বিপুল বাহিনীটিকে দেখে মনে হচ্ছিল, হিমালয়ের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে আমরা যেন কোন সুদূর এবং দুর্গমের অভিযানে যাত্রা করেছি। এই সুদীর্ঘ বাহিনীর সর্বাগ্রে চলেছিল চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডি, তার পরে বাসন্তী দেবীর এবং তৎপরে আমার।

রামগড় থেকে কিছুদূর আসার পর সহসা এক জায়গায় দুই-তিনটি পাহাড়ী বালক-বালিকা চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির নিকট উপস্থিত হয়ে প্রত্যেকে ফার্ন ও পাহাড়ী পুষ্পে রচিত এক-একটি ক্ষুদ্র পুষ্পগুচ্ছ চিত্তরঞ্জনকে উপহার দিয়ে হাত পেতে ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে চলল। চিত্তরঞ্জনের বুঝতে বিলম্ব হ'ল না—বকশিশ দিতে হবে।

একবার তিনি পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করলেন—বোধ করি কোষাধ্যক্ষ ললিতবাবুর উদ্দেশ্যে,—যদি কিছু ভাঙানো পয়সা তাঁর কাছে পাওয়া যায় হয়তো সেই অভিপ্রায়ে। ললিতবাবু কিন্তু বহু পশ্চাতে ছিলেন, তাঁর নাগাল পাওয়া সহজ মনে হ'ল না। তখন চিত্তরঞ্জন নিজ ডাণ্ডিতে রক্ষিত অ্যাটাসি কেস্ খুলে প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে একটি ক'রে রৌপ্যমুদ্রা উপহার দিলেন।

অর্থবান ব্যক্তিরা যখন পাহাড়ের পথে যাতায়াত করে, পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা এই উপায়ে কিছু পয়সা অর্জন ক'রে থাকে। সাধারণত সকলেই একটি ক'রে পয়সা দেয়; কদাচিৎ কেউ কখনও দেয় দু পয়সা। বর্তমান ক্ষেত্রে এক পয়সার স্থলে এক টাকা ক'রে পেয়ে ছেলেদের বিশ্বাসই হয় না যে, সত্য-সত্যই তারা এক টাকা ক'রে পেয়েছে। একবার হস্তস্থিত টাকার দিকে ও একবার চিত্তরঞ্জনের মুখের দিকে চাইতে

চাইতে গভীর বিস্ময়ের সহিত দুরূহ রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করতে থাকে। সত্যই তারা এক টাকা ক'রে পেয়েছে—অবশেষে যখন সে বিষয়ে সুনিশ্চিত প্রতীতি জন্মায়, তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা ছুট দেয়। মুহূর্তের মধ্যে দাবাগ্নির মতো চতুর্দিকে বার্তা ছড়িয়ে পড়ে, 'কলকাত্তাকা রাজা আয়া হ্যায়।' পর্বতগাত্র থেকে গোটা তিন-চার ফুল ও কিছু ফার্ন ছিঁড়ে নিয়ে লতাগুল্ম দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে ছেলেমেয়ের দল উন্মত্ত লালসায় ছুটতে থাকে চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডির দিকে। মুখে তাদের সমুচ্চ প্রশস্তি-ধ্বনি, "রাজাজীকা জয়, রাজাজীকা জয়, রাজাজীকা জয়!"

কেউ দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দফা ফুল দিচ্ছে কি না, বকশিশ পেয়ে দ্রুতগতিভরে পাকদণ্ডি পথে অবতরণ ক'রে পুনরায় বাহিনীর অগ্রভাগে সদর-রাস্তার উপরে নূতন পুষ্পহস্তে কেউ উঠছে কি না, সে সকল দেখবার অথবা সন্দেহ করবার মতো বুদ্ধি এবং প্রবৃত্তি রাজাজীর আছে ব'লে মনে হয় না। নিঃশব্দে নিরাপত্তি সহকারে প্রসন্ন মুখে মাথা নেড়ে নেড়ে একটি ক'রে পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে তিনি একটি ক'রে টাকা দিতে লাগলেন। পুষ্পগুচ্ছের দ্বারা ডাণ্ডি যে-পরিমাণ সমৃদ্ধ হতে লাগল, রৌপ্যমুদ্রার দ্বারা অ্যাটাসি কেস্ ঠিক সেই পরিমাণে রিক্ত হয়ে চলল। দেখতে দেখতে মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন টাকা উড়ে গেল।

আমার ডাণ্ডিওয়ালাদের মধ্যে একজন বললে, "হুজুর, মেমসাহেবের ডাণ্ডি থেমে গেছে।"

পর-মুহূর্তেই আমার ডাণ্ডি বাসন্তী দেবীর ডাণ্ডির পাশে এসে উপস্থিত হ'ল।

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বাসন্তী দেবী

বললেন, "উপেনবাবু, সামলান আপনি ওঁকে। এই রকম টাকার বৃষ্টি চলতে থাকলে ওঁর অ্যাটাসি কেস্ তো দেখতে দেখতে শেষ হয়ে যাবে। তারপর হাত পড়বে আমার অ্যাটাসি কেসে, আর তার পর আপনারটাতে। মায়াবতী পৌঁছে খুচরো খরচের জন্যে একটি টাকাও হাতে থাকবে না।"

ব্যাঙ্ক, হাটবাজার, দোকান-পশারের একান্ত অভাববশত মায়াবতীতে নোট ভাঙানো অসুবিধাজনক ব্যাপার ব'লে কিছু নগদ টাকা আমাদের সঙ্গে আনবার জন্য গণেন মহারাজ পরামর্শ দিয়ে এসেছিলেন। তদনুসারে হাজার খানেক কাঁচা টাকা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি অ্যাটাসি কেসের মধ্যে আবদ্ধ অবস্থায় চলেছিল। পাহাড়ের পথে ঐ তিনটি অ্যাটাসি কেস একত্রে না রেখে আমাদের তিনখানা ডাণ্ডিতে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছিল।

বাসন্তী দেবীকে আশ্বস্ত ক'রে আমার ডাণ্ডিওয়ালা কুলিদের বোঝালাম যে, যেরূপ প্রবল স্রোতে অর্থ নিঃশেষ হতে আরম্ভ করেছে, অচিরে তা রোধ করতে না পারলে তাদের পক্ষেও ব্যাপারটা সুবিধার হবে না। সুতরাং উভয় পক্ষের স্বার্থের অনুরোধে এই নাছোড়বান্দা ছেলেমেয়েদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্যে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দেওয়াই সমীচীন।

আমার কুলি-চতুষ্টয়ের মধ্যে একজন বললে, "হুজুর, সুবিধেও আছে। সামনে অনেকখানি পথ মিঠা উৎরাই, দৌড় দেওয়া চলবে।"

বললাম, "তবে আর কথা নেই, সর্বশক্তি সংহত ক'রে দাও দৌড়। কিন্তু তার আগে পিছনের ডাণ্ডিওয়ালাদের দৌড়ে শরিক হবার জন্যে কথাটা বুঝিয়ে দাও। আর সাহেবের ডাণ্ডির কুলিদিগকে বুঝিয়ে দিয়ো সাহেবের ডাণ্ডি ছাড়িয়ে যেতে যেতে।"

ঠিক রণকৌশলেরই মতো এই গোপন অভিসন্ধিটুকু অবিলম্বে আমাদের বাহিনীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রচারিত হয়ে গেল। তারপর আকাশ-বাতাস পাহাড়-পর্বত বিদীর্ণ ক'রে আমার ডাণ্ডি-কুলিরা এবং সঙ্গে সঙ্গে অপর সকল কুলি উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার ক'রে উঠল, "জয় চণ্ডীমাইকী জয়! জয়! বরাইদেবীকী জয়!" এবং সঙ্গে সঙ্গে সবেগে দৌড়।

দ্রুতগতিভরে চিত্তরঞ্জনের ডাণ্ডি অতিক্রম করবার সময়ে চেয়ে দেখি, চিত্তরঞ্জনের মুখমণ্ডলে গভীর বিস্ময়ের প্রশ্ন। আমার সঙ্গে চোখা-চোখি হতে উপর দিকে মুখ নেড়ে নির্বাক ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? রেস, না, অন্য আর কিছু?

উত্তর দেবার সময় পেলাম না, দিলেও হয়তো অসত্য ভাষণ করতে হ'ত; চক্ষের নিমিষে নিঃশব্দে হাসতে হাসতে এগিয়ে গেলাম।

পিছন দিকে তখন ছেলের দল 'রাজাজীকা জয়! রাজাজীকা জয়!' রবে দ্রুতবেগে আমাদের প্রতি ধাওয়া করেছে; আর ললিতবাবু তাঁর ডাণ্ডিতে অর্ধদণ্ডায়মান অর্ধোপবিষ্ট অবস্থায় অবস্থান ক'রে উত্তেজিত হয়ে লাঠি ঘুরোতে ঘুরোতে চিৎকার করছেন, "হাটো—হাটো—হাটো—হাটো।"

চতুর্বাহকবাহিত ডাণ্ডির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত; সুতরাং ছেলের দল ক্রমশ পেছিয়ে পড়ছিল। ইত্যবসরে আমাদের বাহিনীটি দ্বিধাছিন্ন হয়ে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিশীল হওয়ার দরুন ডাণ্ডিগুলো বেশ খানিকটা এগিয়ে চলেছে এবং অবশিষ্ট অংশ যথাসম্ভব গতি বৃদ্ধি ক'রে পিছন দিকে অনুসরণ করছে। চেয়ে দেখে মনে হ'ল, ছেলেরা পেছিয়ে গিয়ে বাহিনীর পশ্চাৎভাগের লোকজনের নিকট কিছু আবেদন-নিবেদন করছে। কিন্তু তার দ্বারা ফললাভের

কোন সম্ভাবনা ছিল না; কারণ আমাদের ট্রেনের প্যাসেঞ্জার-গাড়ির পিছন দিকের অংশ হচ্ছে মালগাড়ি,—তার রুদ্ধ লৌহ-দরজায় মাথা কুটলেও একটি কণিকা বার হবার সম্ভাবনা নেই। অবিলম্বে এ কথা উপলব্ধি ক'রে ছেলের দল দাঁড়িয়ে প'ড়ে পলায়মান বাহিনীর প্রতি ক্ষণকাল নিরুপায় নৈরাশ্যে চেয়ে রইল, তারপর রণে ভঙ্গ দিয়ে নিজেদের গ্রামের অভিমুখে ফিরে গেল।

দানশীলতার যে মহিমময় নিঃস্রবটি কৌশলের অথবা অপকৌশলের প্যাঁচ ঘুরিয়ে বন্ধ ক'রে দিলাম, ডাণ্ডিতে ব'সে মুগ্ধচিত্তে তার কথাই ভাবছিলাম। যে অর্থ চিত্তরঞ্জন এইমাত্র দান করলেন, তার পরিমাণ অবশ্য এমন কিছু বেশি নয়, বড় জোর যাট-পঁয়ষট্টি টাকা। কিন্তু দানের মধ্যে পরিমাণের কথাটা তত বড় নয়, প্রবৃত্তির কথা যত বড়। ক্ষুধার্তকে ভিখারীর এক মুষ্টি অন্নদানের কাছে ধনবানের কত সহস্র টাকার দান ম্লান হয়ে যায়। হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের অশ্রদ্ধাপ্রদত্ত রাজভোগ পরিত্যাগ ক'রে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের শ্রদ্ধাপূত ভিক্ষান্ন গ্রহণ করেছিলেন। প্রবৃত্তির দিক থেকে বিচার করলে চিত্তরঞ্জনের ন্যায় দাতা কদাচিৎ দেখা যায়। বৎসকে দেখলে গাভীমাতার স্তনে দুগ্ধ যেমন আপনা-আপনি নেমে আসে, অভাব দেখলে চিত্তরঞ্জনের মনে দানশীলতার প্রবৃত্তি ঠিক সেইরূপ স্বতঃক্ষরিত হ'ত।

পুষ্পগুচ্ছের বর্তমান কাহিনীটি এবং অতঃপর যে কাহিনী বলব, উভয় কাহিনীই 'মায়াবতী পথে'র বিবরণের মধ্যে বিবৃত করেছি। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার প্রসঙ্গে এ দুটি কাহিনী বাদ দিলে সে প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যায় ব'লে এ দুটির পুনরাবৃত্তি করলাম।

৯

মায়াবতীর পথে চিত্তরঞ্জনের দানশীলতা সম্বন্ধে দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯১৫ সালের ১৪ই অক্টোবরে লমগড় ডাকবাংলো থেকে মোর-নালা যাত্রা করবার প্রাক্কালে।

পাহাড়ী ছেলেমেয়েদের দ্বারা আমরা আক্রান্ত হয়েছিলাম রামগড় ছেড়ে আসার খানিকটা পরেই। রামগড় থেকে পিউড়া দশ মাইল পথ; পিউড়া থেকে আলমোরা আট মাইল; এবং আলমোরা থেকে লমগড় দশ মাইল। রামগড় থেকে লমগড় এই আটাশ মাইল পথ অতিক্রম করতে আমাদের প্রায় সাতান্ন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়েছিল। এর কারণ, পিউড়া এবং আলমোরা উভয় স্থানেই আমরা এক রাত্রি ক'রে অবস্থান করেছিলাম।

আমাদের পরিকল্পনা ছিল পিউড়ায় উপনীত হয়ে তথাকার ডাকবাংলোয় ঘণ্টা-খানেক বিশ্রামের পর অবিলম্বে আলমোরা অভিমুখে রওনা হওয়া। তা হ'লে সেই দিনই, অর্থাৎ ১১ই অক্টোবর সন্ধ্যা নাগাদ, আমরা আলমোরায় পৌঁছতে পারতাম। কিন্তু পিউড়ার অপরূপ সৌন্দর্য আমাদের পঙ্গু ক'রে আটকে ফেললে। সর্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হয়ে গেল, সেদিন সুন্দরী পিউড়াকে পশ্চাতে ফেলে পাদমেকং আমরা ন গচ্ছামঃ। পিউড়াকে সুন্দরী বললাম, যেহেতু আমার অন্তরবাসী রসিক ভাষাতত্ত্ব-বিদ্ আমাকে নিঃসংশয়ে জানিয়ে দিলে, পিউড়া শব্দ প্রিয়া শব্দের অপ-ভ্রংশ ভিন্ন আর কিছুই নয়। কাঠগুদাম থেকে মায়াবতীর মধ্যে যে আটখানি চটির ডাকবাংলোয় আমরা অবস্থান করেছিলাম, তার প্রত্যেকটিই সযত্ন-নির্বাচনের দ্বারা শ্রেষ্ঠ স্থান আবিষ্কার ক'রে ক'রে

প্রতিষ্ঠিত। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠটিকে যদি প্রিয়া আখ্যা দিতে হয়, তা হ'লে পিউড়া নিশ্চয়ই প্রিয়া। সেইজন্যে পরদিন প্রত্যুষে চা-পানের পর আলমোরার পথে পদার্পণ করবার সময়ে কমনীয়া পিউড়ার দেহ-লাবণ্যের উপর শেষ দৃষ্টি বুলোতে গিয়ে আসন্নবিরহকাতর মনের মধ্যে যে দুঃখ দেখা দিয়েছিল, তাকে ভাষা দান করতে হ'লে কতকটা বলা চলে—

হে প্রিয়া পিউড়া, অয়ি নিরুপমে,
তোমারে ছাড়িয়া চলিনু তবে।
তোমার রূপের অপরূপ ছবি
জানি না আবার হেরিব কবে!

আলমোরায় একদিন বিলম্ব করবার কারণ ছিল প্রধানত দুটি। প্রথমত আলমোরা জেলার সদর-মহকুমারূপে ক্ষুদ্র হ'লেও আলমোরা একটি পার্বত্য শহর। হিমালয়ের সুনিবিড় আরণ্যশ্রীর মধ্যে, অন্তত বৈচিত্র্য সম্পাদনের দিক দিয়ে, তার একটা মূল্য নিশ্চয়ই আছে। সে মূল্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত ক'রে পাশ কাটিয়ে চ'লে যাওয়া সুবুদ্ধির পরিচায়ক হয় না। নগরের রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে এসে পাহাড়-পর্বত-গাছপালার রাজ্যে নগরের লঘু সংস্করণও উপেক্ষার বস্তু নয়।

আলমোরায় একদিন অবস্থান করবার দ্বিতীয় কারণটাই ছিল গুরুতর কারণ। কাঠগুদাম থেকে আলমোরা পর্যন্ত যে-সকল যানবাহন কুলি-মজুর এসেছিল, এজেন্সির নিয়ম অনুযায়ী তারা আলমোরা ছাড়িয়ে আর এক পাও অগ্রসর হতে পারে না, সকলকেই সদলে প্রত্যাবর্তন করতে হবে কাঠগুদামে। আলমোরা থেকে মায়াবতী অভিমুখে যাবার জন্য পুনরায় নূতন ক'রে ডাণ্ডি, ঘোড়া, ডাণ্ডি-কুলি, ভারবাহী কুলি প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে হবে।

এজেন্সির অধীন ডাণ্ডিওয়ালা কুলি এবং ভারবাহী কুলি সম্বন্ধে

আলমোরা থেকে কিন্তু একেবারে স্বতন্ত্র নিয়ম। কাঠগুদাম থেকে আলমোরা পর্যন্ত সমস্ত পথ একই এজেন্সি-কুলির আসার পক্ষে কোনও বাধা ছিল না,—কিন্তু আলমোরা থেকে মায়াবতীর পথে তা হবার উপায় নেই; এজেন্সি-কুলি হ'লে প্রত্যেক স্টেজে নূতন কুলির দ্বারা পুরাতন কুলির বদল করতে হয়। অতিরিক্ত পারিশ্রমিক অথবা পুরস্কারের লোভে কুলিদের এক স্টেজের অতিরিক্ত এক পা-ও নিয়ে যাওয়া যায় না; একটি মাত্র স্টেজ পৌঁছে দিয়েই তারা একেবারে খালাস। তখন পুনরায় নূতন কুলি সংগ্রহ করতে হয়।

অবশ্য এজেন্সিরই সে কার্য করবার কথা, কিন্তু কোন কারণে এজেন্সি অসমর্থ হ'লে পথচারীকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়; বিশেষত আমাদের মতো পথচারীদের, যাদের শতাধিক কুলির প্রয়োজন সেই জন্যে এজেন্সির বাইরের একটানা কুলি যত সংগ্রহ করতে পারা যায়, তত নিশ্চিন্ত থাকা চলে। আলমোরার একটি বাঙালী বড় দোকানদার রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে আমাদের মায়াবতী রওনা হবার ব্যবস্থাদি করেছিলেন।

বহু কষ্টে তিনি মাত্র বারো-তেরোটি কুলি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, যারা আলমোরা থেকে মায়াবতী পর্যন্ত একটানা যেতে স্বীকৃত হয়েছিল। অবশিষ্ট কুলি কুলি-এজেন্সির। আলমোরা থেকে আমাদের রওনা হবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার পর এজেন্সির দুজন চাপরাসী পরবর্তী চটি লমগড়ে রওনা হ'ল, সেখানে স্থানীয় পাটোয়ারির সাহায্যে চতুষ্পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে আমাদের জন্য কুলি সংগ্রহ ক'রে রাখবার উদ্দেশ্যে। এই লমগড়েই কিন্তু আমাদের কুলি-বিভ্রাটে পড়তে হয়েছিল,—আর, তারই সম্পর্কে উদ্ভূত হয়েছিল চিত্তরঞ্জনের দানশীলতার কৌতুকজনক দ্বিতীয় কাহিনী।

যেদিন আমরা আলমোরা পৌঁছেছিলাম, তার পরদিন, অর্থাৎ ১৩ই অক্টোবর আহারাদি সমাপনের পর বেলা একটা নাগাদ রওনা হয়ে সন্ধ্যার পরে আমরা লমগড় ডাকবাংলোয় উপনীত হলাম।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, সুতরাং সেদিন আর লমগড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখবার সুযোগ হ'ল না। ডাকবাংলোর কক্ষে প্রবেশ ক'রে দেওয়ালে-টাঙানো চার্টের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে দেখি, সমুদ্রস্তর থেকে আমরা ৬৪৫০ ফুট উচ্চে আরোহণ করেছি।

এখানকার ডাকবাংলোটি আগেকার ডাকবাংলোগুলির তুলনায় ক্ষুদ্র হ'লেও অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং সুগঠিত। কাঠগুদাম থেকে পিউড়া পর্যন্ত প্রত্যেক ডাকবাংলোয় তিনটি ক'রে, এবং আলমোরার দুটি ডাকবাংলোয় চারিটি ক'রে শয়নকক্ষ ছিল; এখানকার ডাকবাংলোয় এবং পরবর্তী ডাকবাংলোগুলিতে মাত্র দুটি ক'রে। আলমোরার পর এ পথে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম হয় ব'লেই বোধ হয় বৃহত্তর ডাকবাংলোর প্রয়োজন হয় না।

বস্তুত আলমোরার পর থেকেই আমরা হিমালয়ের জনবিরল আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেছি। পথ বলতে আমরা যে বস্তু বুঝি, আলমোরায় পৌঁছেই তা শেষ হয়ে গেছে; এ অঞ্চলের পথ যেমন সঙ্কীর্ণ, তেমনি বন্ধুর; কিন্তু তেমনি চিত্তাকর্ষক। সত্য কথা বলতে, লমগড়ের পথে পদার্পণ ক'রেই আমরা যেন নগাধিরাজ হিমালয়ের ধ্যান-নিমগ্ন অখণ্ড সমাহিত মূর্তির প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম। তার পূর্বে মানুষের সভ্যতার প্রশস্ত সুগম পথ, তরবারি রেখার ন্যায়, সে মূর্তিকে খণ্ডিত ক'রে চলেছিল।

পরদিন ধীরে সুস্থে আহারাদি সেরে মাত্র সাড়ে আট মাইল দূরবর্তী মোরনালা চটি অভিমুখে পাড়ি জমিয়ে অবহেলায়-অনায়াসে তথায়

বৈকালের পূর্বে পৌঁছানো যাবে—এই পরিকল্পনা স্থির ক'রে চা-পানের পর নিশ্চিন্ত হয়ে তাস খেলায় বসা গেল। আমাদের মায়াবতী ভ্রমণের একটা বড়-রকম উদ্দেশ্য হিমালয় উপভোগ। সে কার্য তো কাঠগুদাম থেকেই নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়ে চলেছে; সুতরাং মায়াবতী পৌঁছানোর বিষয়ে আমাদের তেমন কোন তাড়া ছিল না। আমাদের প্রয়োজনের মতো যথেষ্ট কুলি সংগ্রহ পরদিন যদি না হয়ে ওঠে, তা হ'লে আরও একদিন না-হয় লমগড়েই অবস্থান করা যাবে—এমন এক মতলবও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে ছিল। পরিকল্পনা তো অনেক সময়েই করা যায়, কিন্তু মানুষের পরিকল্পনাকে খেয়ালমতো তচনচ ক'রে দেবার একজন মালিকও যে অলক্ষিতে অন্তরালে বিরাজ করে, সে কথার কে তখন হিসেব করেছিল!

পরদিন প্রত্যুষে নিদ্রাভঙ্গের পর তাড়াতাড়ি মুখ-হাত ধুয়ে চা-পান ক'রে আমরা বরফ দেখতে ব'সে গেলাম। তখন উদয়শীল সূর্যের রক্তাভ কিরণপাতে তুষার-পর্বতের উর্ধ্বাংশ আরক্ত হয়ে উঠেছে; নিম্ন প্রদেশ তখনও স্নিগ্ধ-নীলাভ। ক্ষণে ক্ষণে কিন্তু এই গাঢ় রক্তবর্ণ উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের দিকে পরিণত হয়ে আসছে; সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল সূর্যের তির্যকতার পরিবর্তন হেতু পর্বত-শিখরে-শিখরে আলোছায়ার চিত্রণও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

তুষার-পর্বতের গাত্রে আলোছায়ার এই অপরূপ লীলা সন্দর্শন বেশি-ক্ষণ আমাদের উপভোগ করা সম্ভব হ'ল না—এজেন্সির একজন চাপরাসী এসে সংবাদ দিলে, কয়েকদিন পূর্বে আলমোরার ডেপুটি কমিশনার সাহেব বহুসংখ্যক কুলি সঙ্গে নিয়ে সফরে গেছেন ব'লে পাটোয়ারি আমাদের প্রয়োজনমতো কুলি সংগ্রহ করতে পারছে না। তৎসঙ্গে এমন দুঃসংবাদও পাওয়া গেল যে, খুব সম্ভবত সেই দিন সন্ধ্যাকালেই ডেপুটি

কমিশনার ঐ এলাকার সফর শেষ ক'রে সাঙ্গোপাঙ্গসহ লমগড় ডাক-বাংলোয় প্রত্যাবর্তন করবেন।

বোঝা গেল, কঠিন সঙ্কট দেখা দিয়েছে যার তাড়নায় তুষার এবং প্রভাত-সূর্যের কাব্য নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হ'ল। পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের কানুন অনুযায়ী ডাকবাংলোয় সরকারী কর্মচারীর অধিকার অপ্রতিবিধেয়; তিন ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে যে-কোন রাজকর্মচারী বাংলো-দখলকারীকে বাংলো ছেড়ে যেতে বাধ্য করতে পারে। লমগড় ছেড়ে যাবার মতো আমাদের কুলি সংগ্রহ যদি না হয়ে ওঠে, এবং সন্ধ্যার পর এক দুর্ধর্ষ দুর্বিনীত ইংরেজপুঙ্গব এসে তিন ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমাদের তাড়াবার জন্য যদি শিং-নাড়া দিতে আরম্ভ করে, তখন ব্যাপারটি সত্য-সত্যই সঙিন হয়ে উঠবে। ডাকবাংলোর দখল নিয়ে ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে বচসা বাধানো যেমন হবে বে-আইনী, লোক-লস্কর জিনিসপত্র এবং মহিলাদের নিয়ে তরুতলে বেরিয়ে এসে রাত্রি-যাপন হবে তেমনই অবাঞ্ছনীয়।

জরুরী পরামর্শ-সভা ব'সে গেল, এবং অবিলম্বে স্থির হ'ল, এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় যে কোনো প্রকারে যত শীঘ্র সম্ভব লমগড় পরিত্যাগ ক'রে মোরনালার অভিমুখে যাত্রা করাই বিধেয়। অন্তত খান-চারেক ডাণ্ডি এবং একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বহন করবার উপযুক্ত কুলি যাতে সংগ্রহ হতে পারে, সেজন্য পুরস্কারের পরিমাণ বিশেষভাবে বর্ধিত করবার আশা দেখিয়ে চাপরাসীকে পাটোয়ারির কাছে পাঠানো হ'ল। কিন্তু এ কথা আমাদের বুঝতে বাকি রইল না যে, পুরস্কারের মাত্রা বাড়িয়ে মানুষের লোভের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়ানো যেতে পারে, কিন্তু কুলির অভাবে কুলি-সংগ্রহের শক্তি যথেচ্ছা বাড়ানো চলে না।

কথাটা অবিলম্বে আমাদের বাহিনীর মধ্যে রাষ্ট্র হয়ে গেল; অমনি

চতুর্দিকে প'ড়ে গেল 'সাজ্ সাজ্' রব। লমগড় থেকে মোরনালা সমস্ত পথ হয়তো সকলকেই পদব্রজে অতিক্রম করতে হবে, অবগত হয়ে সকলের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা উচ্ছল হ'য়ে উঠল; মেয়েরাও সে উৎসাহ থেকে কিছুমাত্র বাদ পড়লেন না। আমাদের বাহিনীর ক্যাপ্টেন ললিতমোহন সেন তো আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। কয়েকদিন থেকে তাঁর মনের মধ্যে ক্ষোভ সঞ্চিত হচ্ছিল যে, প্রতিদিন যথাসময়ে পরিতোষ-সহকারে আহার করতে করতে সারারাত্রি ডাকবাংলোর নিরাপদ কক্ষে লেপের মধ্যে আরামে নিদ্রা দিতে দিতে, ডাণ্ডির উপর সুখে সমাসীন হয়ে দুলতে দুলতে যে নিরঙ্কুশ হিমালয় অভিযান মসৃণভাবে শেষ হয়ে আসছে, তা নিতান্তই সাদাসিধে; তার মধ্যে না আছে হৃৎকম্প, না আছে রোমাঞ্চ। এক-আধদিন না যদি হ'ল উপবাস, এক-আধ রাত্রি না যদি হ'ল তরুতল-বাস, যদি দেহের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অক্ষতই র'য়ে গেল, তা হ'লে নামঞ্জুর তেমন হিমালয় অভিযান। আজ লমগড় থেকে মোরনালা পর্যন্ত সমস্ত পথ পদব্রজে যাওয়া হবার কথা শুনে ললিতবাবুর মুখে হাসি দেখা দিলে, বললেন, "তবু ভাল। যা হোক খানিকটে মুখ-রক্ষে হতে পারবে।" কিন্তু পথটা মাত্র সাড়ে আট মাইল শুনে ঈষৎ দুঃখিত কণ্ঠে বললেন, "অন্তত মাইল দশেক হ'লেও বলবার মতো কথা হ'ত।"

চিত্তরঞ্জনের খাস-পরিচারক বদরী নিকটেই ছিল; বললে, "সে দুঃখু করবেন না বাবু। হিসেবে সাড়ে আট মাইল, কিন্তু আসলে পনেরো মাইলের সমান। মুদি বলছিল, পথের একেবারে শেষে মাইলখানেক লম্বা এমন এক খাড়া চড়াই আছে যে, শুধু সেই চড়াইটা উঠতে যা কষ্ট হয়, তত কষ্ট হয় না তার আগের সমস্ত পথটা হেঁটে যেতে। বলছিল, চড়াইয়ের ঠিক আগে একটা ভারী জঙ্গলও আছে।"

জঙ্গলের কথা শুনে ললিতবাবু ঈষৎ তৎপর হয়ে উঠলেন। একটা কুলিকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁ রে, মোরনালার পথে কি রকম জঙ্গল আছে?"

মাথা নেড়ে কুলি বললে, "বহুৎ ভারী জঙ্গল আছে বাবুজী।"

"বাঘ আছে সে জঙ্গলে?"

"বহুৎ—বাবুজী বহুৎ।"

"ভাল্লুক?"

"বহুৎ।"

"বাঘ মানুষ মারে কখনও?"

অম্লান বদনে অবলীলার সহিত কুলি বললে, "হামেশা।" তারপর ক্যাপ্টেন সাহেবের মুখমণ্ডলে বোধ করি কিছু লক্ষ্য ক'রে আশ্বাস দিলে, "দিনের বেলা বাঘ বেরোয় না; রাত্রে, সন্ধ্যাকালে বেরোয়।"

ললিতবাবু বললেন, "কিন্তু আমাদের তো জঙ্গলের মধ্যে সন্ধ্যা হয়ে যেতেও পারে!"

মনে মনে কি একটা হিসেব ক'রে কুলি বললে, "তা পারে।"

ঈষৎ চিন্তিত কণ্ঠে ললিতবাবু বললেন, "তা হ'লে উপায়?

কুলি বললে, "কতকগুলো মশাল তৈরি ক'রে নিন বাবুজী, মশালের আলোয় বাঘ আসবে না।"

প্রত্যেক ডাকবাংলোর পাশে একটি ক'রে মুদিখানার দোকান থাকে। মুদির কাছে সংবাদ নিয়ে জানা গেল, এক টিন কেরোসিন তেল পাওয়া যাবে। তখন জন-দুই কুলির সাহায্যে ললিতবাবু উৎসাহের সঙ্গে মশাল প্রস্তুত করাতে প্রবৃত্ত হলেন।

বেলা একটা পর্যন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রে পাটোয়ারি যে-কয়েকজন কুলি সংগ্রহ করতে সমর্থ হ'ল এবং যে-কয়েকজন একটানা কুলি আমাদের

সঙ্গে ছিল তাতে দেখা গেল, নিতান্ত মূল্যবান জিনিসের কয়েকটি বাক্স, রাত্রের জন্য আহারের উপকরণ ও শয়নের শয্যা ভিন্ন অপর সমস্ত দ্রব্য, যায় আটখানা ডাণ্ডি, পিছনে ফেলে যেতে হয়। কিন্তু তা ভিন্ন আর উপায় কি আছে?

বেলা আড়াইটে বেজে গিয়েছে। যে কয়েকজন কুলি লমগড় থেকে মোরনালা মাত্র এক স্টেজ যাবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, 'বুতাত' (খোরাকি) বাবদ তাদের আড়াই টাকা দিতে হবে। যে-সব জিনিস আমাদের সঙ্গে যাবে এবং যা পিছনে প'ড়ে থাকবে, তার ব্যবস্থার গুরুতর কর্তব্যে ললিতবাবু তখন নিরতিশয় ব্যস্ত, বুতাতের টাকার জন্য তাঁকে বিব্রত করা সমীচীন হয় না। মনিব্যাগ থেকে দশ টাকার নোট বার ক'রে চিত্তরঞ্জন পাটোয়ারির হাতে দিলেন।

কুলিদের আড়াই টাকা চুকিয়ে দিয়ে পাটোয়ারি বাকি সাড়ে সাত টাকা চিত্তরঞ্জনকে ফেরত দিতে উদ্যত হ'ল।

পাটোয়ারির প্রতি অতিরিক্ত প্রসন্ন হবার মতো কি বিশেষ কারণ ঘ'টে থাকতে পেরেছিল সে কথা আজ পর্যন্ত আমি অবগত নই,—কিন্তু টাকা ফেরত নেবার কোনো উপক্রম না দেখিয়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "উয়হ্, তুমকো বকশিশ দিয়া।"

সরলভাবে গ্রহণ করলে, এ কথার অর্থ অবশ্য দুর্বোধ্য নয়; কিন্তু সাড়ে সাত টাকা বকশিশের কথাই কি সহজবোধ্য ব্যাপার? নিশ্চয়ই আপাতসরল এ কথার ভিতরে কোনো গূঢ় অর্থ আছে সন্দেহ ক'রে ব্যগ্র কণ্ঠে পাটোয়ারি বললে, "হুজুর, সমঝা নেহি!" অর্থাৎ, হুজুর, বুঝতে পারছি নে।

চিত্তরঞ্জন কানে একটু খাটো ছিলেন; মনে করলেন, কুলি ঠিক শুনতে পায় নি; ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে পুনরায় বললেন, "উয়হ্, তুমকো বকশিশ দিয়া।"

অবিকল একই ভাষা! বিমূঢ় পাটোয়ারির কেঁদে ফেলতেই শুধু বাকি। এমন বিপদে জীবনে আর কখনো বেচারা পড়ে নি। সম্ভ্রান্ত ধনবান ব্যক্তিকে একই প্রশ্ন বারম্বার করতে কুণ্ঠাবোধ হয়, অথচ সাড়ে সাত টাকার মতো একটা অবিশ্বাস্য যা-নয়-তা বকশিশ খামকা ট্যাঁকে গোঁজেই বা কেমন ক'রে? তা ছাড়া, বকশিশ পাবার মতো কোন্ সৎকার্যই বা সে করেছে, একমাত্র উপযুক্ত সংখ্যক কুলি সংগ্রহ ক'রে দিতে না পারা ব্যতীত? তবে যদি প্রাণপণ চেষ্টার ফলে কয়েকটি কুলি যোগাড় ক'রে উপস্থিত চালিয়ে দেওয়াই পুরস্কৃত হবার যোগ্যকার্য ব'লে বিবেচিত হয়, তা হ'লে আট আনা পয়সাই তো তার বাহবা বকশিশ। সাড়ে সাত টাকা পুরস্কারের কোনও মানে হয়? করজোড়ে কাতর কণ্ঠে পাটোয়ারি বললে, "মাফ কিয়া যায় হুজুর। সমঝা নেহি।" অর্থাৎ ক্ষমা করা হোক হুজুর। বুঝতে পারছি নে।

এবার কিন্তু চিত্তরঞ্জন ধৈর্য হারালেন। সত্যি কথা বলতে, অপরাধই বা তাঁর কোথায়? এক কথা তিন-তিনবার বলতে হ'লে কোন্ ভদ্রলোক ধৈর্য ধারণ করতে পারে! পাটোয়ারির মুখের সামনে হাত নেড়ে সতর্জনে বললেন, "উয়হ্ তুম রখ্ লেও। তুমকো বকশিশ দিয়া।"

দানের দাপট দেখে আমরা তো একেবারে তটস্থ! এ পর্যন্ত পাটোয়ারির কাছে যে ব্যাপার দুর্ভেদ্য রহস্য ছিল, এখন তা প্রতীতির আলোকপাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দুই চক্ষে তার আনন্দমাখা কৃতজ্ঞতার দীপ্তি। ভূমি পর্যন্ত দুই বাহু নত ক'রে ক'রে চিত্তরঞ্জনকে সে বারংবার অভিবাদন করতে লাগল। সাড়ে সাত টাকা তার পক্ষে সামান্য অর্থ নয়; হয়তো তার মাস খানেকের বেতনেরই কাছাকাছি। অভাবপীড়িত তার সংসারকে দুঃখের যে অন্ধকার নিয়ত মলিন ক'রে রেখেছে, উপুরি-পাওনা এই সাড়ে সাত টাকার দ্বারা তার একটা দিকের

মালিন্য নিশ্চয়ই কতকটা লঘু হ'তে পারবে। হয়তো আসন্ন মহানবমীর মেলায় এই টাকা দিয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য জিনিসপত্র কিনে সে তাদের মলিন মুখে খানিকটা হাসি ফোটাতে সক্ষম হবে। সাড়ে সাত টাকা তার পক্ষে সামান্য অর্থ নয়।

পাটোয়ারির পক্ষে সামান্য অর্থ না হ'লেও চিত্তরঞ্জনের পক্ষে নিশ্চয় সামান্য। অসামান্য শুধু দানপ্রবণতার বেগবশত ছলে-ছুতোয় দরিদ্রের হাতে আট আনার পরিবর্তে সাড়ে সাত টাকা গুঁজে দেওয়া।

কর্মজীবনের প্রারম্ভে বেশ কিছুকাল চিত্তরঞ্জন যে দারুণ অর্থাভাবে পীড়িত হয়েছিলেন, তাতে যদি পরবর্তী জীবনের বন্যাস্রোতের ন্যায় অর্থাগমের কালে তিনি কঠোর কৃপণ হয়ে উঠতেন, তাঁকে ক্ষমা করা যেতে পারত। আজ যদি তিনি মোরনালা যাত্রা করবার সময়ে ডাঙিতে উঠে পাটোয়ারির সমুৎসুক হাতে একটা দোয়ানি ফেলে দিয়ে যেতেন, তা হ'লেও তাঁর দানের স্বল্পতার বিষয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়া চলত। শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর মুখে শুনেছি, এক-একদিন এমন দিনও গেছে, যেদিন সংসার-খরচের জন্য তাঁর হাতে মাত্র একটি টাকা সম্বল। সমস্ত দিন অপেক্ষা ক'রে আছেন, স্বামী যদি বৈকালে কোর্ট থেকে কিছু টাকা নিয়ে ফেরেন। চিত্তরঞ্জন কোর্ট থেকে ফিরেছেন, নিকটে আসা পর্যন্ত বাসন্তী দেবীর সবুর সয় নি, দূর থেকে মুখ উঁচু ক'রে নীরবে প্রশ্ন করেছেন, কিছু এনেছ কি? মাথা নেড়ে নিঃশব্দে চিত্তরঞ্জন উত্তর দিয়েছেন, না, কিছু না। তখন সেই টাকাটির দ্বারা তিনি সংসার-পরিচালনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। বৃদ্ধ শ্বশুর আছেন, রাত্রে তাঁর জলযোগের একটু ব্যবস্থা করা দরকার, পরদিন সকালে স্বামীকে খাইয়ে-দাইয়ে কোর্টে পাঠাতেও হবে, অথচ সবই ঐ একটি টাকার মধ্যে।

মাঝে মাঝে এক-একদিন এমন ব্যাপারও ঘটেছে, কোর্ট থেকে

বাড়ি ফেরবার সময়ে চিত্তরঞ্জন বায় লাইব্রেরির চাকরকে বলেছেন, 'ওরে, টাকা সঙ্গে নেই, গোটা পাঁচেক টাকা দে তো, চুরুট কিনে নিয়ে যেতে হবে।' টাকা নিয়ে কিন্তু চুরুট কেনেন নি, বাড়ি পৌঁছে সংসার-পরিচালনার জন্য বাসন্তী দেবীর হাতে সে টাকা দিয়েছেন।

এই চিত্তরঞ্জনের হাতে একদিন লক্ষ্মী ধরা দিলেন অকুণ্ঠিত প্রসন্নতা নিয়ে। প্রচুর অর্থ অর্জন করতে লাগলেন তিনি—কিন্তু শুধু নিজের জন্যে নয়, বোধ করি অপরের জন্যই বেশি। তাঁর অর্থনৈতিক ধারণা হ'ল, তন্নষ্টং যন্নদীয়তে। দানের পাত্রের উপযুক্ততার বিষয়ে অনেক সময়ে তাঁর বিচার-বিবেচনার বালাই থাকত না। কেউ হাত পাতলেই টাকা দিতেন। বলতেন, তার হাত পাতবার যুক্তিটা হয়তো সত্যি নয়, কিন্তু কারণটা সত্যি। কারণ হচ্ছে অভাব। সত্যিকারের অভাব না থাকলে কেউ কি কখনো হাত পাতবার গ্লানি ভোগ করে?—এই ছিল তাঁর অন্তরের যুক্তি।

আজকালকার স্বার্থপরতার ঊষর যুগে এ সকল কথা আদর্শ হিসাবে স্থাপিত করতেও শঙ্কা বোধ হয়।

বেলা দশটা আন্দাজ আমরা সদলবলে মায়াবতী ত্যাগ করলাম।

দুঃখে সন্ন্যাসীদের চক্ষু সজল হতে আছে কি না জানি নে; কিন্তু মুখ-মণ্ডলের বিষন্ন হবার পক্ষে আটক নেই, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ সেদিন তাঁদের মুখমণ্ডলের উপরেই পেয়েছিলাম। দুঃখার্ত নেত্রে আমাদের গমন-পথের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বহুক্ষণ তাঁরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন। এক-আধদিনের কারবার তো নয়; বিশ-বাইশ দিন ধ'রে আলাপে-আলোচনায়, আহারে-সঙ্গীতে, হাস্তে-পরিহাসে উভয় পক্ষের চিত্তের জটিল জড়াজড়ি,—সে কি সহজে এক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারে? এক পক্ষ অবশ্য সন্ন্যাসী, অপর পক্ষ সংসারী; কিন্তু কঠিন পাথরের বক্ষেও তো কোমল লতিকা সবুজ হয়ে বাহু বিস্তার ক'রে জড়িয়ে থাকে। গৈরিক বসনে সন্ন্যাসীদের দেহ ঢাকা যত সহজ, গৈরিক বৈরাগ্যে মন ঢাকা তত নয়।

সন্ন্যাসীদের কথা যাই হোক না কেন, সন্তবিচ্ছেদবিধুর আমাদের মন প্রগাঢ় ব্যথায় আর্ত হয়ে উঠল। পিছন ফিরে মহারাজদের উপর, মায়াবতীর পাহাড়-পর্বতের উপর, বৃক্ষলতার উপর, চিরতুষার শৈলের উপর, এমন কি মায়াবতীর ঘননীল আকাশপটের উপর শেষবারের মতো একবার চক্ষু এবং মন বুলিয়ে নিলাম। দুঃখের সুগভীর আগ্নেয়-গর্ভ থেকে উত্থিত আমাদের দীর্ঘশ্বাসের উত্তপ্ত বায়ু সেখানকার শীতল বায়ু-মণ্ডলকে খানিকটা উষ্ণ ক'রে দিলে। জীবনে আর কোনোদিন মায়াবতীর মায়াজালের মধ্যে ধরা পড়ব না, অন্তত বর্তমান পরিবেশের মতো কোনো পরিবেশের মধ্যবর্তী হয়ে নয়, এই সম্ভাবনার সুনিশ্চয়তা মনকে

পীড়ন করতে লাগল। প্রবল গ্রহের অনুগ্রহ ব্যতীত এমন যোগাযোগ সহজে ঘটে না; আর, দ্বিতীয়বার তার আবর্তন ঘটাবার মতো প্রবলতর গ্রহের অভ্যুদয় জীবনাকাশে দেখা যায় কদাচিৎ।

মায়াবতীতে আমরা আরোহণ করেছিলাম কাঠগুদাম রেল-স্টেশন হয়ে; মায়াবতী থেকে নেমে চললাম টনকপুর রেল-স্টেশনের ভিন্ন পথে। কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী পৌঁছে যাব মাত্র সাত-আট ঘণ্টা সময়ের মধ্যে। কাঠগুদাম এবং টনকপুর—দুই-ই সমতলভূমির উপর অবস্থিত; সুতরাং উভয় স্থান থেকে মায়াবতীর উচ্চতা কতকটা একই ধরা যেতে পারে। অথচ, ওঠা-নামার সময়ের মধ্যে এতটা পার্থক্য!

অবশ্য এই আট দিন এবং সাত-আট ঘণ্টার হিসাবের মধ্যে অনুপাত বলতে যা বোঝায়, তার বিশেষ কিছু নেই; কারণ কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী আমরা এসেছিলাম ইচ্ছাসুখে থেমে-থুমে, রাত্রিগুলো ডাক-বাংলোয় অতিবাহিত করতে করতে; আর, টনকপুরে নেমে যাব বিরতিহীন গতিতে,—একেবারে যাকে বলে, হুড়হুড়িয়ে। সঙ্গীতের ভাষায়, কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী আমরা উঠেছিলাম গিটকিরি মেরে মেরে; আর, মায়াবতী থেকে টনকপুরে নামব একটা মাত্র বৃহৎ আকারের গমকের উপর দিয়ে।

কিন্তু সে যাই হোক না কেন, প্রতিদিন দুটো ক'রে স্টেজ ডাণ্ডির উপর অতিক্রম ক'রে এবং মাত্র রাত্রিগুলো ডাকবাংলোয় বিশ্রাম ক'রে ক'রে চললেও কাঠগুদাম থেকে মায়াবতী পৌঁছতে দিন চারেকের কম লাগে না। চার দিন এবং সাত-আট ঘণ্টার অনুপাতও নিতান্ত সামান্য অনুপাত নয়। এরূপ অসম অনুপাত সম্ভব হতে পেরেছে মায়াবতী থেকে টনকপুরের পথ যৎপরোনাস্তি খাড়া এবং সেই হেতু বেশ খানিকটা সংক্ষিপ্ত ব'লে। তা ছাড়া মায়াবতীতে আরোহণ করবার কালে যে

প্রতিকূল মাধ্যাকর্ষণ আমাদের নিম্নদিকে টেনে রাখতে নিরন্তর চেষ্টা করছিল, সেই মাধ্যাকর্ষণও এখন অনুকূল হয়ে নীচের দিকে হড়হড়িয়ে টেনে নিয়ে যাবে। অধঃপতনের গতি সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত হয়ে থাকে।

যতদূর মনে পড়ে, আমাদের অবতরণের নূতন পথ লোহাঘাটের মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল। লোহাঘাট আলমোরা জেলার একটি মহকুমা, মায়াবতী থেকে মাইল-পাঁচেক দূরে অবস্থিত। মায়াবতীতে অবস্থানকালে আমরা বার-দুই লোহাঘাটে বেড়াতে গিয়েছিলাম। এতদিনে মায়াবতীতে স্বতন্ত্র ডাকঘর হয়ে থাকবে; তখন কিন্তু লোহা-ঘাটের পোস্ট-অফিসের দ্বারাই মায়াবতীর ডাকতন্ত্রের কাজ চলত।

লোহাঘাট ছাড়িয়ে ক্রমশ আমরা পর্বতের জনবিরল আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করতে আরম্ভ করলাম। কদাচিৎ কখনো অতি ক্ষুদ্র আকারের এক-আধটা লোকালয় চোখে পড়ে; কোথাও বা দু-চার জন কাঠুরিয়াকে কাষ্ঠ ছেদন করতে দেখা যায়; পথে পথিক অথবা পথচারী দলের সাক্ষাৎ প্রায় নেই বললেই চলে। জনহীন নিস্তব্ধ পথে আমরাই একমাত্র যাত্রী,—দুদ্দাড় ক'রে নেমে চলেছি। জায়গায় জায়গায় পথ এতই খাড়া যে, জননী বসুধার স্নেহকেন্দ্রের আকর্ষণ অত্যধিক বৃদ্ধিহেতু ডাণ্ডির উপর আরূঢ় হয়ে ব'সে যাওয়া খুব নিরাপদ ব'লে মনে হয় না, ডাণ্ডিবাহী কুলিদের পক্ষেও ভার সামলে টেনে রেখে ডাণ্ডি বহন করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। সে সকল স্থানে ডাণ্ডি থেকে অবতরণ ক'রে কিছুটা পথ আমরা পদব্রজে চলতে লাগলাম।

অর্ধেকেরও অনেকটা বেশি পথ নেমে আসার পর এক সময়ে লক্ষ্য করলাম, অলক্ষিতে কখন্ গাছপালার সভা ঘনীভূত হয়েছে; দূরে নিম্নপ্রদেশে দেখা দিয়েছে নিবিড় নীলের দিগন্তবিস্তৃত সমারোহ। ডাণ্ডির ওপরে সোজা হয়ে বসলাম। বুঝতে বাকি রইল না, যে

অরণ্যরাজের দর্শনলাভের প্রত্যাশায় ঔৎসুক্যচকিত হৃদয়ে অপেক্ষা ক'রে আছি, তারই প্রত্যন্তদেশে এসে পড়েছি। মহারাজদের নিকট অবগত হয়েছিলাম, মায়াবতী থেকে অবতরণ করবার এই পথে আমাদের ভারতবিখ্যাত টনকপুর মহারণ্যের একটা অংশ ভেদ ক'রে যেতে হবে। সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রধান পাঁচ-সাতটি মহারণ্যের মধ্যে টনকপুর অরণ্য অন্যতম। বৃহৎ অরণ্যের ধারণা আমার যে একেবারে ছিল না, তা নয়। সাঁওতাল পরগনার বনজঙ্গল এবং রাঁচি-হাজারিবাগ অঞ্চলের অরণ্যানীর সঙ্গে কতকটা পরিচয় ছিল। কিন্তু টনকপুর অরণ্য দেখার সময়ে বুঝেছিলাম, রাজাধিরাজের দেখা পূর্বে পাই নি,—পূর্বে যাদের দেখা পেয়েছিলাম তারা মাত্র সামন্তরাজ।

বৃহৎ পাদপশ্রেণীর নিবিড়তা কিছুক্ষণ ধ'রে বেড়ে চলেছিল, অবশেষে এক সময়ে বুঝতে পারলাম বিশাল অরণ্যের নিভৃত অন্দর-মহলে পৌঁছে গেছি। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিস্ময় এবং পুলকের স্পর্শে যেন অন্তরিন্দ্রিয় পর্যন্ত রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে,—দিকে দিকে পাঁচ-সাত হাত অন্তর সুদীর্ঘ বৃক্ষরাজি বিরাট দৈত্যের ন্যায় স্তব্ধগাম্ভীর্যে দাঁড়িয়ে। তাদের না আছে সংখ্যা, না আছে শেষ। সেই মহীরুহখচিত বনভূমির বুকের উপর দিয়ে বৃক্ষকাণ্ড এড়িয়ে এড়িয়ে অস্পষ্ট পথরেখা সরীসৃপ গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ক্ষণকাল পরে একটা বিস্তীর্ণ সানুদেশের উপর উপনীত হয়ে ডাণ্ডিওয়ালা কুলি ও ভারবাহী কুলিগণ বিশ্রামের জন্য গতিরোধ করলে। আমরাও ডাণ্ডি থেকে অবতরণ ক'রে ইতস্তত ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। খানসামা ও চাকরেরা আমাদের জন্য চা ও খাবারের আয়োজন করতে ব্যাপৃত হ'ল।

ভূমিতলের অবস্থা এবং প্রকৃতি দেখে বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না। আমাদের চতুর্দিকে অন্তত আধ বর্গমাইল বিস্তৃত যে বৃহৎ ভূখণ্ড, তার উপর একটি তৃণ নেই, লতাগুল্ম নেই, আগাছা নেই। যতদূর দৃষ্টি চলে, সমস্ত বিস্তৃতিটা একেবারে অনাবৃত, পরিচ্ছন্ন। দেখে মনে হয়, কে যেন কিছু পূর্বে সমস্ত চেঁচে-ছুলে সযত্নে ঝাঁট দিয়ে পরিস্কৃত ক'রে রেখেছে। নিবিড় বনানীর মহা-আওতার মধ্যে প'ড়ে মৃত্তিকা তার উৎপাদিকা-শক্তি হারিয়েছে।

বৃক্ষসকলের শাখাপল্লবভাগ বহু উচ্চে অবস্থিত ; সেই জন্য সোজাসুজি দৃষ্টিপাত করলে নগ্ন বৃক্ষকাণ্ডগুলির অন্তরাল দিয়ে বহু দূরের দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। উর্ধ্বে বৃক্ষপত্রাচ্ছাদিত চন্দ্রাতপ, নিম্নে সুমার্জিত ভূপৃষ্ঠ এবং মধ্যস্থলে শালকাঠের খুঁটির ন্যায় বৃক্ষকাণ্ডসমূহ দিয়ে রচিত বনদেবতার এই বিরাট নাট্যশালায় আমরা বিরতিকালে এসে পড়েছি। গভীর নিশীথে ব্যাঘ্র-গর্জনের গভীর নিনাদের দ্বারা যখন এর অভিনয়কাল সূচিত হয়, তখনকার কথা কল্পনা ক'রে মন সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। এখন এখানে অখণ্ড নিঃশব্দতার পালা ; বায়ুর মর্মর নেই, পাখির কাকলি নেই, ভ্রমরের গুঞ্জন নেই, এমন কি, প্রজাপতির পক্ষসঞ্চালন পর্যন্ত নেই। যে বিচিত্র এবং বিপুল নিনাদোল্লাসে উপনীত হবার সাধনায় মহামৌন এখন ধ্যাননিমগ্ন, আমরা কয়েকজন মানুষে মিলে আমাদের কথোপকথন আর গতিবিধির দ্বারা তার মহিমাকে খণ্ডিত করছি।

কোথায় কেমন ক'রে কোন্ সাদৃশ্য যে ছিল, তা ধরতে পারছিলাম না ; অথচ এই বিশাল বনভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে কেবলই আমার মনে পড়ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' উপন্যাসের ডাকাতে কালীদীঘির কথা। সেই বৃহৎ দীঘিও এখানে নেই ; সুতরাং পাহাড়ের মতো তার পাড়ও অবর্তমান ; এমন কি, সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছের চিহ্নও এখানে

কোনদিকে খুঁজে পাওয়া যায় না; অথচ কেবলই মনে হয়, আমাদের চারপাশের বিশ-পঁচিশটা গাছের প্রচ্ছন্ন আশ্রয় থেকে জন-পঞ্চাশেক কৃষ্ণবর্ণ বিপুলকায় ডাকাত সড়সড় ক'রে নেমে প'ড়ে আমাদের মধ্যে কাউকে, ধরা যাক ললিতবাবুকেই, ডাণ্ডিতে তুলে নিয়ে যদি গভীর বনের মধ্যে ছুট দেয়, তা হ'লে বিব্রত যতটা হই, বিস্মিত হই তার চেয়ে অনেক কম।

দেহ-এঞ্জিনের জল-কয়লা, অর্থাৎ চা এবং খাবার প্রস্তুত হয়ে ছিল। উভয়ের সাহায্যে খানিকটা স্টীম তৈরি ক'রে নিয়ে ডাণ্ডিতে আরোহণ ক'রে পুনরায় আমরা এগিয়ে চললাম। অধিকক্ষণ বিলম্ব করবার উপায় ছিল না আমাদের। সূর্যাস্তের পূর্বেই বন শেষ ক'রে ফাঁকা জায়গায় নিষ্ক্রান্ত হতে হবে। অবশ্য, দলে বেশি লোক থাকলে সন্ধ্যার প্রথম দিকেও তেমন ভয়ের কারণ থাকে না; কিন্তু এমনই ধূর্ত এবং ক্রূর জানোয়ার ব্যাঘ্র যে, সুযোগমতো দিনমানেও দলের অসতর্ক শেষ লোকটিকে টপ ক'রে পিঠে ফেলে গভীর অরণ্যে স'রে পড়তে মাঝে মাঝে তাকে দেখা যায়।

ডাণ্ডিওয়ালা কুলিদের গল্প করাই অভ্যাস। ইতিপূর্বেও তারা বরাবর গল্প করতে করতে এসেছে; এখন থেকে অরণ্য ক্রমশ নিবিড়তর হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে গল্প করবার স্পৃহাও তাদের বেড়ে উঠতে লাগল। আমিও নানাবিধ প্রশ্ন ক'রে ক'রে তাদের গল্প বলবার উৎসাহে ইন্ধন জোগাতে লাগলাম। গল্প চলছিল নিতান্তই সাময়িক স্বার্থের সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে। কোন্ বনে ভাল্লুক বাস করে, কোন্ অঞ্চলে পশুরাজ শার্দূলের সার্বভৌম রাজত্ব, পথের কোন্ কোন্ স্থল ভেদ ক'রে বন্য-হস্তিযূথের গমনাগমনের রীতি আছে, ইত্যাদি বিষয়ে তারা আমাকে প্রাজ্ঞ করতে করতে চলেছিল।

ডাণ্ডিওয়ালাদের মতে বাঘ, ভাল্লুক ও হাতীর মধ্যে বুনো হাতীর ন্যায় ভয়ঙ্কর জন্তু আর কোনোটাই নয়। বাঘ-ভাল্লুকের হাত থেকে নিস্তার লাভ করা তবু কখনো কখনো সম্ভব হয়, কিন্তু বন্য হস্তীর সম্মুখে পড়লে পরিত্রাণ নেই; শুঁড় এবং পায়ের যৌথ ক্রিয়াশীলতার তাড়নায় মানুষের দেহে আর পদার্থ রাখে না তারা। দল বেঁধে ভিন্ন কখনো তারা একা-একা ঘুরে বেড়ায় না। মানুষ সম্মুখে পড়লে খেয়ালপরবশ হয়ে যূথনাথ যদি দলবল সহ এড়িয়ে চ'লে গেলেন, তা হ'লেই রক্ষে; অন্যথা, নিষ্ঠুর মৃত্যুর কবলিত হওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর থাকে না। ক্ষুধার বশবর্তী হয়ে আহারের জন্য যারা প্রাণীহত্যা করে, তাদের জিঘাংসার সীমা থাকে; কিন্তু ক্রোধের বশবর্তী হয়ে শুধু হত্যা করবার জন্য যারা হত্যা করে, তাদের থাকে না। এ কথা বর্তমানকালে মানুষের বিষয়েও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। পূর্বে মানুষ যখন নরমাংস আহার করত, তখন সে পিতাকে হত্যা ক'রেই নিরস্ত হ'ত; এখন সে নরমাংস খায় না, তাই পিতাকে হত্যা করতে হ'লে প্রথমে সে পিতার সম্মুখে পুত্রকে হত্যা করে।

যেমন যেমন আমরা এগিয়ে চলেছিলাম, অরণ্যের আকৃতি এবং প্রকৃতিও তেমনি পরিবর্তিত হয়ে চলেছিল। কোনোখানে বিরলবৃক্ষ মার্জিতভূমি অন্তরালময় অরণ্য; কোথাও ঝোপ-ঝাড়-লতা-পাদপ-সমাকীর্ণ জমাট বনভূমি; কোথাও বা সুদূরবিস্তৃত পিঙ্গলবর্ণের বেতবন। কুলিদের মুখে শুনলাম, বেতবনের পিঙ্গল রঙ অনেকটা বাঘের গায়ের রঙের মতো ব'লে, প্রাণী বধ করবার জন্য এই বেতবন বাঘেদের পক্ষে উপযুক্ত ঘাঁটি। বেতবনের রঙের সঙ্গে দেহের রঙ মিলিয়ে চোখ দুটি অবারিত রেখে তারা ওৎ পেতে নিঃশব্দে ব'সে থাকে,—শিকার দেখতে পেলেই অকস্মাৎ তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শিকারসহ বেতবনে ফিরে আসে।

কুলিদের মুখে নখ-দন্ত-শুণ্ড-সম্পন্ন হিংস্র অরণ্যবাসীদের নানাবিধ কীর্তিকলাপের রক্ত-জল-করা কাহিনী শুনতে শুনতে আমরা দুরন্ত অরণ্যভূমি শেষ ক'রে আনছিলাম। সমস্ত সময়টা দেহে এবং মনে একটা হালকা ধরনের রোমাঞ্চ লেগে থাকে নি, সে কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। কিন্তু ঐ রোমাঞ্চটুকু লেগে না থাকলে টনকপুরের ভয়াবহ অরণ্য আমাদের নিকট নিশ্চয়ই খানিকটা মহিমাচ্যুত হ'ত। আমাদের আনন্দের মূলে ভীতির ছোঁয়াচ থাকলে সে আনন্দ প্রগাঢ় হয়। সেই ঝোপই আমাদের মনকে সবচেয়ে বেশি উত্তেজিত করে, যে ঝোপের মধ্যে অকস্মাৎ একটা বাঘের গর্জন ক'রে ওঠবার সম্ভাবনা থাকে।

বাঘের কথা ভেবে আমরা কিন্তু খুব বেশি চিন্তিত হই নি; কারণ, বাঘ ব'লেই বাঘের যে প্রাণের ভয় থাকতে নেই, এ কোনো কাজের কথা নয়। অত লোকের মধ্যে সহসা আত্মপ্রকাশ করার দুঃসাহস বাঘের পক্ষেও সম্ভব হবে ব'লে আমাদের মনে হচ্ছিল না। ভাল্লুকের ভয় আমরা আরও কম করছিলাম। একান্তই যদি একটা ভাল্লুক আমাদের আক্রমণ করতে উপস্থিত হয়, আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই তার পক্ষে মারাত্মক হবে। সবাই মিলে চাঁদা ক'রে কিল মেরে মেরে আর লোম ছিঁড়ে ছিঁড়ে তাকে সাবড়ে দেওয়া চলবে।

কিন্তু অকস্মাৎ হাতীর দলের সামনে প'ড়ে গেলেই বিপদ! বস্তু যদি মত্ত হয়ে ওঠে, তা হ'লে আর রক্ষে থাকবে না। হয়তো শুঁড় দিয়ে ডাণ্ডিগুলো তুলে তুলে প্রাক্তন আরোহী এবং ডাণ্ডি একসঙ্গেই চূর্ণ করতে থাকবে। কিংবা, অতটা নির্দয় না হয়ে, শুঁড় দিয়ে আমাদের সাপটে ধ'রে যদি দশ-পনেরো হাত ঊর্ধ্বে চালান করতে থাকে, তা হ'লেও অবস্থাটা বিশেষ সুবিধার হবে না।

যাই হোক, এমন-কোনো শোচনীয় ঘটনা ঘটবার পূর্বেই সৌভাগ্য-ক্রমে আমরা মহারণ্য থেকে ক্রমশ নির্গত হয়ে অরণ্যের নিরাপদ প্রত্যন্তদেশে এসে পড়লাম। পিছন দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রে মনে মনে বললাম, হে বিরাট, হে সুন্দর, হে ভয়ঙ্কর মহাগহন, তোমাকে প্রণাম করি। বিশালের যে অপূর্ব ধারণা তুমি আজ আমার অন্তরে পৌঁছে দিলে, তা চিরদিনের সম্পদ হয়ে রইল।

টনকপুরের ডাকবাংলোয় আমরা যখন উপস্থিত হলাম, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। হাজার-ছয়েক ফুট একটানা হড়হড়িয়ে নেমে এসে সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম, আশ্রয় ছেড়ে নড়তে আর ইচ্ছে হ'ল না। টনকপুরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা পরদিন প্রত্যূষের জন্য অপেক্ষা ক'রে রইল।

আর এক দফা ভাল ক'রে চা-পান ক'রে তাস নিয়ে আমরা খেলতে বসলাম। চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে তাস খেলার সেই বোধ করি শেষ পালা। ছুটির পর ভাগলপুরে ফিরে গিয়ে লছমীপুর মামলার চরম অবস্থার অর্থাৎ শুনানীর তোড়জোড় নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়েছিল যে, তার মধ্যে আর তাস খেলবার সময়ও ছিল না, সুযোগও পাওয়া যায় নি। মায়াবতীর সুদীর্ঘ স্বপ্ন-জীবনের পর ভাগলপুরের কঠোর কর্মজীবন তার সকল প্রকার দাবি-দাওয়া নিয়ে আমাদের সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিল। কবি চিত্তরঞ্জন পুনরায় দুর্ধর্ষ ব্যারিস্টার সি. আর. দাশের ভূমিকা অবলম্বন ক'রে আইন-নজির এবং সাক্ষী-সবুদের মহাসাগরে নিমজ্জিত হয়েছিলেন।

পরদিন অতি প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে দেখি, স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বল আলোকে ঘর ভ'রে গিয়েছে। তখনো অনেকেই শেষ স্বপ্নের অলস বিলাসে নিমগ্ন। শয্যা ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে

এসে দাঁড়ালাম। অদূরে ধূসর শ্যামল হিমালয় পরিণত হেমন্তের হালকা কুয়াশায় আবৃত হ'য়ে ধ্যানগম্ভীর যোগীর মতো অবস্থান করছে। আকাশ ঘন নীল; বাতাসে একটা অভূতপূর্ব উৎসাহের হিল্লোল। একটা অদৃশ্য অগোচর শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে বারান্দা থেকে নেমে প'ড়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললাম।

একটা জায়গায় মোড় ফিরতেই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালাম। এ কি দুরন্ত ভয়ঙ্করী নদী! পরিসর তেমন বেশি নয়, কিন্তু ভঙ্গী দেখলে মনে হয়, ভয়াবহরূপে গভীর। প্রায় কানাভরা একনদী গৈরিক রঙের জল টগবগিয়ে ফুটতে ফুটতে উদ্দাম গতিভরে ছুটে চলেছে। আবর্তের পর আবর্ত ভেসে ভেসে আসছে, আর দেখতে দেখতে, ঘুরতে ঘুরতে বেরিয়ে যাচ্ছে। এমন ভীষণ খরস্রোত যে মনে হয়, এক টুকরো তৃণ নিক্ষেপ করলে নিমেষের মধ্যে দু টুকরো হয়ে যাবে।

একটা বিস্ময়ের কথা,—এত যে স্রোত, এত যে আবর্ত, এত আলোড়ন, কিন্তু সেজন্য কিছুমাত্র শব্দ নেই। নিঃশব্দ মসৃণ গতিতে বিশাল জলরাশি ছুটে চলেছে নির্বাক ছায়াচিত্রের নদীর মতো। অমন দুরন্ত গতির মধ্যে এই নিঃশব্দতা, ভয়াবহতাকে যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

নদীর তীরে তীরে চেয়ে দেখলাম, কোথাও ঘাট নেই, আঘাটা নেই। জলপানের জন্য নদীতটে কোনো পশুর অথবা জলাহরণের জন্য কোনো মানুষের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। সমস্ত প্রাণীজগৎ যেন এই ভীষণ স্রোতস্বিনীর সান্নিধ্য হতে সত্রাসে স'রে দাঁড়িয়েছে। জলরেখার অতি নিকটে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে কেমন ভয় করে; মনে হয় মোহগ্রস্ত হয়ে দুই বাহু প্রসারিত ক'রে ফুটন্ত জলরাশির মধ্যে অকস্মাৎ নিমজ্জিত হয়ে না যাই। সভয়ে খানিকটা পিছিয়ে আসি।

ডাকবাংলোয় ফিরে এসে অবগত হলাম নদীর নাম সারদা।

সারদা পার্বত্য নদী, হয়তো পূর্বরাত্রে পর্বতাঞ্চলে প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য ঢল নামায় আজ তার এই স্ফীতোদ্ধত রূপ,—দুদিন পরে হয়তো বিশীর্ণ হয়ে যাবে; কিন্তু সুদীর্ঘ ছত্রিশ বৎসর পরেও আজ তার সেদিন-কার সর্বনাশা মূর্তি আমার মানসপটে সুস্পষ্টভাবে অঙ্কিত হয়ে আছে। পরবর্তী কালে "দামোদরের বৈতরণী পার" নামক একটি গল্প লিখতে বৈতরণীর যে বর্ণনা দিয়েছিলাম, তার কল্পনা জুগিয়েছিল বহুকাল-পূর্বে-দেখা সারদা নদীর স্মৃতি।

সেদিন আমরা টনকপুর স্টেশনে ট্রেনে উঠে হিমালয়ের রাজ্য পরিত্যাগ ক'রে সুদূর কলিকাতা নগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। কিন্তু তৎপূর্বে দুর্দান্ত সারদা নদী আরও বার-দুই আমাকে তার তীরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।

পূজার ছুটির পর অল্পদিনের মধ্যেই লছমীপুর মামলার 'বহস্'এর (বক্তৃতার, ইংরেজী ভাষায় argument-এর) দিন ঘনিয়ে এল। প্রতিবাদিনী পক্ষের বিবৃতির বৈশিষ্ট্য হেতু এ মকদ্দমায় সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়ের প্রমাণের দায়িত্ব (onus) পড়েছিল প্রতিবাদিনীর উপর। সুতরাং, বক্তৃতা আরম্ভ করতে হ'ল প্রতিবাদিনী রাণী কুসুমকুমারীর কাউন্সেল চিত্তরঞ্জন দাশকে।

ওদিকে বাদীগণের পক্ষে জাঁকিয়ে বসেছেন প্রফুল্লরঞ্জন দাশ সহ সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। উভয় পক্ষের আইনবাজ প্রধান জ্যোতিষ্কদের অমাত্য হয়ে বিরাজ করছেন নানা আকারের এবং প্রকারের গ্রহ-উপগ্রহ-গণ। প্রত্যেকের সম্মুখে টেবিলের উপর পূর্ণায়তন ফুলস্ক্যাপ কাগজের খাতা এবং পেনসিল। শত্রু-মিত্র উভয় পক্ষের ব্যবহারজীবিগণ বক্তৃতার সারমর্ম সঙ্কলন করতে ব্যস্ত।

আইন-নজির-সাক্ষী-সবুদের অস্ত্র পরিচালনার দ্বারা দাশ সাহেব যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। তাঁর দুই দিকে দুজন সহসেনাপতি অবস্থান ক'রে প্রয়োজনমতো আয়ুধ সরবরাহ করছেন। কচিৎ কখনো বিপক্ষ তরফ থেকে গুলিগোলার আক্রমণ আসছে। উত্তরে গর্জন ক'রে উঠছে চিত্তরঞ্জনের কামান। গম্ভীর নিবিষ্ট মুখে তটস্থ হাকিম উভয় পক্ষের যুক্তির দ্বন্দ্ব লিপিবদ্ধ ক'রে নিচ্ছেন। সাক্ষী-সবুদের জেরা-জুরির সহজ দিন গত হয়েছে; সুপরিকল্পিত রায়ের বিরাট সৌধ গঠনের জন্য এখন থেকে তাঁকে যুক্তি-প্রতিযুক্তির মাল-মসলা সংগ্রহ করতে হবে। সম্মুখে দক্ষিণ পাশে ব্যগ্রোন্মত মুখে সুদক্ষ পেশকার নিজামৎ হোসেন ব'সে

আছেন ; ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র হাকিমের সম্মুখে অভিপ্রেত কাগজপত্র পেশ করছেন।

যে সব উকিলের হাতে উপস্থিত কাজকর্ম নেই, বার-লাইব্রেরি ঝেঁটিয়ে এসে তাঁরা চেয়ার দখল ক'রে বসেছেন। যাঁদের আছে, তাঁরা এক এজলাস থেকে অপর এজলাসে যাবার ফাঁকে অউয়ল (প্রথম) সব-জজের এজলাসে একবার ঢুঁ মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু-চার মিনিট ভাগলপুরের আদালতে দুর্লভ বক্তৃতা শুনে যাচ্ছেন। উকিলদের পশ্চাতে কয়েক সারে সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে সাধারণ শ্রোতা এবং দর্শকের দল। বৃহৎ এজলাস-ঘর গমগম করছে, সর্বস্থল তার পরিপূর্ণ,—একমাত্র বিরতি-কালের ধোয়া-মোছা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন যূপকাষ্ঠের ন্যায় সাক্ষীকাঠরা ব্যতীত। সাক্ষীরা সব গত হয়ে সূক্ষ্ম লিপিদেহ অবলম্বন ক'রে এজাহারের প্রেতলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

দিনের পর দিন এইরূপ গুরুগম্ভীর ছন্দে মকদ্দমা এগিয়ে চলেছে। কিন্তু নববর্ষার আকাশের মেঘমলিন দেহে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণও যেমন দেখা যায়, লছমীপুর মামলার গভীর-গুরু আকাশেও তেমনি মাঝে মাঝে কৌতুকহাস্যের বিদ্যুৎ-চমক প্রকাশ লাভ করত।

অনেকেই এই গোত্রের বিদ্যুৎ-চমক সৃষ্টি করতে পারতেন; কিন্তু এ বিষয়ে প্রতিবাদিনী পক্ষের বড় উকিল আমার সেজদাদা নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বিশেষ একটু শক্তি ধারণ করতেন। কৌতুক করবার উপযুক্ত সুযোগ অতি সহজেই তিনি খুঁজে পেতেন এবং গম্ভীর মুখে কৌতুকটি সম্পন্ন ক'রে উপাদেয় হাস্যরসের অবতারণা করতে জানতেন। সুদীর্ঘ মামলার মধ্যে এমন সুযোগ বহুবারই হয়তো তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু উপস্থিত আমার দুটি দিনের কথা মনে পড়ছে।

একদিন চিত্তরঞ্জন আদালতের সমীপে একটি মূল্যবান নজির

উপস্থাপিত ক'রে প্রতিবাদিনীর সমক্ষে সে নজিরের প্রযোজ্যতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করছেন। সেই সময়ে বাদী পক্ষের একজন উৎসাহশীল আধা-জুনিয়ার উকিল সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের মনোযোগ আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে অস্ফুট স্বরে বারংবার বলতে লাগল, "But there is a case...but there is a case····।" বোধ হয় এই কথাই সে জানাতে চাচ্ছিল, চিত্তরঞ্জন দাশ যে কেসটি নিজের স্বপক্ষে প্রয়োগ করতে চাইছেন, তাকে খণ্ডিত করে এমনও একটি কেস তার জানা আছে।

শুধু সত্যেন্দ্রপ্রসন্নই নন, উভয় পক্ষের সকল উকিল-ব্যারিস্টারই তখন গভীর মনোযোগের সহিত চিত্তরঞ্জনের বিচার-বিতর্ক শুনতে এবং তার মর্ম লিপিবদ্ধ করতে ব্যস্ত; তার মধ্যে 'But there is a case···· but there is a case ···'ধ্বনি বেশ-একটু উৎপাতের সৃষ্টি করছিল। সাড়া পাওয়ার অভাবে যাতে সে ধ্বনি আপনা-আপনি থেমে যায় বোধ-হয় সেই উদ্দেশ্যে, অথবা অনাবশ্যক খোঁচাখুঁচিতে বিরক্ত হয়ে সত্যেন্দ্র-প্রসন্ন কথাটা শুনতে পেয়েও কানে তুলছিলেন না।

কিন্তু যে অত্যুৎসাহী জুনিয়র উকিল মক্কেলের দৃষ্টিতে নিজের উপ-যুক্ততা প্রমাণ করবার লোভে লুব্ধ, তাকে দমন করা সহজ কথা নয়। এদিকে ইত্যবসরে সেজদাদারও মনের মধ্যে কৌতুকপরায়ণতা পরবর্তী সুযোগের জন্য ওৎ পেতে বসেছে। যাঁহাতক আর একবার বলা 'But there is a case Sir....', অমনি সেজদাদা তাঁর চশমার খালি খাপটা তার সম্মুখে ফেলে দিয়ে বললেন, "Here is another case।"

বোধ করি জুনিয়ার উকিলের উত্তপ্ত উৎসাহে জলক্ষেপ করবার এর চেয়ে প্রকৃষ্টতর উপায় ছিল না। অবথা উৎসাহের অন্যায় অসঙ্গতি উপলব্ধি ক'রে বেচারা অপ্রতিভস্মিত মুখে কুঁকড়ে গিয়ে নিজের সহজ

অবস্থায় ফিরে ব'সে নিরস্ত হ'ল। এদিকে ব্যবস্থার অভিনবত্বে কৌতুক বোধ ক'রে এবং ব্যাঘাতকারীর দণ্ডবিধানে কতকটা খুশি হয়ে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন থেকে আরম্ভ ক'রে সকলে হাসতে আরম্ভ করেছেন।

নিম্নপ্রদেশে প্রবাহিত হাস্যতরঙ্গ উপর থেকে লক্ষ্য ক'রে চিত্তরঞ্জনের নজিরের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যায় প্রপীড়িত হাকিম ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তাঁর ভারাক্রান্ত মনকে এ আনন্দ-তরঙ্গে একটু ভাসাতে পারলে তিনি খুশি হতেন। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের বিরতিহীন ব্যাখ্যার বেড়া ডিঙিয়ে সে কার্য করবার কোনো উপায় ছিল না,—নিজের চতুর্দিকে প্রবাহিত হাস্যতরঙ্গের বিষয়ে এমনই অচেতন থেকে চিত্তরঞ্জন বক্তৃতা ক'রে চলেছিলেন। আজকের কৌতুকরসে হাকিম শরিক হতে পারলেন না, শুধু সাক্ষী হয়েই রইলেন।

দ্বিতীয় দিন কিন্তু সেজদাদা হাকিমকেই প্রথম শরিক ক'রে নিয়ে কৌতুকরসের অবতারণা করলেন।

তখন দাশ সাহেবের বক্তৃতা শেষ হয়ে দশ-বারো দিন সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বক্তৃতা চলেছে। একদিন অপরাহ্নে সেদিনকার মতো বক্তৃতা শেষ হ'লে হাকিম বললেন, "সার্ সত্যেন্দ্র, যত দিন প্রয়োজন হয় আপনি বক্তৃতা করুন, তাতে কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু আপনার বক্তৃতা শেষ করতে আর কতদিন লাগবে তার একটা আনুমানিক হদিস পেলে তদনুযায়ী আমার পরবর্তী কর্মাবলীর ব্যবস্থা করতে পারি।"

লছমীপুর মামলায় সর্বশুদ্ধ চল্লিশটি স্বতন্ত্র ইস্যু, অর্থাৎ বিচার্য বিষয়, ছিল। আর যতটা সময় লাগবে তার মোটামুটি একটা আন্দাজ দিয়ে সার্ সত্যেন্দ্র বললেন, "জরুরী ইস্যুগুলোতেই যা কিছু সময় লাগবে। গৌণ (minor) ইস্যুগুলোতে বেশি সময় লাগবে না; এক-এক দিনে চার-পাঁচটা ক'রে ইস্যু সারতে পারব।"

আর যায় কোথায়! নিমেষের মধ্যে সেজদাদার মস্তিষ্কে কৌতুকদেবতা ভর ক'রে বসেছেন! এ পর্যন্ত ইংরেজীতে কথাবার্তা চলছিল। হাকিম বর্ধমাননিবাসী বাঙালী মুসলমান, মাতৃভাষা বাংলা; সেজদাদা টপ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে সোজাসুজি বাংলা ভাষায় গম্ভীর মুখে বললেন, "পোয়াতী যখন ঘাগী, তখন এক-এক দিনে চার-পাঁচটা ক'রে ইস্যু খুব কঠিন হবে না হুজুর।" ব'লে তেমনি গম্ভীর মুখে ব'সে পড়লেন।

মুহূর্তের একটা সামান্য ভগ্নাংশ অতিবাহিত হ'ল কথাটার মর্মোপলব্ধি করতে। তারপর অকস্মাৎ সমবেত হাস্যের অট্টরোলে এজলাস-কক্ষ একেবারে ভেঙে পড়ল। হাস্যতরঙ্গের প্যাঁচ ঘোরালেন প্রথমে স্বয়ং হাকিম; সঙ্গে সঙ্গে তাতে যোগ দিলেন সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, চিত্তরঞ্জন দাশ, প্রফুল্লরঞ্জন দাশ প্রভৃতি থেকে আরম্ভ ক'রে উকিল ব্যারিস্টার মুহুরি, কারপরদাজ (কর্মচারী), এমন কি পেশকার সাহেব ও সরাফৎ আরদালি পর্যন্ত সকলে।

মিনিট-খানেক পরে মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্যের আমেজ নিয়ে হাকিম এজলাস ছেড়ে নেমে গেলেন; নিঃশব্দস্মিতমুখে উকিল-বারিস্টাররা তাঁদের ব্রিফ গোছাতে আরম্ভ করলেন; পেশকারের মুখ থেকেও হাস্যের শেষ আভা তখনো একেবারে বিলীন হয়ে যায় নি; শুধু ওস্তাদ যিনি, তাঁর মুখ নির্বিকার, হাস্যলেশবর্জিত, স্বাভাবিক।

আদালত-কক্ষ ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়েছি, এমন সময়ে লছমীপুর রাজের উকিল ম্যানেজার অনন্তপ্রসাদ পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত রেখে সহাস্যমুখে জিজ্ঞাসা করলে, "কিয়া বাৎ থা উপেন? তুমলোক ইৎনা হস্‌তেথো কাহে?" (কি কথা ছিল উপেন? তোমরা এত হসেছিলে কেন?)

বললাম, "তুমভি তো হস্ রহে থো।" (তুমিও তো হাসছিলে।)

অনন্তপ্রসাদ বললে, "কিয়া করেঁ? সব কোই হস্‌নে লাগা, হম বেওকুফকা তরে চুপ রহেঁ?" (কি করব? সকলে হাসতে লাগল, আমি নির্বোধের মতো চুপ ক'রে থাকব?)

ব্যাপারটা তাকে ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলাম। কৌতুকটা হৃদয়ঙ্গম ক'রে অনন্ত হো-হো ক'রে হাসতে লাগল।

তার দিকে নিষেধের হস্তোত্তোলন ক'রে বললাম, "ব্যস্ করো। ঔর মৎ হস্‌সো।" (ক্ষান্ত হও, আর হেসেনা।)

ঔৎসুক্যভরে অনন্তপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলে, "কাহে?" (কেন?)

বললাম, "দো দফে তুম হস্‌সা,—অব তিসরা দফে হস্‌নেসে পাক্‌কা বেওকুফ বন্ যাওগে।" (দুবার তুমি হাসলে,—এখন তৃতীয়বার যদি হাসো, পাকা নির্বোধ হয়ে দাঁড়াবে।)

"কৈসে?" (কেমন ক'রে?)

বললাম, "কৌতুকের কথা শুনে বুদ্ধিমান লোকেরা একবারই হাসে। নির্বোধ লোকেরা কিন্তু হাসে তিনবার। প্রথমবার না বুঝে হাসে; দ্বিতীয়বার বুঝে হাসে; আর, তৃতীয়বার না বুঝে হেসেছিল ভেবে হাসে। এজলাসে তুমি না বুঝে হেসেছিলে; বারান্দায় তুমি বুঝে হাসলে; এর পর আবার যদি হাসো, তা হ'লে মনে করব, না বুঝে হেসেছিলে ভেবে হাসছ।"

"তব্ তো অব দো রোজ হস্‌না নহি চাহিয়ে।" (তা হ'লে তো এখন দুদিন হাসা উচিত হয় না।) ব'লে আমার পৃষ্ঠে একটা চপেটাঘাত ক'রে হাসতে হাসতে অনন্তপ্রসাদ প্রস্থান করলে।

এই ঘটনার দশ-বারো দিন পূর্বে অর্থাৎ যেদিন চিত্তরঞ্জন তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন, সেদিন প্রকাণ্ড এজলাসে যে পরম কৌতুক-

জনক ব্যাপার ঘটেছিল, সে কথা এখানে বিবৃত না করলে এ প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

বিদ্যা-বুদ্ধি বিচার-বিবেচনার দ্বারা মানুষ নিজেকে যতই বলিষ্ঠ করুক না কেন, অথবা বলিষ্ঠ মনে করুক না কেন, তথাপি সংস্কার হতে নিস্তার লাভ করা তার পক্ষে কত যে কঠিন, যে ঘটনা আমি বলতে উদ্যত হয়েছি তার দ্বারা সে কথা সপ্রমাণ হবে। একান্তই যদি সে কথা সপ্রমাণ না হয়, অবস্থাবিশেষে পরিণত বয়সের এবং পরিণততর বুদ্ধির মানুষ কত যে ছেলেমানুষ হতে পারে, অন্তত সে কথা বুঝতে বাকি থাকবে না।

মাস দেড়েক ক্রমান্বয়ে চলার পর যেদিন চিত্তরঞ্জনের বক্তৃতা শেষ-প্রান্তে এসে উপনীত হ'ল, সেদিন বুধবার। ইচ্ছা করলে চিত্তরঞ্জন সেই দিনই তাঁর পালা শেষ ক'রে অপর পক্ষকে বক্তৃতা আরম্ভ করবার সুযোগ দিতে পারতেন। কিন্তু বাদীপক্ষকে বৃহস্পতিবারের বারবেলার অশুভক্ষণে বক্তৃতা আরম্ভ করাতে পারলে দৈবকেও তাদের প্রতিকূল করানো যায়, এই সংস্কারের বশবর্তী হয়ে চিত্তরঞ্জন বুধবারে বক্তৃতা শেষ না ক'রে টেনে-টুনে বাড়িয়ে-টাড়িয়ে একেবারে বৃহস্পতিবারে বারবেলা আরম্ভ হবার পূর্ব-মুহূর্তে নিয়ে এসে শেষ করলেন।

এই গোপন অভিসন্ধির কথা আমাদের মধ্যে দু-চার জনের অবিদিত ছিল না। চিত্তরঞ্জনের কার্যকুশলতার নৈপুণ্য দেখে আমরা পুলকিত হয়ে উঠলাম। প্রতিপক্ষের অজানিত আসন্ন বিপদের কথা ভেবে আমাদের মনের মধ্যে একটু করুণারও উদ্রেক হ'ল। এমন নিখুঁতভাবে মেপে-জুপে চিত্তরঞ্জন ব্যবস্থা করেছেন যে, বেচারাদের অশুভকালের অকল্যাণের মধ্যে অবতরণ না ক'রে আর উপায় নেই।

কার্যকালে কিন্তু দেখা গেল, আমাদের সব অনুমানই ভুল হয়েছে

চিত্তরঞ্জন আসন গ্রহণ করামাত্র সার্ সত্যেন্দ্র দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, "আমি আজ আমার বক্তৃতা আরম্ভ করব না; কাল করব।"

একটু বিস্মিত হয়ে হাকিম জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন বলুন তো?" আদালতের কাজ করবার মতো তখনো ঘণ্টা দেড়েক সময় বাকি ছিল।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বললেন, "গতকালই মিস্টার দাশ তাঁর বক্তৃতা শেষ করতে পারতেন, শুধু আমাকে অশুভক্ষণে আরম্ভ করাবার উদ্দেশ্যে অযথা বক্তৃতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে আজ বারবেলার ঠিক আগে শেষ করলেন। বৃহস্পতিবার বারবেলায় আমি কিছুতেই আরম্ভ করব না।"

একটা উচ্চ হাস্যরবে এজলাস-ঘর চকিত হয়ে উঠল।

সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আসন গ্রহণ করলে চিত্তরঞ্জন দাঁড়িয়ে উঠে প্রবলভাবে প্রতিবাদ ক'রে বললেন, "এটা বিয়ে, পৈতে অথবা শ্রাদ্ধের মতো কোনো ব্যাপার নয়; আইন-নজিরের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ইংরেজ আদালতের মকদ্দমা,—এ ব্যাপারে হাঁচি, টিকটিকি, বারবেলার কোনো হিসেব নেই।"

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বললেন, "সেই কথাটা মনে রেখে মিস্টার দাশ যদি কাল তাঁর বক্তৃতা শেষ করতেন, তা হ'লে তো কোনো আপত্তি ছিল না। এখনো যদি তিনি তাঁর মকদ্দমার অপরাজেয়তা সম্বন্ধে আরও আধ-ঘণ্টাটাক বক্তৃতা ক'রে আসন গ্রহণ করেন, আমি তৎক্ষণাৎ বক্তৃতা আরম্ভ করব। তিনি বারবেলায় শেষ করলে, আমার বারবেলায় আরম্ভ করতে কোনো আপত্তি থাকবে না। কিন্তু তিনি বারবেলার পূর্ব-মুহূর্তে শেষ ক'রে আমাকে যদি বারবেলার মারাত্মক সলিলে নিক্ষেপ করতে চান, তা হ'লে নিশ্চয়ই আপত্তি করব।"

পুনরায় একটা উচ্চ হাস্যরবে কক্ষ ধ্বনিত হয়ে উঠল।

বারবেলারই মধ্যে বক্তৃতা শেষ করা এবং আরম্ভ করার যুক্তিবত্তা

উপলব্ধি ক'রে চিত্তরঞ্জন বুঝতে পারলেন, বারবেলায় সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে আরম্ভ করানো সম্ভব হবে না। তখন তিনি খরচার প্রশ্ন উত্থাপিত করলেন। বললেন, "সার্ সত্যেন্দ্র যদি নিজের পছন্দমতো বক্তৃতা আরম্ভ করবার বিলাস উপভোগ করতে চান, তা হ'লে তাঁকে সে বিলাস পয়সা দিয়ে খরিদ করতে হবে। আদালতে প্রতিদিন ঘণ্টা পাঁচেক ক'রে মকদ্দমা চলে। এই পাঁচ ঘণ্টার জন্যে আমার মক্কেলকে প্রতিদিন যে মোটা টাকা ব্যয় করতে হয়, তার অনুপাতে দেড় ঘণ্টায় যে টাকা দাঁড়ায়, সেই টাকা আমাদের খরচা দিতে হবে।"

এ দাবির উত্তরে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বললেন, "নিশ্চয় দোব; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একটা হিসেবও করতে হবে। কালকের পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে অন্তত সাড়ে তিন ঘণ্টা আর আজকের সাড়ে তিন ঘণ্টা,—মোট সাত ঘণ্টা সময় বন্ধুবর নষ্ট করেছেন শুধু আমার ঘাড়ে বারবেলা চাপাবার জন্যে; সুতরাং আমার মক্কেল এই সাত ঘণ্টার খেসারৎ পাবার অধিকারী। আদালতের পাঁচ ঘণ্টার জন্যে আমার মক্কেল দৈনিক যে টাকা ব্যয় করছেন, তার অনুপাতে সাত ঘণ্টার মূল্য হিসেব করলে দেখা যাবে, আমার প্রাপ্য বন্ধুবরের প্রাপ্য টাকাকে পাঁচ-ছ বার গিলে খাবার উপযুক্ত।"

পুনরায় উচ্চ হাস্যরবে কক্ষ চকিত হয়ে উঠল।

বিচারক মৌলভী রেদার বখ্‌ৎ বৃহস্পতিবারের বারবেলার রহস্যের সহিত পরিচিত ছিলেন। চিত্তরঞ্জনকে সম্বোধন ক'রে সহাস্যমুখে তিনি বললেন, "যে রকম দেখা যায়, বারবেলায় বক্তৃতা আরম্ভ করতে সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্নকে কিছুতেই রাজী করানো যাবে না। সুতরাং কাল বেলা এগারোটার সময়ে পুনরায় মিলিত হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। আর, খরচার প্রসঙ্গে এ কথা আপনিও স্বীকার করবেন যে, আপনার

প্রাপ্য টাকাকে সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের প্রাপ্য টাকা, পাঁচ-ছ বার না হোক, অন্তত একবার গিলে খাবার উপযুক্ত,—সুতরাং খরচার টাকা গায়ে গায়ে শোধ।" ব'লে সহাস্য মুখে পেশকারের সহিত বিষয়ান্তরে প্রবৃত্ত হলেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের দুজন দুর্ধর্ষ বাঘা-ভাল্লুক ব্যারিস্টারকে বারবেলা নিয়ে ও-রকম বাছ-বিচার, অন্তত বাছ-বিচারের অভিনয় করবার ছেলেমানুষি করতে দেখে আমাদের কৌতুকের পরিসীমা ছিল না। যতই আমরা বিদ্যে-বুদ্ধি জ্ঞানগরিমার তখমা এঁটে ভব্য হই না কেন, যতই আমাদের বয়সের বাড়বৃদ্ধি হোক না কেন, নিরন্তর আমাদের মধ্যে একটি চিরশিশু অথবা চিরকিশোর বাস করে, যাকে কচিৎ-কদাচিৎ আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যায়; কিন্তু দেখা যে যায় তাতে সন্দেহ নেই। যেদিন আমাদের দেহের মৃত্যু ঘটে, সেই দিন আমাদের অন্তরনিবাসী চিরশিশুরও মৃত্যু ঘটে। বোধ করি তার একদিন আগেও ঘটে না। একট অতি স্থূল প্রমাণ দিই। আমার বিশ্বাস, এমন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তি কেউ নেই, যে একান্তে অবস্থান করবার কালে আয়নার সামনে দু-চারটে মুখভঙ্গি না করে। একান্তই যদি থাকে, তেমন কঠোর মানুষের সঙ্গ সর্বথা বর্জনীয়।

তত্ত্বকথা থাক্। সুদীর্ঘ লছমীপুর মামলা অবশেষে একদিন শেষ হয়ে গেল। এত দীর্ঘ, বৃহৎ ও জটিল মকদ্দমা আমার অভিজ্ঞতায় আর দ্বিতীয় দেখি নি। চিত্তরঞ্জন এবং সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বক্তৃতা শুনতে মাঝে মাঝে বড় বড় ইংরেজ হাকিমও প্রথম সবজজের এজলাসে এসে ঘণ্টা খানেক ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে সবজজের পাশে ব'সে থাকতেন। সার্ সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের বক্তৃতার সময়ে ভাগলপুর ডিভিশনের ইংরেজ কমিশনার একদিন বক্তৃতা শুনতে এসেছিলেন। সে সময়ে সার্ সত্যেন্দ্র কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট-জেনারেল।

শেষ যেদিন হ'ল, মনে হ'ল আইন-আদালতের একটা রাজসূয় যজ্ঞই শেষ হয়ে গেল। মনের মধ্যে একটা মহাশূন্যতা প্রবেশ করলে। মনে হতে লাগল, ভূমার পালা তো শেষ হ'ল, এখন অল্প নিয়ে ওকালতি করা যাবে কি ক'রে!

শেষদিনের সামান্য যেটুকু কাজ বাকি ছিল, বেলা আড়াইটা তিনটার মধ্যে চুকে গেল। হাকিম এবং উকিল-ব্যারিস্টারদের কাছে বিদায় নিয়ে চিত্তরঞ্জন বাড়ি ফিরলেন। সেই দিন রাত্রের গাড়িতে কলকাতা প্রত্যাবর্তন করবেন। সে সময়ে বাসন্তী দেবী ও ছেলেমেয়েরা কলকাতায় থাকতেন। বক্তৃতা করবার সময়ে তিনি মহা তপস্যায় নিরত হয়েছিলেন। সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তখন কাজের মধ্যে নিমগ্ন হবার একান্ত প্রয়োজন।

গৃহে ফেরবার সময়ে চিত্তরঞ্জন আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বললেন, "আজ আর আপনার বাড়ি হয়ে এসে কাজ নেই; সোজা সঙ্গে চলুন।"

বাড়ি পৌঁছে হাত-মুখ ধুয়ে প্রথমে আমরা চা পান করলাম। তারপর আমাকে নিয়ে চিত্তরঞ্জন একটা ঘরে রুদ্ধদ্বার হয়ে বসলেন। ললিতবাবুকে ব'লে দিলেন, ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে কেউ দেখা করতে এলে যেন বসিয়ে রাখা হয়।

প্রথমেই একটা কাগজ-পেনসিল নিয়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "কয়েকটি সাধারণ প্রতিষ্ঠানে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে যাব।" ব'লে যে তিন-চারটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল সেগুলির নাম লিখে ফেলে বললেন, "এবার আপনি বলুন, আর কোথায় কোথায় দিতে হবে?"

আমি গোটা দুই প্রতিষ্ঠানের নাম করলাম। সেগুলি তালিকাভুক্ত

ক'রে নিয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তিনি প্রত্যেক নামের দফায় টাকার বিভিন্ন তায়দাদ ফেলতে লাগলেন। শেষ হ'লে যোগ ক'রে দাঁড়াল সাড়ে আট শো টাকা। এ টাকা কেউ তাঁর কাছে চায় নি, কেউ প্রত্যাশা করে নি। এমন একটা প্রত্যাশা করবার চিন্তার কোনো অস্তিত্বই থাকে না। নিতান্তই স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে তিনি এই টাকা দান করতে উদ্যত হয়েছেন। ভাগলপুর থেকে এত টাকা নিয়ে যাবেন, কিছু দিয়ে যাবেন না?—একমাত্র এই মনোভাব।

ললিতবাবুকে ডেকে চিত্তরঞ্জন বললেন, "উপেনবাবু যখন যাবেন, সাড়ে আট শো টাকার নোট ওঁকে দেবেন। লিখে রাখবেন ভাগলপুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে দেবার টাকা।"

ললিতবাবু প্রস্থান করলে চিত্তরঞ্জন আমাকে বললেন, "আপনার সুবিধামতো, টাকগুলো দিয়ে দেবেন।"

বললাম, "কাল-পরশুর মধ্যেই যাকে যা দেবার দিয়ে, রসিদগুলো আপনার কাছে পাঠিয়ে দোব।"

চিত্তরঞ্জন বললেন, "আমাকে পাঠাবার দরকার নেই, আপনার কাছে রেখে দিলেই হবে।"

এর পর চিত্তরঞ্জন আমার নিকট যে প্রস্তাব করলেন, তা শুনে আমি তো অবাক! বললেন, "আপনি কলকাতায় চলুন উপেনবাবু, আপনি কলকাতায় গেলে আমি খুব খুশি হই।"

বললাম, "এখানকার পাট তুলে দিয়ে?"

বললেন, "তা তো নিশ্চয়ই। সেখানে আলিপুরে ওকালতি করবেন। উপস্থিত আপনার কত হ'লে চলবে? ধরুন, মাসিক তিন শো টাকা?"

আমি তখন চিন্তার পাখায় ভর দিয়ে আকাশ-পাতাল উড়ে বেড়াচ্ছি। এ কথা নিশ্চয় জানতাম, আলিপুরে ওকালতিতে যোগ

দিলে আসে তিন শো এক টাকা হবে, তবু দু শো নিরেনব্বই টাকা হবে না।" বললাম, "তিন শো টাকায় নিশ্চয়ই চলবে।"

প্রসন্নমুখে চিত্তরঞ্জন বললেন, "তবে আর কথা নেই, মনঃস্থির ক'রে ফেলুন।"

মনঃস্থির করলাম, ভাগলপুর ছেড়ে না যাবার। অবশ্য আমার মনের দ্বারা করি নি, করেছিলাম দাদাদের মতের দ্বারা।

কয়েক বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকালে চিত্তরঞ্জন আবার একবার আমাকে ডাক দিলেন,—অনেক দিন তো ওকালতি করলেন, এবার ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কলকাতায় চ'লে আসুন,—আর্থিক অসুবিধা হবে না।

তখন কলিকাতা কর্পোরেশনে চিত্তরঞ্জনের প্রচণ্ড প্রতাপ। বুঝতে বাকি রইল না, কলিকাতায় পৌঁছলে দশ-পনেরো দিনের মধ্যে মোটা মাইনের নির্ঘাত একটা চাকরি। কিন্তু সেবারও এলাম না।

আমরা বিবেচনাশীল মানুষ, অগ্র-পশ্চাৎ খতিয়ে না দেখে আমরা অগ্রসর হই না, 'সহসা কোনো কাজ ক'রো না'—এই হচ্ছে আমাদের প্রজ্ঞার উপদেশ।

এক শ্রেণীর উৎসাহশীল লোক আছে যারা বেশি ভাবনা-চিন্তা না ক'রে এগিয়ে গিয়ে—হয় করে, নয় মরে। তাদের বাণী হচ্ছে,—

Ours is not to reason why,
Ours is but to do or die.

চিত্তরঞ্জন ছিলেন 'do or die'-শ্রেণীর মানুষ, আমরা 'reason why'-শ্রেণীর। প্রাজ্ঞতার জোরে আমরা হয়তো বেঁচে থাকি, কিন্তু 'do or die'-শ্রেণীর পশ্চাতে।

আমার নিজের বিষয়ে এ কথা কিন্তু ষোল-আনা খাটে না 'Do

or die'-শ্রেণীর মানুষ নিতান্তই যদি না হই, 'reason why'-শ্রেণীরও ঠিক নই। প্রাজ্ঞ তো আমাকে নিশ্চয়ই বলা চলে না, বিবেচনাশীল বললেও বোধ করি ভুল বলাই হয়। জীবনে একাধিক বার বেপরোয়াত্বের পরিচয় দিয়েছি। সুনিশ্চিত তটভূমি হতে স্ত্রীপুত্রকন্যা-সমন্বিত নাতিক্ষুদ্র সংসার নিয়ে অজানা সলিলের বিচিত্রা স্রোতস্বিনীতে নৌকা ভাসিয়ে একদিন বেপরোয়াত্বের যে পরিচয় দিয়েছিলাম, তার কাহিনী আজ মুলতুবি রইল।

দুটি বৃহৎ মকদ্দমায় ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের সহিত আমার কাজ করবার সুযোগ হয়েছিল ;—প্রথমত লছমীপুর মামলায় চিত্তরঞ্জনের সহিত একই পক্ষে, এবং দ্বিতীয়ত মহেশপুর মকদ্দমায় বিপক্ষে।

মহেশপুর মকদ্দমায় বাদী ছিলেন কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ সিং, কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ সিং প্রভৃতি মহেশপুরের রাণী রাধোপিয়ারীর চার-পাঁচজন পুত্র ; এবং বিবাদীদের মধ্যে প্রথম পক্ষের বিবাদী ছিলেন ভাগলপুরের সুপ্রসিদ্ধ ধনী ও জমিদার সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ এবং দ্বিতীয় পক্ষের স্বয়ং রাণী রাধোপিয়ারী।

পূর্বতন এক বন্ধকী মকদ্দমায় আলোচ্য মামলার বিবাদী সৌরীন্দ্র-মোহন সিংহ প্রায় সমগ্র মহেশপুর এস্টেট জড়িত ক'রে রাণী রাধোপিয়ারীর বিরুদ্ধে এক মর্‌গেজ ডিক্রি হাসিল করেছিলেন। নানা অজুহাতে উক্ত মর্‌গেজ ডিক্রিকে অবৈধ প্রতিপন্ন ক'রে নাকচ করা এবং তৎপরে যথোচিত হিসাবের দ্বারা নির্ণীত অর্থের পরিশোধে সম্পত্তিকে দায়মুক্ত করা বর্তমান মকদ্দমার উদ্দেশ্য।

পূর্বতন মামলায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল নরেশচন্দ্র সিংহ সৌরীন্দ্রমোহনের পক্ষে উকিল হিসাবে কাজ করেছিলেন। হাইকোর্টের সুদীর্ঘ পূজার ছুটির অবকাশে শিমুলতলায় নরেশচন্দ্রের কমিশনে এজাহার চলছিল। বিবাদীপক্ষে প্রধান এজাহার করিয়েছিলেন ভাগলপুরের শ্রেষ্ঠ উকিল চন্দ্রশেখর সরকার ; বাদীপক্ষে জেরা করছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ।

শিমুলতলার শ্রেষ্ঠতম অঞ্চলে রিজের উপর কলিকাতার ভূতনাথ

মুখোপাধ্যায়ের মনোরম অট্টালিকায় আমরা চার-পাঁচজন উকিল, সাক্ষী, এজাহারের কমিশনার ও বিবাদী সৌরীন্দ্রমোহনের কয়েকজন কর্মচারী বাস করছিলাম। পনের দিনের জন্ত বাড়িটির ভাড়া হয়েছিল এক শত টাকা। ব্রিজের উপর ভূতনাথবাবুর পাশাপাশি ছুটি বাড়ি ছিল; ছোট বাড়িটি ভাড়া খাটত, এ বাড়িটি মালিকদের ব্যবহারের অপেক্ষায় খালি থাকত। আত্মীয়তার খাতিরে আমি এ বাড়িটির ব্যবস্থা ক'রে দিতে পেরেছিলাম।

মকদ্দমার কাজেই আমরা শিমুলতলায় অবস্থান করছিলাম বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ুপরিবর্তনের অপেক্ষাও অধিক চিত্তাকর্ষক। বায়ুপরিবর্তনের মাশুল লাগে; পথখরচা এবং অপরাপর ব্যবস্থার বাবদে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থদণ্ড দিতে হয়। আমাদের এ বায়ুপরিবর্তনে সে সকল অসুবিধার কণ্টক তো ছিলই না, অধিকন্তু, পরান্নভোজনে দক্ষিণার মতো, একটা মোটা অঙ্কের ফিজের ব্যবস্থাও ছিল।

প্রভাতে শয্যাত্যাগের পর মুখ-হাত ধুয়ে উৎকৃষ্ট চা এবং তৎকালীন খাঁটি ঘৃত ও নির্ভেজাল ময়দার লুচি, বেগুনভাজা ও সন্দেশ ক্ষীরের পেঁড়া সমন্বিত গুরুভার জলযোগের জল-কয়লার দ্বারা দেহ-এঞ্জিনে যথেষ্ট পরিমাণে স্টীম সঞ্চয় ক'রে নিয়ে আমরা দল বেঁধে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে পড়তাম।

তখন নব-আশ্বিনের পূর্ণযৌবন শরৎ কাল। অবশ্য সাঁওতাল পরগনার পার্বত্য পটভূমির মধ্যে 'কাশাংশুকা বিকচপদ্মমনোজ্ঞবক্ত্রা' রূপরম্যা শরৎ-বধূর সাক্ষাৎ লাভ সম্ভব ছিল না, কিন্তু তাই ব'লে নদী-তড়াগবিহীনা পর্বতদুহিতার জন্ত শরৎ ঋতুর কোনো ব্যবস্থাই কি নেই? বাংলা দেশের প্রসাধকেরা বঙ্গললনাদের শাড়ি ও জামা জোগায় ব'লে কি

কাশ্মীরের প্রসাধকেরা কাশ্মীর-জলনাদের শালোয়ার ও আওরাখা জোগায় না? সুতরাং শিমুলতলায় পার্বত্য পথে চলতে চলতেও আমরা দেখতাম, আকাশ নির্মল ঘননীল; তার বক্ষে কলধ্বনিতে বলাকার শ্রেণী মালার মতো সারিবদ্ধ হয়ে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্তে উড়ে চলেছে; পথের ধারে ধারে ইতস্তত প্রস্ফুটিত মালতী ফুলের গাছ; সুখস্পর্শ সুশীতল বায়ুর মধ্যে মাঝে মাঝে ফুলের সুগন্ধ ভেসে আসছে।

এই মনোরম পরিবেশের মধ্যে মাইল দেড়েক-দুইয়ের একটা চক্র দিয়ে বেলা আটটা সাড়ে আটটার মধ্যে আমরা বাসায় ফিরে আসতাম। পথশ্রান্তি অপনোদনের জন্য তখন পুনরায় চা-পানের একটা ছোট-খাট পালা চলত। কেউ এক পেয়ালা চা আর খান দুই বিস্কুট খেত, কেউ বা এক পেয়ালা দুধ আর গোটা দুয়েক পেঁড়া। বয়োজ্যেষ্ঠরা দুধটাই অধিক পছন্দ করতেন; আমরা কনিষ্ঠরা দুধ ছাড়া বাকি তিনটেই পছন্দ করতাম। চায়ের সঙ্গে খান দুই বিস্কুট নিয়েছি ব'লে পেঁড়াও একটা নোব না, এমন অনুদার রুচি আমাদের জিহ্বা বহন করত না।

শিমুলতলার মাইল তিনেক দূরে একটা গ্রামের মিষ্টান্নের জন্য খ্যাতি ছিল। গ্রামটার নাম মনে আসছে, কিন্তু মুখে আসছে না। সম্ভবত চাকাই কিংবা ঐ ধরনের কিছু হবে। প্রত্যহ প্রত্যূষে বিক্রেতারা তিন মাইল দূরের সেই গ্রাম থেকে ভারে ভারে খাবার নিয়ে এসে বাড়ি বাড়ি যোগান দিত। সন্দেশ পেঁড়া রসোগোল্লা ছানাবড়া— সব রকম মিষ্টান্নই থাকত তাদের ভারে। কিন্তু পেঁড়ার প্রতি আমাদের পক্ষপাত লক্ষ্য ক'রে আমাদের তত্ত্বাবধায়করা বেশি ক'রে পেঁড়াই কিনতেন। কি কারণে তা বলতে পারি নে, বৈদ্যনাথ-শিমুলতলা অঞ্চলের হালুইকররা পেঁড়া প্রস্তুত করবার কাজটা একটু ভাল রকমই বোঝে। ক্ষীরের বিশেষ একটা পাকের কৌশলে পেঁড়ার মধ্যে তারা

যে মৃদু মিষ্ট স্বাদ ও সৌরভ অবতরণ করাতে সমর্থ হয়, অন্য জায়গার পেঁড়ায় তা দুষ্প্রাপ্য। সে যাই হোক, সব টুপিরই মাথা থাকে, আমাদের মধ্যেও ছানাবড়ার খরিদ্দার ছিলেন, যাঁরা পেঁড়ার চেয়ে ছানাবড়া পছন্দ করতেন বেশি। আমি কিন্তু ছিলাম পেঁড়ার অনন্যরুচি ভক্ত; তবে মাঝে মাঝে আমাকে যে এক-আধটা ছানাবড়া খেতেও দেখা যেত, তা নিছক ছানাবড়ার তুলনায় পেঁড়ার উৎকর্ষে বিশ্বাস বজায় রাখবার অনুশীলনে।

প্রাতঃরাশের দ্বিতীয় সংস্করণ শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সংবাদপত্র-পাঠাদি চলত; তৎপরে পূর্ব-প্রদত্ত এজাহার প'ড়ে শুনতে শুনতে, মকদ্দমার কাগজপত্র ওল্টাতে ওল্টাতে, সেইদিনের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিছু সলা-পরামর্শ করতে করতে স্নানের সময় কাছিয়ে আসত।

এজাহার গ্রহণের জন্য কমিশনার নিযুক্ত হয়েছিলেন আলিপুরের উকিল নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। ভদ্রলোক দেখতে যেমন ছিলেন সুশ্রী, পোশাক-পরিচ্ছদ কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনায় তেমনি ছিলেন পরিচ্ছন্ন। আমার তাঁকে ভারি ভাল লাগত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে আমরা উভয়ে পরস্পরের অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিলাম।

বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা থেকে স্নান করতে আরম্ভ করতাম। সুগভীর ইঁদারা হতে সদ্যোত্থিত ঘড়া ঘড়া সুশীতল জলে স্নান করতে করতে আমাদের হাড় পর্যন্ত কনকনিয়ে যেত; এবং সেই কনকনানির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ শরীরের অভ্যন্তরে জ্ব'লে উঠত দুর্দান্ত এক জঠরাগ্নি। চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ সুরচিত খাদ্যের ভূরিভোগের দ্বারা উক্ত অগ্নিদেবতাকে পরিতুষ্ট করার পর আমরা নিজ নিজ শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করতাম। আমাদের শরীরের সাম্প্রতিক ভারবৃদ্ধির সুযোগে মাতা বসুন্ধরা তাঁর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির মাত্রা এমন একটু বাড়িয়ে দিতেন

যে, সে স্নেহের আকর্ষণের ফলে শয্যাবলুণ্ঠিত না হয়ে আমাদের উপায় থাকত না।

বেলা তিনটা থেকে পাঁচটা—দু ঘণ্টা সাক্ষীর এজাহারের সময়। স্থানের প্রাচুর্যবশত এজাহার আমাদের বাসাতেই হ'ত। তিনটার কিছু পূর্বেই সাক্ষী নরেশচন্দ্র এসে হাজির হতেন। বাদীপক্ষ থেকে সাঙ্গোপাঙ্গ সহ চিত্তরঞ্জনের আসতে তিনটা উত্তীর্ণ হয়ে যেত। তারপর ক্ষণকাল গল্পগুজব হাস্য-পরিহাসে অতিবাহিত ক'রে সাক্ষীর জেরা আরম্ভ হ'ত। পাঁচটা বাজতে না বাজতে চিত্তরঞ্জন সদলবলে উঠে প'ড়ে প্রস্থান করতেন। তৎপরে চা-পান শেষ ক'রে আমরাও সদলে বৈকালিক ভ্রমণে নির্গত হতাম।

প্রথমেই আমরা যেতাম শিমুলতলার রেল-স্টেশনে। সেই সময়ে কলিকাতাগামী একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসত। শিমুলতলার ন্যায় জনবিরল স্থানে, যেখানে সিনেমা নেই, থিয়েটার নেই, ক্লাব নেই, সভা-সমিতি নেই, মানুষের সাধারণ দৈনন্দিন আগ্রহ জাগাবার ও মেটাবার কোনো আয়োজন নেই, রেল-স্টেশন একটা কম কৌতূহলের এবং আনন্দের স্থান নয়। গভীর আনন্দের সঙ্গে আমরা ট্রেনের আসা-যাওয়া লক্ষ্য করতাম, গভীর কৌতূহলের সঙ্গে আরোহীদের ওঠা-নামা দেখতাম। তা ছাড়া, শিমুলতলা রেল-স্টেশনে এমন বিশেষ এক দর্শনীয় ব্যাপার ছিল যা অন্য কোনো স্টেশনে দুর্লভ। শিমুলতলার পরবর্তী আপ স্টেশন ঝাঝা হতে শিমুলতলা পর্যন্ত চড়াই এত বেশি যে, একখানা সাধারণ দীর্ঘ ট্রেনকেও ঐ পথে শিমুলতলা পর্যন্ত টেনে তোলা একটা মাত্র এঞ্জিনের কাজ নয়; তাই টানার সহিত ঠেলা যোগ করবার জন্যে ঝাঝা স্টেশনে ট্রেনের পিছন দিকে আর একটা শক্তিশালী এঞ্জিন জুড়ে দেওয়া হয়। তৎসত্ত্বেও একটা বিশ্রী রকমের ঘচো-ঘচো শব্দ করতে

করতে অতি মন্থর গতিতে ট্রেন শিমুলতলার দিকে উঠতে থাকে। শিমুলতলায় পৌঁছে এই অতিরিক্ত এঞ্জিনটি গাড়ি থেকে খুলে নেওয়া হয়। এই এঞ্জিন খোলার অতি দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাপারটি আমরা, অন্তত আমি, পরম আগ্রহের সহিত লক্ষ্য করতাম। তা ছাড়া কি আর করা যেতে পারে? যেখানে সার্কাসের ঘোড়া দৌড়ায় না, সেখানে বাঁদর-নাচ দেখেই খুশি থাকতে হয়; যেখানে বাঁদরও নাচে না, সেখানে এঞ্জিন-খোলা দেখা ছাড়া আর উপায় কি?

ট্রেন ছেড়ে গেলে জনবিরল প্ল্যাট্‌ফর্মকে বিরলতর ক'রে আমরা পথে বেরিয়ে পড়তাম। তারপর বেশ খানিকটা ঘুরে-ঘারে বাসায় ফিরে জমিয়ে গল্পের আসরে বসা যেত। এই গল্পের আসরের যৎপরোনাস্তি সুযোগ্য অধিকারী ছিলেন চন্দ্রশেখর সরকার। যে শক্তির জাদু দিয়ে আদালতের এজলাসে কথার পিছনে কথা গেঁথে মায়ার জাল বুনে তিনি হাকিমকে বিমুগ্ধ করতেন, গল্পের আসরেও ঠিক সেই শক্তির প্রয়োগের দ্বারা সামান্য সাধারণ কাহিনীকে অসাধারণ পর্যায়ে নিয়ে যেতেন; আর, অতি সংক্ষিপ্ত কৌতুকের উচ্চাঙ্গ মণি-মাণিক্যের দ্বারা সেই কাহিনীর অবয়ব খচিত করতেন। বাচন-শিল্পে চন্দ্রশেখরবাবু উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন।

চন্দ্রশেখরবাবুর পরই ভাল গল্প করতে পারতেন আমার সেজদাদা নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুইজনেই পাল্লা দিয়ে আসর জমিয়ে রাখতেন, তৃতীয় কোনো ব্যক্তির বিশেষ কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হ'ত না।

গল্প চলতে চলতেই নৈশ আহারের ডাক পড়ত। গোটা কয়েক সিঁড়ি ভেঙে পাহাড়ে একটু নিম্নদেশে পাকশালা। তার সম্মুখের বদ্ধ দালানে উপস্থিত হয়ে সার বেঁধে আমরা খেতে বসতাম। কোনো কোনো দিন

বৈঠকখানার গল্পের মধ্যে উঠে প'ড়ে তার জের টেনে আনতাম আমরা ভোজন-কক্ষে। আহার-কার্য্যের মধ্যে শেষ হ'ত তার উপসংহারভাগ।

রাত্রে আমাদের আহার-কক্ষের ছাতের উপর থেকে গোটা-দুই কেরোসিনের আলো ঝুলত, আর হিনৃকৃসের অতিকায় একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন মেঝের উপর একদিকে বসানো থাকত। সে সময়ে বাড়ি বাড়ি যে আকারের হ্যারিকেন লণ্ঠন সাধারণত দেখা যেত, এ লণ্ঠনটি আকারে তার চতুর্গুণ তো হবেই, যদি না আরও কিছু বেশি হয়। আমার এত দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অত বড় হ্যারিকেন মাত্র দুবার দেখেছি;—একবার শিমুলতলায় ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়ে গৃহে, আর আর-একবার পূর্ণিয়ার পথে সকরি স্টীমার ঘাটে।

রাত্রে আহারের সঙ্গে গল্প চলছিল। কথার মধ্যে এক সময়ে চন্দ্রবাবু বললেন, "শিমুলতলা যে স্বাস্থ্যকর জায়গা, সে কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

কয়েক দিন থেকে চন্দ্রশেখরবাবু শিমুলতলায় একটু পরিচ্ছন্ন অঞ্চলে বিঘা দুই-আড়াই জমি কেনার চেষ্টায় আছেন। দালাল আসা-যাওয়া করছে, জমিও এক-আধটা দেখাশুনো চলছে। আমরা মনে করলাম, জমি কেনবার বিষয়ে মনটা পাকাপাকি প্রস্তুত ক'রে নেবার অভিপ্রায়ে আমাদের দ্বারা শিমুলতলার স্বাস্থ্যকরতার কথা যাচাই ক'রে নিতে চান।

সেজদাদা বললেন, "না, সত্যিই সে কথার অস্বীকার করবার উপায় নেই। মাত্র পাঁচ-সাত দিন আমরা এসেছি, এরই মধ্যে সকলের দেহেই একটু চেকনাই দেখা দিয়াছে;—এমন কি আপনার দেহেও।"

গম্ভীরমুখে চন্দ্রবাবু বললেন, "তা ছাড়া, জল-বায়ুর গুণে লণ্ঠনটা পর্যন্ত কি রকম মোটা হয়েছে দেখুন।" ব'লে সেই অতিকায় লণ্ঠনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করলেন।

চন্দ্রশেখরবাবুর অপরূপ বলবার ভঙ্গীতে তাকিয়ে দেখি, বড়লোকের বাড়ির গৃহিণীর মতো অতিস্ফীত দেহ বাগিয়ে লণ্ঠনটা যেন অপ্রতিভ-স্মিত মুখে ব'সে রয়েছে। সমবেত কণ্ঠের একটা প্রচণ্ড হাস্যে শিমুলতলার সেই নিস্তব্ধ পল্লী চকিত হয়ে উঠল।

লণ্ঠন যদি সত্যিই গৃহিণী হ'ত, তা হ'লে এই অট্টহাস্য শুনে লজ্জায় ধীরে ধীরে উঠে প'ড়ে মুখে কাপড় দিয়ে রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ত।

এই রকম আচমকা আলগা অথচ সংযত কৌতুকের অবতারণা করতে চন্দ্রবাবু কোনও আয়াস বোধ করতেন না।

এজাহারের দৈনিক পর্ব শেষ হওয়ার পর একদিন আমরা দল বেঁধে যথারীতি স্টেশনে বেড়াতে গিয়েছি। টিকিট কাটার ঘণ্টা অনেকক্ষণ প'ড়ে গেছে। একে একে যাত্রীরা এসে টিকিট কেটে প্ল্যাট্‌ফর্মে ভিড় জমাচ্ছে। ডিস্ট্যাণ্ট্‌ সিগ্‌নাল প'ড়ে গেছে, হোম সিগ্‌নাল তখনও পড়তে বাকি,—এমন সময়ে কুলির মাথায় স্যুট্‌কেস ও হোল্ডল চাপিয়ে হস্তদন্ত হয়ে শৈলেন পালিত প্ল্যাট্‌ফর্মে প্রবেশ করলেন।

শৈলেন পালিত কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাটর্নি,—বাদীপক্ষে চিত্তরঞ্জনের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট হিসাবে কাজ করছেন। লছমীপুর মামলাতেও ইনি চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে প্রতিবাদী রাণী কুসুমকুমারীর পক্ষে কাজ করেছিলেন।

আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে যাওয়ায় মৃদু হেসে মাথা নেড়ে বোধ হয় তিনি স'রে পড়বার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু সৌরীন্দ্রমোহনের ল-অফিসার উকিল ইন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন, "এ কি শৈলেনবাবু! জিনিসপত্র নিয়ে চললেন কোথায়?"

অগত্যা দাঁড়াতেই হ'ল,—স্মিতমুখে শৈলেনবাবু বললেন, "কলকাতায়।"

বিস্মিত কণ্ঠে ইন্দ্রবাবু বললেন, "কলকাতায়? হঠাৎ?"

উত্তর দেওয়ায় বোধ হয় কিছু অসুবিধা ছিল, স্মিতমুখে শৈলেনবাবু চুপ ক'রে রইলেন।

ইন্দ্রবাবু বললেন, "একটু আগে অতক্ষণ একসঙ্গে ছিলাম, কই, তখন তো কিছু বললেন না?"

হাসিমুখে শৈলেনবাবু বললেন, "না, তা বলা হয় নি।"

গভীর অভিনিবেশ সহকারে চন্দ্রবাবু এতক্ষণ শৈলেনবাবুকে লক্ষ্য করছিলেন; বললেন, "আপনার কলকাতার বাড়ির খবর সব ভাল তো শৈলেনবাবু?"

মাথা নেড়ে শৈলেনবাবু বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ভাল।"

ট্রেন দৃষ্টিপথে আসার ঘণ্টি বেজে উঠল,—তাকিয়ে দেখি, হোম সিগ্‌ন্যাল ডাউন হয়েছে। দেখতে দেখতে ট্রেন প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করলে।

"আচ্ছা, তা হ'লে আসি; পরশুই আবার দেখা হবে।" ব'লে নমস্কার ক'রে ব্যস্ত হয়ে শৈলেনবাবু এগিয়ে গেলেন।

ট্রেন ছেড়ে গেলে চন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বললেন, "না, ব্যাপারটা মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না। নিশ্চয়ই আলিপুরে কোনও mischief (অনিষ্ট) করবার উদ্দেশ্যে ভদ্রলোক কলকাতায় গেলেন।"

মহেশপুরের মামলা আদতে মুর্শিদাবাদে দায়ের হয়েছিল; কিন্তু তথায় বড় বড় উকিল-ব্যারিস্টার নিয়ে গিয়ে তারিখে তারিখে মামলা চালানো অতিশয় ব্যয়সাধ্য এবং অসুবিধাজনক হবে ব'লে উভয় পক্ষের প্রার্থনাক্রমে মকদ্দমা আলিপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। সুতরাং মকদ্দমা সংক্রান্ত যা-কিছু করণীয়, সবই আলিপুরে করতে হচ্ছিল। চন্দ্রবাবুর সন্দেহ, আমাদের অনুপস্থিতিতে আলিপুর কোর্টে দরখাস্তাদির দ্বারা কোন কি সুবিধা আদায় করবার মতলবেই আমাদের অগোচরে

শৈলেনবাবু কলিকাতায় যাবার চেষ্টায় ছিলেন—দৈবক্রমে ধরা প'ড়ে গেছেন।

সেজদাদা বললেন, "কথাবার্তার ভাব দেখে সেই রকমই মনে হচ্ছিল।"

চন্দ্রবাবু বললেন, "দেখলেন না, বাড়িতে কোনও অসুখ-বিসুখ নেই, অথচ কি কারণে কলকাতা যাচ্ছেন, কিছুতে সে কথা ফাঁস করলেন না। পরশু দেখা হবে যখন ব'লে গেলেন, তখন কালই আদালতে যা-কিছু করবার ক'রে সন্ধ্যের গাড়িতে রওনা হবেন।" ক্ষণকাল নিবিষ্টমনে কি চিন্তা ক'রে বললেন, "নাঃ, নিশ্চিন্ত থাকা চলে না। কাল আলিপুরের আদালতে খবরদারির জন্যে আমাদের পক্ষ থেকে কোন উকিলকে হাজির থাকতেই হবে।"

ইন্দ্রবাবু বললেন, "কলকাতায় আর্জেণ্ট টেলিগ্রাম করব না-কি?"

মাথা নেড়ে চন্দ্রবাবু বললেন, "আজকালকার দিনে টেলিগ্রামের কোনও নিশ্চয়তা নেই। তা ছাড়া, আমরা যে পিটিশনটা তোয়ের ক'রে রেখেছি, সেটার বিষয়েও মিস্টার চক্রবর্তীর (ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী) সঙ্গে অবিলম্বে পরামর্শ করা দরকার। সুতরাং আমাদের মধ্যে কাউকে শৈলেনবাবুকে অনুসরণ করতেই হচ্ছে। আপনি গেলে এখানকার কাজে অসুবিধা হবে।" আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, "উপেন্দ্র, আমাদের মধ্যে তুমিই সর্বকনিষ্ঠ—তুমি যেতে পারবে তো?"

যাবার মতো শরীরের অবস্থা সেদিন একেবারেই উপযুক্ত ছিল না। কিছু পূর্ব থেকে সেই প্রচণ্ড নিউর‍্যাল্‌জিক মাথা-ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম, যা আমার তদানীন্তন আট-দশ বৎসরের জীবনকে বিড়ম্বিত ক'রে রেখেছিল। অথচ সেনাপতির কথা পালন করতেই হবে; বললাম, "পারব।"

কিন্তু তখন একমাত্র পাঞ্জাব মেল ছাড়া এমন আর কোন ট্রেন ছিল না, যাতে কলিকাতা রওনা হয়ে আদালতের প্রথম ঘণ্টায় আলিপুরে হাজির হওয়া চলে। সুতরাং পাঞ্জাব মেলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। টাইম-টেবলে পাঞ্জাব মেলের শিমুলতলায় থামবার ব্যবস্থা নেই। পিছনের এঞ্জিন খুলে দেবার জন্য রাত্রি বারোটার সময়ে পাঞ্জাব মেল যখন আধ মিনিটকাল শিমুলতলায় দাঁড়ায়, তখন বুকিং অফিস বন্ধ, প্ল্যাট্‌ফর্ম জনহীন অন্ধকার। স্টেশন-মাস্টার এবং অন্যান্য কর্মচারীগণ তখন কোয়ার্টার্সে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন। সেই সময়ে আমাকে চোরের মতো কতকটা বে-আইনীভাবে পাঞ্জাব মেলে উঠে পড়তে হবে।

ইন্দ্রবাবু সে কার্যের ব্যবস্থা করলেন। নরেশচন্দ্র সিংহ শিমুলতলার সম্রান্ত ব্যক্তি, স্টেশন-মাস্টারের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম। তাঁর দ্বারা ইন্দ্রবাবুও স্টেশন-মাস্টারের সহিত পরিচিত হয়েছিলেন। বুকিং অফিস তখনও বন্ধ হয় নি, আমার জন্য হাওড়ার একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনা হ'ল। স্টেশন-মাস্টার আমাকে বললেন, "কুলির মাথায় জিনিস চাপিয়ে তৈরি থাকবেন, ট্রেন থামা মাত্র বাছবিচার না ক'রে সামনের গাড়িতে উঠে পড়বেন, তা সে যে ক্লাসই হোক না কেন। তারপর মধুপুরে গিয়ে সুবিধামতো জায়গা দেখে নেবেন।"

যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে পড়ছিল; বললাম, "যে আজ্ঞে।"

তখন কি জানি, যে পাঞ্জাব মেলে অমন কৌশল ক'রে ডাকাতের মতো আমাকে উঠতে হবে, তারই গুলদেশে পৌঁছে রক্তাক্ত হবার ব্যবস্থা আমার সেদিনকার অদৃষ্টলিপিতে লিখিত আছে!

সেই কাহিনীটা এবার বলি।

সে দিন আর স্টেশন থেকে বেরিয়ে যথারীতি ঘুরে ফিরে গৃহে প্রত্যাবর্তনের প্রবৃত্তি উদ্বিগ্ন মনের মধ্যে জাগ্রত হতে পারলে না; টিকিট কেনা হয়ে গেলেই বাসায় ফেরবার জন্য আমরা ব্যস্ত হলাম। আমি, গৃহে পৌছে সম্ভব হ'লে খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়ে মাথার যন্ত্রণা যৎসামান্য কমিয়ে নেওয়ার আশায়—আর বাকি সকলে সলা-পরামর্শ করবার আর চিঠিপত্র লেখবার জন্য যথেষ্ট সময় যাতে হাতে থাকে সেই উদ্দেশ্যে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে আমরা নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পূর্বে স্টেশন-মাস্টার আর একবার আমাকে বিশেষভাবে সতর্ক ক'রে দিলেন, "দেখবেন মশায়, আমরা তো সব ব্যবস্থা ক'রে দিলাম, আপনি যেন তার সুযোগ নিতে কসুর করবেন না—"

আরও কিছু বলবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু একটু রাগ হ'ল। এমনই দুরূহ কোন্ কাজ রে বাপু, যে, কথাটা একেবারে মুখস্থ করিয়ে তবে ছাড়তে হবে? না হয় খুশি হবার কারণ একটু ঘনই হয়েছে, কিন্তু তাই ব'লে তার শোধটা যে আমারই ওপর তুলতে হবে, তার কি মানে আছে? মালিকের প্রতিভূ ইন্দ্রবাবুও তো রয়েছেন!

ভদ্রলোককে আর কোনও কথা বলতে না দিয়ে বোধ করি ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বললাম, "দেখুন মাস্টার মশায়, টিকিট কিনিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দেবার কাজ চিরকালই আপনারা ক'রে আসছেন, আর আমরাও সে ব্যবস্থার সুযোগ নিতে কোনদিন কসুর করি নি। আজই বা আপনি অত চিন্তিত হচ্ছেন কেন? দেখবেন আজ আমার দ্বারা কোনো কসুরই হবে না।"

আমার কথা শুনে, বোধ করি আমার কথার ভঙ্গীর মধ্যে শ্লেষের একটু স্পর্শ অনুভব করার কৌতুকে—আমাদের দলের মধ্যে দুই-একজন হেসে উঠলেন। এই হাসির দ্বারা অধিকতর বিচলিত হয়ে স্টেশন-মাস্টার বললেন, "না না, ভুল করছেন মশায়, চিরকালের ব্যবস্থার সঙ্গে আজকের ব্যবস্থার কিছু ফারাক আছে। চিরকাল ট্রেনের সময়ে প্ল্যাটফর্মে আলো পেয়েছেন, কুলি পেয়েছেন, ভিড়-ভাড় পেয়েছেন, প্যাসেঞ্জারের ওঠা-নামা পেয়েছেন;—আজ সে সব কিছু তো পাবেনই না, অধিকন্তু কখন যে ট্রেন থামল, আর কখন যে আবার চলতে আরম্ভ করল, ভাল ক'রে তার ঠাহরও পাবেন না।"

যন্ত্রণায় তর্ক করতে ভাল লাগছিল না; বললাম, "ধন্যবাদ মাস্টার মশায়। কিন্তু আপনি চিন্তিত হবেন না। ঐ অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ঠিক উঠে পড়ব। চলন্ত ট্রামে ওঠা-নামা করা তো খানিকটে অভ্যেস আছে, চলন্ত ট্রেনে উঠতে খুব বেশি অসুবিধে হবে না।"

খানিকটা আনুগত্য দেখানোতে একটু খুশি হয়ে স্টেশন-মাস্টার বললেন, "না, তা হবে না। জিনিসপত্রের সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়বেন।"

বললাম, "ব্যাপারটা আমি কিন্তু তার চেয়েও সহজ করব।"

ঔৎসুক্যসহকারে স্টেশন-মাস্টার বললেন, "কি রকম শুনি?"

বললাম, "ট্রেন থামতে-না-থামতে নিজে উঠে পড়ব, আর চলতে-না-চলতে কুলির মাথা থেকে জিনিসপত্র তুলে নোব। একান্ত না যদি তুলতে পারি, বাসা থেকে যে লোক জিনিস বহন ক'রে আনবে, সেই আবার বাসায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। জিনিস হয়তো প'ড়ে থাকবে, কিন্তু আমি ঠিক চ'লে যাব। তা ছাড়া মাস্টার মশায়, কামরায় প্রবেশ করবার আমার পক্ষে দুটো পথ আছে—দরজা আর জানলা। দ্বিতীয়

পথ জানলা দিয়ে আমি ঠিক মাথা গলিয়ে ঢুকব, কিন্তু সে পথে মাল গলানো হয়তো তত সুবিধের হবে না।"

আমার কথা শুনে ঈষৎ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে স্টেশন-মাস্টার বললেন, "দুটো পথের কথা বলছেন! আপনার পক্ষেও হয়তো একটা পথও খোলা না থাকতে পারে। রাত বারোটার সময়ে অনেক প্যাসেঞ্জার দরজা-জানলা 'লক' ক'রে দিয়ে ঘুমিয়ে থাকে।"

বললাম, "তা থাকে থাকবে। সহকারী ফুট্‌বোর্ড তো কেউ আটকাবে না,—শিমুলতলা থেকে মধুপুর ফুট্‌বোর্ডে দাঁড়িয়ে চ'লে যাব।"

বিস্মিতকণ্ঠে স্টেশন-মাস্টার বললেন, "ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে চ'লে যাবেন?"

"না গিয়ে উপায় কি বলুন?"

"ট্রেন কিন্তু সময়ে সময়ে ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল বেগে চলবে, হাওয়ার ঝট্‌কা সামলানো কঠিন কাজ হবে মশায়।"

বললাম, "তার চেয়ে কঠিন কাজ হবে হাওয়ার ঝট্‌কা সামলাতে না পেরে প'ড়ে যাওয়া।"

একটা উচ্চহাস্য উত্থিত হ'ল।

স্টেশন-মাস্টারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "আপনি চিন্তিত হবেন না মাস্টার মশায়, ও সব কোনো বিপদই হবে না;—জিনিসপত্র নিয়ে কামরার ভিতরে আমি ঠিক ঢুকতে পারব।"

"কিন্তু যে কামরা আপনার সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াবে, সোজা সেই কামরায় ঢুকবেন।" ব'লে স্টেশন-মাস্টার বুকিং অফিসের দিকে অগ্রসর হলেন।

বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সোজা সেই কামরাতেই ঢুকব—বাছ-বিচার করব না।"

"একেবারে না।"

বাসায় ফিরে নিদ্রার জন্য খানিকটা ধ্বস্তাধ্বস্তি করলাম, কিন্তু কোনো ফল হ'ল না। প্রতিদিন এমনি সময়ে যে নাছোড়বন্দ নিদ্রা দুই চক্ষুর উপর তার জাদুস্পর্শ বুলিয়ে চন্দ্রশেখরবাবুর ওরূপ মনোজ্ঞ গল্পের আসরকে অস্পষ্ট ও খণ্ডিত করতে থাকে, আজ বহু সাধনা-আরাধনা সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্যও তার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। শুধু ললাটের এক দিকের চামড়া নিরবসর মেন্থল ঘর্ষণের তাড়সে উত্তরোত্তর আরক্তকর হয়ে উঠতে লাগল; আর 'স্টারনস্ হেডেক্ কিওর' নামে তখনকার দিনের শিরঃপীড়ার এক অত্যুগ্র ওষুধের শেষ নিরাপদ মাত্রাও নিষ্ফলতার সলিলে হাল ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বসল।

এই ভীষণ স্নায়ুশূল রোগ আমার জীবনের এক তীব্র অভিশাপ-রূপে দেখা দিয়েছিল। যখন আমি ইংরেজী স্কুলের উচ্চশ্রেণীতে অধ্যয়ন করি, তখন এর সূত্রপাত, তারপর বিশ-বাইশ বৎসর ধ'রে আমার দেহ এবং মনকে শোচনীয়ভাবে বিধ্বস্ত ক'রে নিরস্ত হয়। খর রৌদ্র-দাহ নিবৃত্ত একদিন হ'ল বটে, কিন্তু নিবৃত্ত যখন হ'ল, তখন গাছের পাতা ধরাবার, ফুল ফোটাবার, কুঁড়ি ফেলবার সবুজ সতেজ আদিম যুগ অতীত হয়েছে। প্রকৃতির জীবনে বসন্ত বারংবার আসে, মানুষের জীবনে আসে একবার মাত্রই।

আমার শিরঃপীড়ার আক্রমণের বৎসর দুই পরে একজন বিচক্ষ চিকিৎসক দাদাকে বলেছিলেন, "লালমোহনবাবু, আপনার ভাই লেখাপড়া করেন—তা-ই যদি আপনাদের অভিপ্রেত হয়, তা হ'লে

বৎসর তিন-চারের জন্তে ওঁর লেখাপড়া একেবারে বন্ধ ক'রে দিন।" কথাটা সেদিন আমাদের কারও তেমন ভাল লাগে নি। আমরা জমিদার নই, ব্যবসাদার নাই; লেখাপড়া ক'রে আমাদের অন্নবস্ত্র সমস্তার সমাধান করতে হয়; সেই লেখাপড়ার দ্বারে তিন-চার বৎসরের জন্ত অর্গল লাগাতে হবে, এ কোন্ কাজের কথা? অর্গল লাগানো হ'ল না, কিন্তু ডাক্তারের কথা একেবারে অমান্ত করাও গেল না, দ্বারটা ভেজিয়ে দেওয়া হ'ল। তার ফলে বিদ্যার পথ ব্যাহত রইল, কিন্তু ব্যাধির পথ খোলাই রইল। পরে বহুবার মনে হয়েছিল, রোগ এবং পড়ার মধ্যে রফা করবার মতো একটা-কিছুর চেষ্টা না ক'রে সোজাসুজি অর্গল লাগালেই বোধ হয় মোটের উপর ভাল ছিল।

কিন্তু কি হবে আর অতীত দিনের সে-সব ভুলভ্রান্তির অনাবশ্যক আলোচনায়,—যে কথা বলছিলাম, তাই বলি।

ইত্যবসরে বার তিন-চার বমি হওয়ার ফলে রোগটা বেশ খানিকটা শান্ত হয়ে এসেছে। অর্থাৎ, আসল ঝড়টা ব'য়ে গেছে, তখন চলেছে জোর হাওয়ার জের।

এক সময়ে সেজদাদা বলেন, "কষ্ট যদি হয় তো তুমি না-ই গেলে,—অন্য ব্যবস্থা করি।"

এ প্রস্তাবে রাজী হলাম না; বললাম, "আপনি তো জানেন রোগটা মারাত্মক কিছু নয়: তা ছাড়া বমি যখন কয়েকবার হয়ে গেছে, এবার অল্পে অল্পে সেরে যাবে ব'লেই মনে হয়।"

এগারোটার খানিকটা পরেই আমার স্যুট্‌কেস ও বেডিং নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। চন্দ্রশেখরবাবু ও ইন্দ্রবাবু যে চিঠিপত্র ও কাগজ দিয়েছিলেন,

তা আমার পকেটে নিয়েছি। স্যুটকেসে ওগুলো নিলে দৈবাৎ যদি তাড়াতাড়িতে স্যুটকেস তুলতে না পারি তা হ'লে ব্যাপারটা হবে,—ছিপ পিছনে ফেলে টোপ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার মতো।

ভেবেছিলাম, বাইরের শীতল বায়ু লেগে খানিকটা আরাম পাওয়া যাবে, কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। হঠাৎ ঠাণ্ডার একটা তীব্র স্পর্শ লেগে মাথাটা পুনরায় দপ্‌দপিয়ে উঠল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র বিবমিষায় সমস্ত অন্তরটা যেন পাক দিতে লাগল। দ্রুতপদে স্টেশনে উপস্থিত হয়ে ট্রেনে আরোহণের ব্যাপারে মনোযোগী হলাম।

প্ল্যাট্‌ফর্মের এক স্থানে চার-পাঁচজন কুলি গভীরভাবে নিদ্রা যাচ্ছিল। আমার সঙ্গে চাকর এসেছিল, সুতরাং সাধারণ অবস্থায় কুলির কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু আজকের বিশেষ অবস্থার অনুরোধে একজন কুলি নিযুক্ত করাই কর্তব্য মনে করলাম। যে নদীর যে মাঝি, তার হাতেই বৈঠা দেওয়া উচিত। সমান-সমান প্ল্যাট্‌ফর্ম হ'লেও কথা ছিল; নিচু প্ল্যাটফর্ম থেকে আরোহী সংখ্যার অনুমান ক'রে মোট মাথায় নিয়ে কামরায় প্রবেশ করা গোলা লোকের কর্ম নয়। 'কুলি, 'কুলি' ব'লে কয়েকবার ডাক দিলাম।

ডাক শুনে একজন কুলি ধড়মড়িয়ে উঠে ব'সে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "কি চাই বাবু? কলকাতা যাবেন?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"পঞ্জাব মিলে?"

"হ্যাঁ।"

"আপনার সামান কোথায়?"

অদূরে আমার ভৃত্য স্যুটকেস ও বেডিং নিয়ে ব'সে ছিল, তার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে বললাম, "ঐ যে আমার সামান"

মাল দেখে ঘাড় নেড়ে কুলি বললে, "ঠিক আছে, চড়িয়ে দোব কিন্তু ওখানে মাল রেখেছেন কেন? ওখানে তো ডাকঘর-কামরা খাড়া হয়।"

বললাম, "সে সব জানি নে ব'লেই তো তোমাকে বাহাল করা।"

কুলি বললে, "ঠিক আছে,—কিন্তু পুরা ষোল আনা বকশিশ লাগবে বাবু, এক পয়সা কম হবে না। আর টাকাটা হাতের মধ্যে তৈয়ার রাখবেন, বেগ থেকে বার করবার সময় মিলবে না।"

যদিও সাধারণ পাওনার ঠিক ষোলগুণ বেশি চাইছে, তথাপি অবস্থার বিবেচনায় এমন কিছু জুলুমবাজি ব'লে মনে হ'ল না। বললাম "তথাস্তু। কিন্তু ভাল জায়গা ক'রে দিতে হবে।"

কুলি বললে, "আমি তো আপনার সামান গাড়িতে চড়িয়ে দোব— তারপর ভাল জায়গা আপনি ক'রে নেবেন বাবু। জায়গা করবার টাইম তো আমার মিলবে না।"

ন্যায়সঙ্গত কথা। আপত্তি করবার কিছু নেই।

আমার জিনিস দুটি তুলে নিয়ে এসে নিজের পছন্দমতো স্থানে স্থাপিত ক'রে কুলি বললে, "গাড়ি থামলে আপনি ফওরন উঠে পড়বেন বাবু,— দরবাজা খুলে আপনি ভিতরেই ঢুকলেই আমি আপনার জিনিস নামিয়ে দোব। আর দরবাজা যদি ভিতর থেকে বন্ধ থাকে, মাথা গলিয়ে ঢুকে প'ড়ে ছিট্‌কানি খুলে দেবেন। এক জেনানা কামরা হ'লে উঠবেন না, নইলে যে-কোনো কামরায় উঠে পড়বেন। কোন্ কিলাসের টিকিট আছে আপনার?"

বললাম, "সেকেণ্ড ক্লাসের।"

"ঠিক আছে।"

কুলির কথা থেকে বুঝেছিলাম, রাত বারোটায় পাঞ্জাব মেলে আমিই

তার জীবনের প্রথম আরোহী নই, এমন অসময়ের অতিথির সৎকার-কার্যে সে একেবারে অনভ্যস্ত নয়।

মাথার বেদনার ব্যাপারে তখন জোয়ার-ভাটার কাজ চলছে,—কখনো বেশি, কখনো কম; মোটের উপর কমই। অবস্থার উদ্বেগময়তার জন্য সে বিষয়ে কতকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আমার জিনিস দুটি সামনে রেখে কুলি দুই বাহুর দ্বারা দুই পা আবদ্ধ ক'রে প্রসন্ন চিত্তে উবু হয়ে ব'সে মৃদু মৃদু দোল খাচ্ছে। আজ সে অপ্রত্যাশিতভাবে একটা মোটা উপায়ের সুবিধা করতে পেরেছে। আমার ডাকে ভাগ্যে তারই ঘুম ভেঙেছিল! নইলে সে তো এতক্ষণ অনায়াসে তার অন্য কুলি-সঙ্গীদের মতো এক টাকা অনুপার্জনের দুর্ভাগ্য হতে অপরিজ্ঞাত থাকার নিশ্চিন্ত আরামে ঘুম দিতেও পারত।

প্রতীক্ষ্যমাণ চিত্ত নিয়ে আমি মাঝে মাঝে দৃষ্টিপাত করছিলাম পশ্চিম দিক্‌প্রান্তে; সেই দিকেই আবির্ভাব হবে আমার আশা-আশঙ্কা-উদ্বেগের বস্তু ডাউন পাঞ্জাব মেলের। তখনও অবশ্য কিছু বিলম্ব ছিল, ক্ষণকাল পূর্বে তিনি পূর্ববর্তী আপ স্টেশন ঝাঁঝা ত্যাগ করেছেন। কিন্তু পাঞ্জাব মেলই হোন, আর যা-ই হোন, চড়াই ঠেলতে ঠেলতে সেই তো ঘস্তো-ঘস্তো করতে করতে আসতে হচ্ছে, সুতরাং ব্যস্ত হবার কিছু ছিল না; তবু মাঝে মাঝে সেই দিকেই দৃষ্টি ধাবিত হচ্ছিল। তার মানে, বোঝা যাচ্ছিল, মনের আকাশ একেবারে উদ্বেগশূন্য ছিল না।

কিছুক্ষণ পরে উজ্জ্বল ত্রিনয়ন ধক্‌ধক্ করতে করতে প্রভু পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিলেন। দেখতে দেখতে মহা দাপটের সঙ্গে প্ল্যাট্‌ফর্মে যখন প্রবেশ করলেন, তখন ক্ষণেকের জন্য মনটা একটু বিচলিত হয়ে উঠল। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দুর্বল মনকে তিরস্কৃত ক'রে বললাম, কি আশ্চর্য! একেবারে আনাড়ি মানুষও নই, বাইসিকেল চড়ায় পটু, টেনিস

ক্রিকেট খেলায় সক্ষম, সামান্য দু ধাপ উঠে ট্রেনের কামরায় ঢুকতে পারব না?

দেখতে দেখতে ট্রেন স্থির হয়ে এল। ট্রেন একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত আমি আর অপেক্ষা না ক'রে টপ ক'রে লাফিয়ে উঠে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে কুলির পথ উন্মুক্ত ক'রে দাঁড়ালাম।

কুলি বোধ করি আমার এই নাটকীয় অতি-তৎপরতায় ততটা খুশি হতে পারে নি। মাল নামিয়ে বেঞ্চের তলায় স্থাপন ক'রে বললে, "অত ব্যস্ত হবার প্রয়োজন ছিল না।" প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকের বাঙ্কটা তোলা ছিল, বললে, "ফেলে দোব? এটার ওপর বিছানা পাতবেন?"

তার হাতে টাকাটা দিয়ে বললাম, "সে যা হয় পরে করা যাবে, তুমি এখন নেমে যাও।"

আমাকে একটা সেলাম ক'রে কুলি নেমে গেল। প্ল্যাট্‌ফর্মে তার পা ঠেকবার পূর্বেই ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছিল। মনে মনে নিদ্রিত স্টেশন-মাস্টারের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা ক'রে বললাম, সত্যিই! কখন যে ট্রেন থামে, আর কখন যে আবার ছাড়ে, তার ঠাহরই পাওয়া যায় না মাস্টার মশায়!

পিছন ফিরে কামরার ভিতর তাকিয়ে দেখি, ঐ একটি উঁচু-ক'রে রাখা বাঙ্ক ব্যতীত দুটি বেঞ্চ ও দ্বিতীয় বাঙ্ক অধিকার ক'রে তিনটি ইংরেজ পুরুষ নিদ্রিত। অপর দিকের বেঞ্চে যিনি শয়ান, তাঁর দেহের আড়া, সাজসজ্জা এবং অস্ত্রাদির দাপট দেখে বুঝতে ভুল হয় না, তিনি এক দুর্দান্ত সামরিক পুরুষ। তাঁর সুবিপুল শরীর থেকে যে গভীর নাসিকা-ধ্বনি নির্গত হচ্ছে, তা একমাত্র সিংহনাদই স্মরণ করিয়ে দেয়। আর তারই কোলে মধ্যেকার বেঞ্চ অধিকার ক'রে ব'সে আছেন এক নিরীহ মাড়োয়ারী ভদ্রলোক। নিদ্রিত ব্যাধের নিকটে অবস্থিত ভয়ার্ত

পক্ষীশাবক সহসা পক্ষীমাতার আবির্ভাবে যেমন বিপদ হতে উদ্ধার লাভের উগ্র লালসায় প্রলুব্ধ হয়ে তাকায়, দেখি, ঠিক সেইভাবে তিনি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে।

দেখে করুণা হ'ল না, এমন কি কৌতুকও হ'ল না। একটা অপরিসীম বিরক্তির রসে মনটা তিক্ত হয়ে উঠল।

তখন কপালটার একদিক আবার দপ্‌দপ্ করতে আরম্ভ করেছে।

বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া লেগে মাথার যন্ত্রণাটা উপশমিত যদি হয়, সেই প্রত্যাশায় দুই বাহুর দ্বারা দরজার উপর ভর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দাঁড়ালাম। তখন ট্রেন বোধ হয় ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে চলছিল। ভর্ ভর্ ক'রে এক রাশ উদ্দাম বায়ু মুখ-চোখের উপর দিয়ে বইতে আরম্ভ করলে। সে সময়ে মাথায় একটু বড় ক'রে চুল রাখতাম। উচ্ছল বায়ুর তাড়নায় সুবিন্যস্ত টেরির কঠিন বন্ধন হতে নিমেষের মধ্যে মুক্তিলাভ ক'রে সেই দীর্ঘ কেশরাশি এমন এলোমেলোভাবে উড়তে লাগল যে, তেলে-জলে পাট করা সুদৃঢ় টেরির কোন চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়ার উপায় রইল না।

অনাদরের রসগোল্লা মোটের উপর মিষ্ট লাগলেও তার মধ্যে যেমন একটু তিক্ত আস্বাদের আমেজও পাওয়া যায়, সেই রকম শীতল বায়ু মোটের উপর ভাল লাগলেও একটা অনুগ্র বিবমিষা সমস্ত শরীরকে ঘুলিয়ে তুলছিল। হিসাবমতো কামরায় বসবার জায়গা ছিল না। শয়নের স্থান অবশ্য ছিল বাঙ্কের উপর; কিন্তু সেই নির্বাত প্রদেশের উচ্চতায় অন্তরিত হ'লে পচা সেপ্টেম্বর মাসের গুমটে বাকি রাতটুকু অনিদ্রায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রেই কাটাতে হবে। স্থির করলাম, মধুপুর পর্যন্ত এইভাবে দাঁড়িয়েই যাব; তারপর মধুপুর পৌঁছে কুলি ডেকে জিনিসপত্র নিয়ে অন্য কামরায় সুবিধামতো স্থানের সন্ধান ক'রে নেওয়া যাবে।

বৃহৎ গোত্রের মামলা-মকদ্দমা শুধু আইন-এজাহার-সওয়াল-জবাবের আদালত-এজলাসেই সীমাবদ্ধ থাকে না; তাদের একটা ক'রে

বহির্বিভাগও থাকে, যেখানে সাক্ষী ভাঙানো, সাক্ষী হরণ থেকে আরম্ভ ক'রে নানাপ্রকার গোয়েন্দাগিরির কার্য, মায় শৈলেন পালিতদের পশ্চাদ্ধাবন পর্যন্ত চলে। আজ আমার ক্রিয়াশীলতা সেই বহির্বিভাগের এলাকার মধ্যে দেখা দিয়েছে। মনে মনে সেজন্য অপ্রসন্নই ছিলাম, তার উপর দুরন্ত নিউর‍্যাল্‌জিক বেদনা।

"বাবুজী! বাবুজী!"

পিছন ফিরে দেখি, লোলুপ নেত্রে সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে আছে। আমার বিশ্বাস, তার চক্ষের ঐ লোলুপ ভঙ্গি সাময়িক ক্রিয়ার ফল নয়; ও ভঙ্গি সম্ভবত বিধাতার হাত থেকে সে পাকাপাকিভাবেই নিয়ে এসেছে। অনেক লোকের মুখে দেখা যায় অকারণ হাসি-হাসি ভাব বাসা বেঁধে আছে; রাগারাগি ক'রে থাকলেও তাদের মুখ হাসি-হাসি হয়ে থাকে। এও বোধ করি তেমনিই হবে। বললাম, "কিয়া কহতে হে?" (কি বলছেন?)

"খড়া কেঁও বাবুজী?" যে বাক্সটা তোলা ছিল, আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বললে, "উয়হ ব্যাক্স্ গিরা কর্ বিস্তারা বিছাকে মজেসে শো যাইয়ে।" (বাক্সটা নাবিয়ে বিছানা পেতে আরামে শুয়ে পড়ুন।)

বললাম, "জী নহি, ইয়ে কমরেমে হম নহি রহেঙ্গে। মধুপুর আনেসে দুসরে কমরেমে চল্ দেঙ্গে।" (আজ্ঞে না, এ কামরায় আমি থাকব না, মধুপুর এলে অন্য কামরায় চ'লে যাব।)

আমার কাছে উপযুক্ত টিকিটের অভাব ব'লে ভদ্রলোকের বোধ হয় সন্দেহ হ'ল। কথাটা একটু মোলায়েমভাবে জেনে নেবার অভিপ্রায়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আপকা পাস তো জরুর সিকিন ক্লাসকা টিকস্ হোগা?" (আপনার কাছে তো নিশ্চয়ই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট আছে?)

বললাম, "একটা সবুজ রঙের টিকিট আছে ব'লেই তো জানি।"

প্রসন্নকণ্ঠে ভদ্রলোক বললে, "তব্ তো ঠিক হ্যায়। তব্ কিয়া ফিকির?" (তা হ'লে তো ঠিক আছে। তবে আর চিন্তা কিসের?)

বললাম, "না, সেদিক দিয়ে তেমন চিন্তার কারণ নেই। তবু হাওয়াটা ভাল লেগেছে, দাঁড়িয়ে একটু হাওয়া খাই।" ব'লে মাথাটা বাইরের দিকে আর একটু বাড়িয়ে দিলাম।

তিনজন সাহেবের মধ্যে একমাত্র কালা আদমি হয়ে ভদ্রলোক স্বস্তি-বোধ করছিল না। সিমুলতলা স্টেশনে দোর খুলে আমি মাথা গলাতে আমার মুখ দেখে বিছানার উপর উঠে ব'সে যেরূপ লালসাপূর্ণ চক্ষে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল, তাতে সেই রকমই মনে হওয়ার কথা। আমি যে আর একজন সাহেব হয়ে তিন এবং একের অস্বস্তিকর অনুপাতকে চার এবং একের অধিকতর অস্বস্তিকর অনুপাতে বাড়িয়ে নিয়ে যাই নি, সেজন্য আমার প্রতি বোধ হয় তার অন্তরে কৃতজ্ঞতা জাগ্রত হয়েছিল। হয়তো পূর্ব কোনো স্টেসনে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘ'টে থাকবে। অপর পার্শ্বের বেঞ্চে সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ এবং তদনুরূপ পুষ্ট যে বৃহদায়তন সামরিক কর্মচারী নাসারন্ধ্রে শিঙা বাজিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে, বিচিত্র নয়, সে যদি কামরায় উঠে সশয্যা মাড়োয়ারী ভদ্রলোককে পাশের হাওয়াদার বেঞ্চ থেকে উৎপাটিত ক'রে মধ্যের বেঞ্চে স্থাপিত ক'রে পাশের বেঞ্চে নিজের শয্যা বিস্তার ক'রে থাকে! তখনকার দিনে এমন ঘটনা বিরল হয়তো ছিল, কিন্তু অসম্ভব ছিল না।

সে যাই হোক, বাঙ্কের উপর আস্তানা গাড়া কিছুতেই হচ্ছে না, মধুপুরে অন্য কামরায় ভাগ্যান্বেষণ ক'রে দেখতে হবে।

"বাবুজী"

জ্বালালে! ফিরে দেখি, শোয় নি, ব'সে আছে। আমাকে না শুইয়ে না শোবার মতলব। ঈষৎ বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বললাম, "বলুন।"

"খাড়া হয়ে তকলিফ কেন করছেন? আমার বেঞ্চে এসে বসুন।"

"বেশ আছি আমি। আপনি শুয়ে পড়ুন না।"

"নিন্দ্ এলে তবে তো শুতব? আপনি এসে বসুন, কোনো ফিকির নেই।"

নাছোড়বন্দ লোক। মাথা ধরার ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কষ্টও একটু হচ্ছিল, তবুও বিরক্ত হয়েই বেঞ্চে গিয়ে বসলাম। আমাকে ও এই কামরায় বন্দী না ক'রে ছাড়বে না দেখছি!

"আপনি হাওড়া যাবেন বাবুজী?"

বললাম, "হ্যাঁ, হাওড়া যাব। আপনি কোথা থেকে আসছেন?"

"আমি তো আসছি ফতেহপুর থেকে, লেকিন থাকি আমি পাটনায়। আমি তো হরদম কলকত্তা যানা-আনা করি বাবুজী। মহিনামে পাঁচবার ছওবার জরুর।"

"কি করেন পাটনায়?"

"সামান্য কুছ কারবার আছে বাবুজী। আপনি কি করেন?"

কথাটা পরিষ্কার ক'রে না ভেঙে 'সামান্য কুছ কারবার' বলাতে মনে হ'ল, ভদ্রলোক সোনা-রূপোর কারবারের চেয়ে কম কোন কারবার করেন না। সাবধানী মানুষ, পথে-ঘাটে যার তার কাছে ওসব লোভ-উদ্দীপক কথা উচ্চারিত করছে না। বিশেষত আ একজন অল্পবয়স্ক সাধারণ বাঙালী, আমার মতো আদার ব্যাপারীর সঙ্গে জাহাজের আলোচনায় কোনো ফল নেই। ভদ্রলোক ফতেপুর থেকে হয়তো কিছু সুবিধা দরে সোনা-রূপোর ব্যবস্থা ক'রে চলেছে। আমার কারবারের মূলধন হচ্ছে ওকালতির সনদ,—একখানা কাগজ।

তা ছিনিয়ে নিয়ে সুবিধা করবার কোনও উপায় নেই। বললাম, "আমি ওকালতি করি।"

ভদ্রলোকের মুখে-চক্ষে প্রশংসামিশ্রিত বিস্ময়ের দীপ্তি ফুটে উঠল। "অচ্ছা—! আপনি তো তা হ'লে ইলমদার আদমি বাবুজী। কিন্তু ইলমদার হয়েও আপনি গল্‌তি করেছেন।"

"কি গল্‌তি করেছি? বাঙ্ক নামিয়ে বিস্তারা বিছাই নি?"

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বললে, "বস্‌! এহি গল্‌তি। অব তক্‌ আপনি দশ মিনিট নিন্দ্‌ দিয়ে নিতে পারতেন। আমার বাত শুনুন বাবুজী, সমস্ত গাড়িতে কোনও কামরায় একটি জায়গা খালি নেই।"

"কি ক'রে আপনি তা জানলেন?"

"ঝাঁঝাতে আমি এক কুলিকে দু-আনা পয়সা দিয়ে দরিয়াফৎ (অনুসন্ধান) করিয়েছিলাম, কোনো ডব্বাতে (কামরায়) খালি জগহ আছে কি না! দেশী প্যাসেঞ্জারের কামরায় তুলে দিতে পারলে অলগ্‌ আঠ আনা বকশিশ দোব বলেছিলাম। বিচারা আঠ আনা পয়সার লালচে দো দফে ঘুমে ফিরে দেখলে, কিন্তু জগহ্‌ না থাকলে বিচারা কি করতে পারে বাবুজী?"

বললাম, "এ কামরা ছেড়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন কিসের জন্যে?"

আমার কানের কাছে মুখ এনে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে ভদ্রলোক বললে, "জাত-বারাদারদের সঙ্গে একট্‌ঠা থাকলে আনন্দ্‌ভি পাওয়া যায়, ডরভি কুছ থাকে না। হালমে দিনকাল খারাব আছে বাবুজী।"

লোকটির কাছে মূল্যবান মাল আছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ রইল না। আর কোনো কথা না ব'লে চুপ ক'রে ব'সে আগামী কার্যক্রম চিন্তা করতে লাগলাম। হাওড়া স্টেশন থেকে সোজা ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর গৃহে গিয়ে চিঠিপত্র-কাগজাদি তাঁর জিম্মায়

লাগিয়ে দেওয়া, তারপর আমাদের পক্ষের স্থানীয় উকিলকে খবর দেবার ব্যবস্থা মিস্টার চক্রবর্তী করেন তো খুবই ভাল, অন্যথা তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁকে মিস্টার চক্রবর্তীর গৃহে পাঠিয়ে দিয়ে বাসায় যাওয়া। তারপর দুই-একদিন কলকাতায় অবস্থান ক'রে যথোচিত অনুসন্ধানের দ্বারা শৈলেন পালিতের কলিকাতায় আগমনের রহস্য উদ্ঘাটনের পর কলিকাতা পরিত্যাগ করা।

হঠাৎ ট্রেনখানা গতি হ্রাস করতে করতে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়াল। দুই দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে স্টেশনের কোনও চিহ্ন দেখতে পেলাম না; অমন জায়গায় স্টেশন থাকবার কথাও নয়। চতুর্দিকের তিমিরাবৃত ধরিত্রী নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতায় নিমগ্ন। শুধু দূরে পরিশ্রান্ত এঞ্জিন হতে শোনা যাচ্ছে উপশমিত বাষ্পের একটানা নিশ্বাস-ধ্বনি। প্রগাঢ় নিঃশব্দতা সেই বিশীর্ণ ধ্বনির প্রভাবে প্রগাঢ়তর হয়ে উঠছে।

মিনিটখানেক হয়ে গেল, কিন্তু ট্রেন নড়বার নাম করে না। 'কি ব্যাপার!' ব'লে উঠে গিয়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, ট্রেনের পিছন দিকে জমাট অন্ধকার। সামনের দিকেও তাই, কিন্তু এঞ্জিনের আগে সেই জমাট অন্ধকারের গাত্রে এক রাশ লাল আলোর সমারোহ। কোনটা উচ্চে, কোনটা মধ্যস্থলে, কোনটা লাইনের ওপর নিম্নে;—কয়েকটা দক্ষিণ দিকে, কয়েকটা বামে।

কতকটা নিজেকে সম্বোধন ক'রেই বললাম, "কি হয়েছে এখানে?"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোক বললে, "আপনি জানেন না বাবুজী?"

"কি বলুন তো?" ব'লে বেঞ্চে এসে বসলাম।

ভদ্রলোক বললে, "বন্যার জলে লাইন নষ্ট হয়ে গেছল, এখন মাত্র একটা লাইন কাজ করছে। ওদিক থেকে আপ পাঞ্জাব মেল এসে পাশ করলে ডাউন পাঞ্জাব মেল ছাড়বে।"

ব্যাপারটা খবরের কাগজে পড়েছিলাম, কিন্তু ঠিক খেয়াল ছিল না। বললাম, "কতক্ষণ গাড়ি এখানে দাঁড়াবে ?"

ভদ্রলোক বললে, "আমাদের গাড়ি যদি ঠিক সময়ে এসে থাকে তা হ'লে মিনিট কুড়িক দাঁড়াবে। আর যদি লেট ক'রে এসে থাকে তা হ'লে সেই হিসাবে কম দাঁড়াবে।" এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "কতক্ষণ ব'সে থাকবেন বাবুজী ? আমার বাত শুনুন, বাক্স নামিয়ে শুয়ে পড়ুন। মধুপুরে অন্য কামরার চেষ্টায় গিয়ে হয়তো সে দিকে জগহ্ পাবেন না; তারপর ফিরে এসে দেখবেন, এ কামরার জগহ্ও আর নেই।"

নাঃ! দৈবও দেখছি প্রতিকূল। মাথাটা ছেড়ে এসেছিল। আর, ভয়ার্ত ভদ্রলোকের উপর ধীরে ধীরে একটা কেমন মায়া প'ড়ে গিয়েছিল, উৎকট অস্বস্তির মধ্যে তাকে ত্যাগ ক'রে যেতে মন ঠিক চাচ্ছিল না। তা ছাড়া, তাকেই বা আর কতক্ষণ বিনিদ্র অবস্থায় এমন ক'রে বসিয়ে রাখা যায় ?

বললাম, "আপনার কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিলাম।" ব'লে দাঁড়িয়ে উঠে বাক্সটা নামাতে উদ্যত হলাম।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ উল্লাসের কণ্ঠে ভদ্রলোক বললে, "বাবুজী, আপনাকে সাহায্য করব একটু ?"

মাথা নেড়ে বললাম, "না, না, কিচ্ছু করতে হবে না আপনাকে। দেখুন না, আমি সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি।"

হায়! তখন যদি জানতাম 'সব ঠিক ক'রে নিচ্ছি' দর্পোক্তির অব্যবহিত পশ্চাতে কত কদর্য একটা বেঠিক ব্যাপার আমাকে বিপর্যস্ত ক'রে দেবার জন্যে অপেক্ষা ক'রে ছিল! বাক্সের আংটাটা সরিয়ে বাক্স একটু নামাতেই তলার দিকে সামান্য যে ফাঁক হ'ল, তাই গ'লে

কতকগুলো কাগজপত্র, পড়বি তো পড়্‌, এমনভাবে পড়ল যে, জানলার ফাঁক দিয়ে সোজা মাঠে না নেমে তারা নিরস্ত হ'ল না।

দুই-একটা কাগজ বোধ করি জানলার তলার দিকের কাঠে লেগে বাইরে না প'ড়ে ভিতর দিকে বাঙ্কের তলার বেঞ্চে শয়ান সাহেবের গায়ে পড়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে সাহেব তড়াক ক'রে উঠে ব'সে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে নিয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে রুষ্ট কণ্ঠে বললে, "Hallo, what have you done?" (ওহে! এ তুমি কি করলে?)

আমি বললাম, "Nothing, except bringing down the bunk." (বাঙ্কটা নামানো ছাড়া আর কিছুই করি নি।)

"আর, ঐ মিলিটারি অফিসারের অফিসের জরুরি নথিপত্র (important files) ফেলে দিলে যে?"

বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে বললাম, "এ তুমি অন্যায় কথা বলছ। আমি ফেলি নি।"

"তবে কে ফেলেছে?"

"পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি টেনে নিয়ে গেছে। কেউ যদি তুলে-রাখা বাঙ্কের ফাঁকে অমন অবহেলার সঙ্গে জরুরি অফিস-ফাইল গুঁজে রাখে, তা হ'লে তার জন্যে সে দায়ী, না, দেখতে না পেয়ে শোবার জন্যে যে বাঙ্ক নামাতে যায় সে দায়ী? তুমিই বল তো কি আমার করা উচিত ছিল?"

মাথা নেড়ে সাহেব বললে, "কি তোমার করা উচিত ছিল, তা আমি জানি নে; কিন্তু কি তোমার বর্তমান অবস্থায় করা উচিত তা জানি।"

"কি করা উচিত?"

"হয় গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে কাগজগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসা; নয়, মিলিটারি অফিসারকে জাগিয়ে তুলে এই সব সূক্ষ্ম তর্ক (fine arguments) তার সঙ্গে করা। ট্রেন ছেড়ে যাওয়ার পর সে যখন তোমাকে বলবে, 'আমাকে জাগিয়ে দিলে না কেন? আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত আমি করতাম, নিজে গিয়ে কাগজপত্রগুলো কুড়িয়ে নিয়ে আসতাম।' তার উত্তরে তুমি কি বলবে শুনি?"

তার উত্তরে একেবারে কিছু বলা চলে না যে, তা নয়; কিন্তু সে-সকল অতি-সূক্ষ্ম তর্ক একদম বৃথা হতে থাকবে, ঐ-সব তর্কের প্রত্যুত্তরে সে যদি আমার নাকে মুখে চক্ষে ঘুষি মারতে থাকে।

কুৎসিত সঙ্কট দেখা দিয়েছে!

ঘটনার অভাবনীয় পরিণতিতে দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় আমার মাড়োয়ারী বন্ধু একেবারে মুষড়ে পড়েছিল। অনুতপ্ত কণ্ঠে সে বললে, "বড়া আফৎ হুয়া বাবুজী! কহিয়ে তো কিয়া করনা হায়?" (বড় বিপদ হ'ল বাবুজী! বলুন তো কি করা যায়?)

বুঝতে পারলাম, যে-বৃষভ একবার শিং নেড়ে তেড়ে এসেছিল, আবার তারই লেজ ধ'রে টান দেওয়া হয়েছে।

বললাম, "করনা যো হায় সো হমিকো করনা পড়েগা।" (করবার যা আছে, তা আমাকেই করতে হবে।)

একমাত্র সমবেদনা প্রকাশ করানো ছাড়া এই সঙ্কটের ব্যাপারে ঐ স্থূল অথর্ব মানুষটিকে দিয়ে আর কোনো কাজই করানো চলে না। কাগজপত্র নিয়ে আসবার জন্য গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলে, পরে গাড়িতে ওকে তোলা হবে কাগজ তোলার চেয়ে অনেক কঠিন কাজ।

সাহেব বললে, "Young man, what are *you* afraid about? Just get down, bring the papers up, and cut

the Gordian knot." (যুবা পুরুষ, ভয় পাচ্ছ কিসের? নেমে গিয়ে কাগজগুলো তুলে নিয়ে এসে সঙ্কট মোচন কর।)

অগত্যা!

মনের মধ্যে সাহেবের বিরুদ্ধে একটা প্রখর বিদ্বেষ উদ্ভূত হয়েছিল, কিন্তু তার ঠিক একটা ন্যায়সঙ্গত জোরালো ভিত্তি খুঁজেও পাচ্ছিলাম না। অপর পার্শ্বের বেঞ্চে নিদ্রাগত শ্বেত কুম্ভকর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত করলাম। তার দক্ষিণ বাহুটা আলগাভাবে বেঞ্চের পাশে ঝুলছিল; করতলটা দেখে বুঝতে বাকি রইল না, মুষ্টিতে পরিণত হ'লে আয়তনে সেটা আমার মাথার আধখানার মতো নিশ্চয় হয়।

এদিকে প্রতি মুহূর্তের অপচয়ের সহিত সঙ্কট দুরূহতর হয়ে উঠছে; আপ পাঞ্জাব মেলের পৌঁছবার সময় ক্রমশই নিকটবর্তী হয়ে আসছে। দোর খুলে যতটা সম্ভব ঝুঁকে প'ড়ে দেখলাম, সব কটাই জলজল করছে নিষেধের লাল আলো, সবুজ আলো একটাও নেই। ত্বরিতপদে সিঁড়ির তিন ধাপ নেমে গেলাম। শেষ পাদানি থেকে মৃত্তিকা বেশ খানিকটা নিয়ে,—ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়লাম। আমার বিশ্বাস, স্থান এবং মৃত্তিকার প্রকার ভেদে বিভিন্ন স্থলে খোয়ার উচ্চতা বিভিন্ন থাকে।

বই-খাতাপত্রগুলো কাছাকাছিই ছড়িয়ে প'ড়ে ছিল। তাড়াতাড়ি সেগুলোকে একত্র ক'রে গাড়িতে উঠতে যাব এমন সময়ে দেখি, একটা কাগজ হাওয়ায় লাইনের মধ্যস্থলে উড়ে গিয়ে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে—ঠিক যেন বিদ্রূপের সহিত সকৌতুকে আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে,—আয়, আয়!

কি করা যায় এখন! হয়তো ঐ কাগজটাই সামরিক কর্মচারীর সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কাগজ। হয়তো সামরিক কলা-কৌশলের নানাবিধ

মূল্যবান তথ্যে সে কাগজের অঙ্গ পরিপূর্ণ, হয়তো বা, সে কাগজ সামরিক কর্মচারীর নিজ বিভাগের আয়-ব্যয়ের মূল্যবান খতিয়ান-লিপি।

কিন্তু যত মূল্যবানই হোক না কেন সে কাগজ, প্রাণটাও তো কম মূল্যবান নয়! কাগজের চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়ে ট্রেনের তলায় ঢুকেছি, এমন সময় দৈবক্রমে আপ পাঞ্জাব মেলের লেট থাকার ফলে সবুজ বাতির আহ্বান পেয়ে অকস্মাৎ আমাদের ট্রেন যদি চলতে আরম্ভ করে, তখন দু হাত সজোরে ক্রস-বারের লোহা চেপে ধ'রে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে শুয়ে থেকে দেহের উপর দিয়ে আধখানা পাঞ্জাব মেল চ'লে যাওয়ার দাপট সহ্য ক'রে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বজায় রাখা সম্ভব হবে তো? তা ছাড়া চলন্ত ট্রেনের কোনো একটা নি লৌহখণ্ডের সহিত দেহের যদি সংঘর্ষ বাধে তা হ'লে তো আর কথাই নেই, মুহূর্তের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে পরলোকে উপনীত হতে হবে।

কিন্তু কর্তব্যের মধ্যে এত বড় একটা ফাঁক রেখেই বা কি ক'রে কামরায় গিয়ে ওঠা যায়? আর একবার এঞ্জিনের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, প্রত্যেক সিগ্‌ন্যালই লাল প্রভা ছাড়ছে, সবুজের নাম-গন্ধ কোথাও নেই। মাথা নত ক'রে হাতে-পায়ের ভরে খোয়ার উপর দিয়ে গাড়ি তলায় প্রবেশ করলাম। ভিতরে লোহা-লক্কড়ের কত যে খোঁচা-খুঁচি, কত উৎপাত, বাইরে থেকে তার ধারণা করা সম্ভব নয়। মাথায় লাগে ধাক্কা, কাঁধে লাগে খোঁচা, হাঁটু যায় ছ'ড়ে।

সহৃদয় পাঠক-পঠিকা যত সহানুভূতিশীলই হোন না কেন, আমার তখনকার অবস্থা তাঁদের পক্ষে সঠিক উপলব্ধি করা সম্ভবপর হবে না। চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন; পিঠের উপর সজীব পাঞ্জাব মেল; তার সামনে গমনোৎসুক এঞ্জিন-দানব প্রস্তুতির উৎসাহ নিশ্বাস ছাড়ছে; আগম-নির্গমের পথ লৌহ এবং প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা দুরতিক্রম। ইতিমধ্যে

বাইরে কোনো সবুজ আলোর নিঃশব্দ আবির্ভাবে এঞ্জিন যদি হুইসিল দিয়ে বসে, তা হ'লে যে অবস্থার উদ্ভব হবে, তার কল্পনাও ভয়াবহ।

যা হোক, কোনো প্রকারে যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে বাম মুষ্টিতে সেই পলাতক কাগজটাকে চেপে ধ'রে ত্বরিত অথচ সতর্কগতিতে নির্গমের পথে অগ্রসর হলাম। এক সময়ে বুঝতে পারলাম, খোয়া কিংবা কোনো লৌহ-ফলকের আঘাতে পায়ের একটা জায়গা কেটে গেল। কিন্তু সামরিক কর্মচারীর মূল্যবান কাগজ উদ্ধার ক'রে তখন প্রায় নিরাপদ হয়ে এসেছি, বিজয়ী বীরের শ্লাঘনীয় ক্ষতর ন্যায় সেই ক্ষতকে বিবেচিত ক'রে লোহার সুউচ্চ রেল টপকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

বইগুলোর সহিত কাগজটাকে ভাঁজ ক'রে গুছিয়ে নিতে নিতে আমাদের কামরা হতে বিচ্ছুরিত অস্পষ্ট আলোকে কিছু একটা চোখে প'ড়ে তীব্র সংশয়ে মনটা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। বিজ্ঞাপনের ছবির মতো একটা যেন কিছু দেখলাম! কিন্তু সে বিচার পরে করলেই চলবে, আপাতত গাড়িতে উঠে পড়া যাক।

উন্মুক্ত দ্বারের সম্মুখে দু হাত বাড়িয়ে আমার মাড়োয়ারী বন্ধু উবু হয়ে ব'সে ছিল,—ব্যস্ত হয়ে আমার হাত থেকে সে কাগজগুলো গ্রহণ করলে। বিশেষ কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ওটুকু উপকার গ্রহণ না ক'রে তাকে ক্ষুণ্ণ করতেও মন রাজী হ'ল না।

গাড়িতে উঠে কাগজগুলো পরীক্ষা ক'রে দেখে আপাদ-মস্তক সমস্ত শরীর দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে উঠল। কয়েকটা ম্যাগাজিন, একটা ছোট গল্পের বই আর সেদিনের একটা খবরের কাগজ।

সাহেব তখন ব'সে ছিল,—তার সামনে কাগজগুলো ফেলে দিয়ে লাম, "এই তোমার মিলিটারি অফিসারের জরুরি অফিস-ফাইল!"

সাহেব বললে, "তাতে কি হয়েছে? ওগুলো কি তার সম্পত্তি নয়?"

রুষ্টকণ্ঠে বললাম, "জান? একদিনের পচা ঐ খবরের কাগজটার জন্যে আমাকে জীবন বিপন্ন ক'রে গাড়ির তলায় লাইনের মধ্যে যেতে হয়েছিল?"

সাহেব বললে, "I am sorry." (দুঃখিত।)

এই দুঃখ প্রকাশের মধ্যে সহানুভূতির সুর অথবা কৌতুকের, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। মাথাটা আমার দপ্‌দপ্‌ করছিল। অর্বাচীনটার সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনো লাভ ছিল না। ঘৃণায় তাকে পরিত্যাগ ক'রে ল্যাভেটারিতে প্রবেশ করলাম।

প্রথমেই গলায় আঙুল দিয়ে খানিকটা বমি ক'রে ফেললাম। তার পর ক্ষতটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখি, নিতান্ত উপেক্ষার মতো নয়, বেশ একটু বিস্তৃত ও গভীর,—তখনো অল্প অল্প রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে। পকেটে অব্যবহৃত রুমাল ছিল, সেটা বার ক'রে জলে ভিজিয়ে ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধলাম। রক্ত প'ড়ে ধুতির তলার দিকটা একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল; জল দিয়ে ধুয়ে যতটা পারলাম ফিকে ক'রে নিলাম। ইত্যবসরে কিছু পূর্বে আপ পাঞ্জাব মেল পাস ক'রে গেছে এবং আমাদের ডাউন পাঞ্জাব মেলও তারপর চলতে আরম্ভ করেছে।

ল্যাভেটারি থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দেখি, বাঙ্কের উপর পরিপাটিভাবে আমার শয্যা রচিত হয়েছে। সাহেব যে রচিত করে নি, সে কথা অনুমান করলেও অল্পবুদ্ধির পরিচায়ক হয়।

আমার মাড়োয়ারী বন্ধুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে অনুযোগের সুরে বললাম, "এ কষ্ট আপনি কেন করলেন বলুন তো? আমি তো এক মিনিটেই ক'রে নিতে পারতাম।"

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বললে, "আপনি অনেক কষ্ট করেছেন বাবুজী,—আমি যদি আপনার থোড়া সেবা ক'রে থাকি তাতে ছতি (ক্ষতি) কি

আছে ?" তারপর আমার পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "ধোতিতে বহুৎ খুন লেগেছিল, জখম কি বেশি হয়েছে ?"

বললাম, "না, বেশি নয়, সামান্য। আর তো মধুপুরের কোনো কথা রইল না, এবার আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ুন। দরকার যদি কিছু হয়, ডাক দেবেন, ফওরন লাফিয়ে পড়ব।"

স্মিতমুখে ভদ্রলোক বললে, "দয়া আপনার বাবুজী।"

"বাবুজী! বাবুজী!"

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে দেখি, মাড়োয়ারী বন্ধু বাঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে।

"লিলুয়া পৌঁছে গেছেন বাবুজী।"

তাড়াতাড়ি বিছানা বেঁধে নেমে বসলাম। অপর বাঙ্কের সাহেবটি কখন কোন্ স্টেশনে নেমে গেছে। মিলিটারি অফিসার একটা টাটকা খবরের কাগজ কিনে পাঠে নিমগ্ন। আর, আমার বাঙ্কের নীচের সাহেব-পুঙ্গব তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত ক'রে ব'সে আছে। তার কোটের কাঁধে নিকেলের চক্‌চকে অক্ষরে লেখা—E. I. R.; সুতরাং সে একজন রেলকর্মচারী।

গত রাত্রের খবরের কাগজ ও বইগুলো নিয়ে সে নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ একসময়ে মিলিটারি অফিসারের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললে, "এগুলো তোমার দরকার আছে ?"

মিলিটারি অফিসার বললে, "তুমি চাও ওগুলো ?"

"যদি তোমার দরকার না থাকে।"

"না, ওগুলো আমি শেষ করেছি, তুমি নিতে পার।"

"ধন্যবাদ।" ব'লে রেলওয়ে কর্মচারী বইগুলো তার অ্যাটাশি-কেসে পুরে ফেললে।

আমি আর থাকতে পারলাম না। আমার মাড়োয়ারী বন্ধু ইংরেজী জানে কি না তার কোনো পরিচয় পাই নি, তথাপি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে ইংরেজীতেই বললাম, "Ultimately the important office-files penetrate into his own attache case. When he forced me last night to fetch them up, I am sure, he knew full well what sort of files they were, as it must have been he, who put them in that way in the bunk." (শেষ পর্যন্ত জরুরি অফিস-ফাইলগুলো ওর নিজের অ্যাটাশি-কেসেই ঢুকল। কাল রাত্রে কাগজগুলো নিয়ে আসতে ও যখন আমাকে বাধ্য করেছিল, আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি, কি রকম ফাইল ওগুলো তা ও ঠিকই জানত, কারণ ও-ই ওগুলো ও-রকম ক'রে বাঙ্কে রেখেছিল।)

আমি এমন কণ্ঠস্বরে বললাম, যাতে রেলকর্মচারী শুনতে পায়, অথচ মিলিটারি অফিসারের মনোযোগ আকর্ষণ না করে।

রেল-কর্মচারী সাহেব একবার আমার প্রতি জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে, কিন্তু কিছু বললে না। বোধ করি, বর্তমান অবস্থায় মনের ক্রোধ মনেই অবরুদ্ধ রাখা সমীচীন ব'লে সে স্থির করলে।

১৯১৮ কিংবা ১৯১৯ সালের কথা। মকদ্দমা উপলক্ষে সেজদাদা নবীনচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও আমি কলিকাতায় এসেছি। মক্কেলরা আমাদের থাকবার স্থান দিয়েছেন—ভবানীপুর পদ্মপুকুর রোডের ওপর একটা দ্বিতল গৃহের উপরতলায়। আমাদের গৃহের ঠিক সম্মুখে পথের দক্ষিণ দিকে হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি সার্ রমেশচন্দ্র মিত্রের বৃহৎ অট্টালিকা।

সে সময়ে ভবানীপুরে কুণ্ডু লেনে বাস করতেন আমাদের খুড়তুতো ভাই দেবেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সর্প-প্রসঙ্গে তাঁর বিষয়ে সামান্য কিছু কথা পূর্বে বলেছি। একদিন তাঁর গৃহে আমাদের দুজনের মধ্যাহ্ন-আহারের পর আমরা বাসায় ফিরছি। কাঁসারিপাড়া রোড ও চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রীটের মোড়ে একটা ঘোড়ার গাড়ির আড্ডা ছিল। সেখান থেকে একটা গাড়ি নিয়ে বাসায় পৌঁছবার আমাদের কল্পনা।

গাড়ির আড্ডার কাছাকাছি আমরা এসে পড়েছি। খর রৌদ্রতাপ হতে রক্ষা পাবার জন্য যত শীঘ্র সম্ভব গাড়ির মধ্যে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় দ্রুতগতিবশত সেজদাদা খনিকটা এগিয়ে গেছেন, আমি পিছনে পিছনে চলেছি, সহসা অতি সুমিষ্ট গীতধ্বনি শুনতে পেয়ে চলৎশক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। গৃহস্থ—বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একজন সাধারণ বৈষ্ণব একতারা বাজিয়ে গান ধরেছে—

পরাণবঁধুকে স্বপন দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে

নাসায় বেশর পরশ করিয়া
ঈষৎ ঈষৎ হাসে।
বঁধু ঈষৎ ঈষৎ হাসে॥

একে চণ্ডীদাসের প্রসিদ্ধ পদ, তার উপর যৎপরোনাস্তি সুললিত কণ্ঠস্বর, একেবারে মণিকাঞ্চনের যোগ!

আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হাতছানি দিয়ে ডেকে সেজদাদা বললেন, "দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস।"

পাল্টা হাতছানি দিয়ে আমি বললাম, "আপনি আসুন।"

নিকটে এসে গান শুনে সেজদাদা মুগ্ধ। বললেন, "খাসা গাচ্ছে তো হে! ভারি মিষ্টি গলা!"

বললাম, "শুধু তাই নয়, গাচ্ছে চণ্ডীদাসের পদ।"

এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললাম, "সেজদা, বাসায় গিয়ে এখন তো আমাদের বিশেষ কিছু কাজ করবার নেই,—একে নিয়ে গিয়ে খানিকক্ষণ গান শুনলে হয় না?"

খুশি হয়ে সেজদাদা বললেন, "চমৎকার হয়, কিন্তু যাবে কি অতদূর?"

বললাম, "না যাবার কি কারণ আছে! ব'লে তো দেখি।"

ক্ষণকাল পরে গান শেষ হবার পূর্বেই দ্বারান্তরাল থেকে একটি অলঙ্কারমণ্ডিত পেলব দক্ষিণ হস্ত নির্গত হয়ে বৈষ্ণবের ভিক্ষার ঝুলিতে এক মুঠো চাল ঢেলে দিলে। পুণ্য-সঞ্চয়ের ব্যস্ততার নিকট পরাজয় স্বীকার করলে সঙ্গীতের মাহাত্ম্য। অবহেলিত সঙ্গীতকে অসমাপ্ত রেখে পিছন ফিরতেই বৈষ্ণব দেখলে, আমরা দুজনে তার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

আমি বললাম, "বাবাজী, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।"

উৎসুক হয়ে বাবাজী বললে, "কি কথা বাবু মশায় ?"

"আমাদের একটু গান শোনাবে ?"

"শোনাব না কেন বাবু মশায় ? নিশ্চয় শোনাব। গান শোনানোই তো আমার কাজ।"

"কিন্তু পথে দাঁড়িয়ে তো হয় না,—আমাদের সঙ্গে তোমাকে আমাদের বাসায় যেতে হবে। গাড়ি ভাড়া ক'রে তোমাকে তুলে নিয়ে বাসায় যাব।"

"কোথায় আপনাদের বাসা ?"

স্থানটা বুঝিয়ে বলতে বাবাজী উৎসাহের সহিত রাজী হয়ে গেল। একটা গাড়ি ভাড়া ক'রে বাবাজীকে তুলে নিয়ে বাসায় উপস্থিত হলাম।

আমরা দুজনে নিজ নিজ শয্যায় জুৎ ক'রে বসলাম, বাবাজী আমাদের সামনে ব'সে একতারাতে ঝঙ্কার দিলে।

বললাম, "বাবাজী, ওখানে যে গানটা শেষ করলে না, সেই গানটা প্রথমে ধর,—পরাণবঁধুক স্বপনে দেখিনু।"

বাবাজী বললে, "আমি শেষ করলাম না, সে কথা ঠিক নয় বাবু মশায়; আমাকে শেষ করতে দেওয়া হ'ল না। গান শেষ ক'রে আমরা 'জয় হোক রাণীমা' ব'লে জানান দিই, তারপর ভিক্ষা পেলে চ'লে যাই। কিন্তু কেউ যদি গানের মধ্যে আমাদের ভিক্ষে দিয়ে চোকেন তা হ'লে আর আমরা নিজে থেকে গান গাই নে; আমরা ধ'রে নিই, যাবার জন্যে আমাদের নোটিস দেওয়া হয়েছে।" ব'লে অল্প একটু হাসলে।

বললাম, "এ তোমরা ঠিকই কর বাবাজী।"

বাবাজী প্রথমে 'পরাণবঁধুক' গানটি শোনালে, তারপর একে একে আরও চার-পাঁচটি গান গাইলে। একদম প্রথম শ্রেণী ব্যতীত নিম্ন

শ্রেণীর মালের সে কারবার করে না;—হয় চণ্ডীদাস, নয় জ্ঞানদাস, নয় গোবিন্দদাস।

গান শেষ হ'লে সেজদাদা তাকে এক টাকা পুরস্কার দিলেন। এক পয়সার ভিখারী এক টাকা পেয়ে আনন্দে উচ্ছলিত হয়ে উঠল। চৌষট্টি বাড়ি ঘুরে ঘুরে হয়তো দু দিনের পরিশ্রমের ফলে যে অর্থ সে সংগ্রহ করে, ছাদের তলায় ঠাণ্ডা হয়ে আরামে ব'সে এক ঘণ্টার মধ্যে তা করতলগত! এমন ঘটনায় আনন্দে উচ্ছলিত না হয়ে উপায় কোথায়? হর্ষোজ্জ্বল মুখে কৃতজ্ঞচিত্তে করজোড়ে সে আমাদের দুজনকে নমস্কার করলে।

আমার মনের মধ্যে একটা অভিসন্ধির উদয় হয়েছিল; জিজ্ঞাসা করলাম, "বাবাজী, তোমার নাম কি?"

ব্যগ্রকণ্ঠে বাবাজী বললে, "আজ্ঞে বাবু মশায়, আমার নাম ষষ্ঠীচরণ।"

"থাক কোথায়?"

"আজ্ঞে, থাকি খুব কাছেই,—আপনাদের বাসার ঠিক পেছনে বলরাম বসুর ছেকেন্ লেনে।"

আমাদের বাসায় নিয়ে আসার প্রস্তাবে বাবাজী তখন কেন উৎফুল্ল হয়েছিল, এখন সে কথা বুঝতে পারলাম। আমাদের সঙ্গে আসতে পারলে রথ দেখা কলা বেচা—উভয় সুবিধাই লাভ করতে পারে সে। বললাম, "তোমার বাসার নম্বর কত?"

ষষ্ঠীচরণ বললে, "আজ্ঞে, কুঁড়েঘরে থাকি, নম্বরের কি অত ঠিকানা আছে? দরকার যদি হয়, গলির মধ্যে গিয়ে ষষ্ঠী বৈরিগীর নাম করলে লোকে ব'লে দেবে। গলিতে ঢুকেই একটু পরে একটা

মুদিখানার দোকান আছে; তাদের জিজ্ঞাসা করলে তারা আমার ঘর দেখিয়ে দেবে।"

পুনরায় আমাদের নমস্কার ক'রে ষষ্ঠীচরণ চ'লে গেল।

সেই দিন সন্ধ্যাকালেই ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাশের নিকট ষষ্ঠীচরণের গল্প করলাম। তার ঠিকানা জেনে নিয়েছি, সে কথাও বললাম।

শুনে তিনি সবিস্ময় আগ্রহের কণ্ঠে বললেন, "বলেন কি? একজন সাধারণ পথের বোষ্টম চণ্ডীদাসের পদ গায়? আর অত মিষ্ট গলায়? একদিন আমাদের গান শোনাবার ব্যবস্থা করুন।"

বললাম, "কবে কোন্ সময়ে সুবিধে হবে বলুন?"

একটু চিন্তা ক'রে চিত্তরঞ্জন বললেন, "কাল একটু অসুবিধা আছে। পরশু সন্ধ্যার পর, ধরুন আটটার সময়ে?"

বললাম, "বেশ, কাল তাকে খুঁজে বের ক'রে পরশুর ব্যবস্থাই করব।"

পরদিন সন্ধ্যাকালে বন্ধুবর শ্যামরতন চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে ষষ্ঠীচরণের অনুসন্ধানে বলরাম বসুর সেকেণ্ড লেনে প্রবেশ করলাম। সমস্ত দিন পথে পথে গান গেয়ে বেড়িয়ে সন্ধ্যাকালে পরিশ্রান্ত শরীরে সে বাসায় থাকবে, এই বিবেচনা ক'রে আমরা সন্ধ্যার সময়েই গিয়েছিলাম।

আমাদের সুবিবেচনার ফল হাতে হাতে পাওয়া গেল। কাউকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না, মুদিখানার সাহায্য গ্রহণেরও কোনো প্রয়োজন রইল না, আমাদের সৌভাগ্যক্রমে, হয়তো বা ষষ্ঠীচরণেরই প্রবলতর সৌভাগ্যের প্রভাবে, গলির মধ্যে খানিকটা এগিয়ে দেখি, পথের ধারে একটা জলের কলের পাশে দাঁড়িয়ে ষষ্ঠীচরণ মুখ-হাত-পা ধুচ্ছে;

বগলে একতারাটি চাপা। বুঝতে পারলাম, বৈকালিক রোঁদ সমাপ্ত ক'রে সে এখনই প্রত্যাবর্তন করেছে।

ডাক দিলাম, "ষষ্ঠীচরণ!"

সকৌতূহলে ফিরে চেয়ে আমাকে দেখে ষষ্ঠীচরণের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যুক্তকরে বললে, "নমস্কার বাবু মশায়।"

বললাম, "একজন খুব মহৎ লোক আর বড়লোকের বাড়ি তোমার গান শোনাবার ব্যবস্থা করেছি। চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টারের নাম শুনেছ?"

ষষ্ঠীচরণ বললে, "আমরা সামান্য লোক, বড়লোকদের নাম কি ক'রে জানব বাবু মশায়? বড়লোকদের দোরে যাই, গান করি, ভিক্ষে পেলে চ'লে আসি—এই পর্যন্ত। নামের তো কোনো খোঁজ রাখি নে দয়াময়।"

বললাম, "কাল সন্ধ্যার পর চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ি তোমাকে গান গাইতে হবে। সন্ধ্যা ঠিক সাতটার সময়ে আমাদের বাসায়, কাল যেখানে তুমি আমাদের গান শুনিয়েছিলে, উপস্থিত হবে। সেখান থেকে আমরা তোমাকে চিত্তরঞ্জনের বাড়ি নিয়ে যাব।"

বিনীতভাবে ষষ্ঠীচরণ বললে, "যে আজ্ঞে।"

বললাম, "মনে থাকে যেন, কাল সন্ধ্যা সাতটায় তোমাকে আমাদের বাসায় হাজির হতে হবে।"

"আজ্ঞে, তাই হাজির হব।"

"ঠিক তো? দেখো, আমাকে যেন লজ্জায় ফেলো না।"

ষষ্ঠীচরণের মুখে নিঃশব্দ মৃদু হাস্য দেখা দিলে; বললে, "হেহে একতারা রেখে ষষ্ঠী বৈরিগী কখনও বেঠিক কথা বলে না বাবু মশায়।"

সন্তুষ্ট হয়ে আমরা প্রস্থান করলাম।

একতারা দেহে রেখে ষষ্ঠী বৈরাগী সত্যিই বেঠিক কথা বলে নি। পরদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে শ্যামরতন ও আমি রাত্রি আটটার কিছু পূর্বে চিত্তরঞ্জনের গৃহে উপস্থিত হলাম।

চিত্তরঞ্জনের ল-ক্লার্ক ললিতবাবু আমাদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। দ্বিতলের সুপ্রশস্ত এবং সুসজ্জিত বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে তিনি আমাদের বসালেন। শ্যামরতন ও আমি পাশাপাশি একটা সোফায় উপবেশন করলাম, ষষ্ঠীচরণ বসল ভূমিতলে নকৃশা-কাটা মূল্যবান গালিচার উপর। তার জন্য একদিকে একটা জলচৌকির ব্যবস্থা ছিল, কিন্তু সম্মানের উচ্চ আসন পছন্দ না ক'রে সে গালিচার উপরই ব'সে পড়ল।

কক্ষের ছাদ থেকে চতুর্দিকে চারটে বিজলী বাতির ঝাড় বিলম্বিত; তার দীপাবলি হতে বিকীর্ণ উজ্জ্বল রশ্মিজালে সমস্ত কক্ষ উদ্ভাসিত। সেই বিচ্ছুরিত আলোক-প্রবাহের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত নানাবিধ শৌখিন ও মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার, আসবাবপত্র।

বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে টিপে টিপে ষষ্ঠীচরণ গালিচার ঘনত্ব পরীক্ষা করে, এদিক ওদিক দৃষ্টি সঞ্চালিত ক'রে উজবুকের মতো আসবাবপত্র দেখতে থাকে, ইলেকটিক ঝাড়গুলির প্রতি চেয়ে চেয়ে মুখ চোকায়।

মনে মনে আমি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠি। হতভাগা আজকে আমাকে না ডুবিয়ে ছাড়বে না দেখছি! ঐশ্বর্যের চোখ-ঝলসানো চাকচিক্য দেখে এমন আশাহীনভাবে স্নায়ু হারিয়ে বসেছে যে, কণ্ঠে আজ স্বরকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়তো তার পক্ষে সম্ভবই হবে না। সন্দেশ রসগোল্লা দেখে মুখ-চোকানো তবু খানিকটা সমর্থন করা যায়, ইলেকট্রিক ঝাড় দেখে সেই কার্য করার কোনো অর্থ হয় কি? মনে হ'ল, খানিকটা তার স্বপ্ন ভঙ্গ ক'রে দেওয়ার দরকার।

"ষষ্ঠীচরণ!"

ঈষৎ চমকিত হয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে ষষ্ঠীচরণ বললে, "বাবু মশায়?"

"ঘাবড়ো না যেন।"

"যে আজ্ঞে।"

"বেশ ভাল ক'রে গান ক'রো।"

"তা কি ক'রে বলি বাবু মশায়? সেটা রাধারাণীর ইচ্ছা।"

সর্বনাশ! এ তো সাফাইয়ের দিব্যি পথ ক'রে রাখলে দেখছি! এখন, রাধারাণী ইচ্ছা করলেন না বললে, কে এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করছে!

মিনিট দশেকের মধ্যেই পুত্র-কন্যাদ্বয় সহ চিত্তরঞ্জন ও বাসন্তী দেবী কক্ষে প্রবেশ করলেন। শ্যামরতন ও আমি উঠে দাঁড়ালাম। ব্যস্ত হয়ে হাত নেড়ে চিত্তরঞ্জন বললেন, "বসুন, বসুন।"

আমার লক্ষ্য ছিল, ষষ্ঠীচরণের কার্যকলাপ ভাবভঙ্গীর প্রতি। সে না দাঁড়াল উঠে, না করলে একটা নমস্কার। শুধু উজবুকের ঝুলঝুলে দৃষ্টি দিয়ে প্রত্যেককে অসঙ্গত নিবিষ্টতার সহিত নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন অসামাজিক মানুষ কদাচিৎ দেখা যায়!

দু-চারটে সাধারণ কথাবার্তার পর চিত্তরঞ্জন বললেন, "এবার তা হ'লে গান হোক।"

আমি বললাম, "ষষ্ঠীচরণ, এবার গান ধর। প্রথমে না-হয় সেই গানটাই গাও—'পরাণবঁধুকে স্বপনে দেখিনু'।"

প্রসন্ন মুখে চিত্তরঞ্জন বললেন, "হ্যাঁ, সেই গানটাই প্রথমে হোক।"

ষষ্ঠীচরণ একবার একতারাতে অঙ্গুলি তাড়না করলে, একবার দুই

চক্ষু বুজে কাউকে যেন আবাহন করলে, সম্ভবত রাধারাণীকেই, তারপর গান ধরলে—

পরাণবঁধুকে স্বপনে দেখিনু
বসিয়া শিয়র পাশে।
নাসার বেসর পরশ করিয়া
ঈষৎ ঈষৎ হাসে॥

কোথায় গেছে ইলেকট্রিক ঝাড়, কোথায় গেছে শৌখিন ও মূল্যবান কৌচ সোফা কেদারা, নিঃশব্দে কখন্ সেগুলাকে ষষ্ঠীচরণ নিঃশেষে পরিপাক করেছে। ঝানু গাইয়ের কণ্ঠে আত্মসমর্পণ করতে সুরলক্ষ্মীর এক মুহূর্তও বিলম্ব হ'ল না। সুমিষ্ট সুরেলা কণ্ঠের সুরমাধুর্যে এবং গম্ভীর মধুর কাব্যের ভাবাবেগে কক্ষের বায়ুমণ্ডল চকিত হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখি, অভ্যাসমত চিত্তরঞ্জন দুই চক্ষু মুদিত ক'রে সঙ্গীত-রস-সাগরে নিমগ্ন হয়েছেন। অপর সকলের মুখ-চক্ষে আনন্দের দীপ্তি।

সে গানটা শেষ হ'লে ষষ্ঠীচরণের প্রশংসায় সকলে মুখর হয়ে উঠলেন। ঘণ্টা-দেড়েক ষষ্ঠীচরণ গান গাইলে—কোনোটা চণ্ডীদাস, কোনোটা জ্ঞানদাস, কোনোটা গোবিন্দদাস, কোনোটা বা শশিশেখর।

প্রসন্ন মুখে চিত্তরঞ্জন বললেন, "আজ এই পর্যন্তই থাক্।" তারপর ললিতবাবুর কানে কানে কিছু উপদেশ দিলেন।

ক্ষণকাল পরে ললিতবাবু দুখানা দশ টাকার নোট এনে ষষ্ঠীচরণের হাতে দিলেন।

চিত্তরঞ্জন বললেন, "এ হ'ল তোমার প্রথম দিনের পারিশ্রমিক। সপ্তাহে একদিন ক'রে তুমি আমাকে গান শুনিয়ে যেয়ো। তার জন্যে তুমি পাবে প্রতি মাসে কুড়ি টাকা।"

ষষ্ঠীচরণ চিত্তরঞ্জনের কথা শুনছিল কি-না বলা কঠিন, সে তখন নোট

দুখানাকে ভাল ক’রে দেখছিল—আসল না জাল, বোধ হয় তাই পরীক্ষা করছিল। একটা কৃতজ্ঞতার কথা উচ্চারণ করলে না, একটু আনন্দিত হওয়ার লক্ষণ দেখালে না। যেন জমিদারির খাজনার টাকা আদায় হ’ল বাবু সাহেবের, এমনিভাবে তার পক্ষে কুড়ি টাকার বৃহৎ সম্পত্তিকে গ্রহণ করিলে।

রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বালা করছিল। গলা মিষ্টি হ’লে কি হবে, লোকটা একেবারে পশু।

নোট দুখানা ভাল ক’রে টেঁকে গুঁজে একতারাটা বাঁ বগলে বাগিয়ে নিয়ে ষষ্ঠীচরণ উঠে দাঁড়াল; তারপর একটা সর্বজনীন নমস্কার সেরে ধীরে ধীরে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল। সর্বজনীন নমস্কারেও বোধ করি বারো আনা অংশ আমারই উদ্দেশ্যে প্রয়োগ ক’রে গেল।

মিনিট দশ-পনেরো গল্প ক’রে শ্যামরতন ও আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।

একতলায় অবতরণ ক’রে কম্পাউণ্ড পেরিয়ে ফুটপাথে পা দিয়েই আতঙ্কে আঁতকে উঠলাম। একটা-কি নরম নরম অথচ ভারি বস্তু পা আঁকড়ে ধরেছে। চেয়ে দেখি, ষষ্ঠীচরণ। ঈষৎ রুষ্ট হয়ে বলি, “এ কি কাণ্ড তোমার ষষ্ঠীচরণ! আচমকা ও-রকম করতে আছে কখনও? হার্ট ফেল হতে পারে যে!”

আমার অনুযোগের জন্য বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়ে দু পা চেপে ধ’রে তার উপর মাথা ঘষতে ঘষতে ষষ্ঠীচরণ বারংবার বলতে থাকে, “এ আমার আপনি কি করলেন বাবু মশায়, এ আমার আপনি কি করলেন?

মনে মনে বলি, হারামজাদা! যথাস্থানে টুঁ শব্দ না ক’রে এখন অপাত্রে যত কিছু অপব্যয় করছ! প্রকাশ্যে বলি, “পা ছাড় ষষ্ঠীচরণ, প’ড়ে যাব।”

পা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে পুনরায় ষষ্ঠীচরণ করজোড়ে বলে, "এ আমার আপনি কি করলেন বাবু মশায় ?"

বিরক্ত হয়ে বলি, "আমি তোমার কিছুই করি নি, করেছে তোমার মিষ্টি গলা আর বৈষ্ণব পদাবলি। কিন্তু যিনি তোমাকে দু হাত ভ'রে টাকা দিলেন, তাঁকে একটি কথা বললে না কেন ?"

আমার কথা শুনে ষষ্ঠীচরণ একমুহূর্ত নিঃশব্দে আমার দিকে চেয়ে রইল ; তারপর ধীরে ধীরে বললে, "এবার যেদিন আসব, সেদিন তাঁকে বলব বাবু মশায়, আজ আপনাকেই বলি।"

শ্যামরতনের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "Better late than never !" তারপর নিজ নিজ বাসার উদ্দেশ্যে তিনজনে অগ্রসর হলাম।

মহেশপুর মামলার অন্তর্গত আরও কয়েকটি শোনাবার মতো কাহিনী ছিল। কিন্তু সবগুলি বলতে হ'লে একটি বিষয়ের পিছনে অসঙ্গত সময় এবং স্থান দিতে হয়। সুতরাং যে ঘটনায় আমি এক অচিন্তনীয় দিক থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে বিব্রত হয়েছিলাম, মাত্র সেই কাহিনীই বিবৃত করি।

প্রতিবাদী পক্ষে কয়েকটি প্রধান সাক্ষীর এজাহার সমাপ্ত হওয়ার পর এবং নিজ পক্ষের প্রধানতমা সাক্ষী রাণী রাধোপিয়ারীর এজাহার চলবার কালে সুচতুর আইনবাজ চিত্তরঞ্জন উপলব্ধি করলেন, জয়ের আশা তাঁর সুদুরপরাহত। কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বারা সমর্থিত পূর্ববর্তী মামলার মর্‌গেজ ডিক্রিকে অবৈধতার গভীর সলিলে ডুবিয়ে মারবার জন্ত বর্তমান মামলায় এত তোড়জোড় সত্ত্বেও যখন তিনি দেখলেন, সে দৃঢ়নিবদ্ধ ডিক্রিকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব হব না, তখন প্রতিবাদী সৌরীন্দ্রমোহন সিংহের উপর তার গভীর ব্যক্তিত্বের দুর্নিবার প্রভাব বিস্তার ক'রে মামলা দিলেন মিটিয়ে। সুদূরপ্রসারী বার্ষিক কিস্তিবন্দী বাদিগণের স্কন্ধে চাপল বটে, কিন্তু পুরনো ঘরের পুরাতন দরবার গেল বেঁচে। মহেশপুর হেরে যতখানি জিতল, প্রতিবাদী জিতে ততখানি হারলেন। প্রতিবাদী সৌরীন্দ্রমোহন কিন্তু তাঁর পরাজয়ের এই অংশটুকু প্রসন্নমনেই গ্রহণ করলেন।

যে নাটকীয় ভঙ্গিতে চিত্তরঞ্জন মহেশপুর মামলায় নিষ্পত্তি সংঘটিত করিয়েছিলেন, বলবার মতো এবং শোনবার মতো কাহিনী তা নিশ্চয়ই; কিন্তু অগ্রপশ্চাৎ সব দিক বিবেচনা ক'রে সে কথা অনুক্তই রাখলাম।

কলিকাতায় উভয় পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টার-অ্যাটর্নির সম্মিলিত বৈঠকে বহুচিন্তিত বিস্তারিত রফানামা (Compromise Petition) রচিত হওয়ার পর তার উপর বাদীগণের সইয়ের জন্য উভয় পক্ষের কয়েকজন উকিল অ্যাটর্নি ও কর্মচারী মহেশপুরে উপস্থিত হলেন। মকদ্দমায় চার-পাঁচ-জন বাদী ; তার মধ্যে জন-দুই উগ্র খেয়ালী। জ্যেষ্ঠ-কুমার যোগেন্দ্রনারায়ণ ধর্মপ্রবণ মানুষ, তিনি পূজা-অর্চনা নিয়েই সর্বদা ব্যস্ত থাকেন। মধ্যমকুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ বিষয়-কর্মে নিপুণ ব্যক্তি—জমিদারির পরিচালনা, মামলা-মকদ্দমার বিধি-ব্যবস্থা প্রধানত তিনিই করেন ; তাঁর শখ পাখোয়াজ বাজানোর, মহেশপুর অঞ্চলে সুদক্ষ মৃদঙ্গীরূপে তাঁর খ্যাতি। দেবেন্দ্রনারায়ণের পরে একজন কুমার সর্বদা শাড়ি পরিধান ক'রে এবং নানা রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয়ে আপন খেয়ালে মশগুল থাকেন। অপর একজন প্রায় শতাবধি বানরের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে অবস্থান করেন। শেষোক্ত, দুজনের সহিত আলাপাদি করা সহজ ব্যাপার নয়। কেউ যদি নিতান্তই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হন, নিজ আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকেই তাঁরা মুখে অল্প একটু হাসি এনে ঘাড় একটু বেঁকিয়ে, মাথা সামান্য নেড়ে অতি সংক্ষেপে সামাজিকতা রক্ষা করেন।

যেটুকু কাজ মহেশপুরে করবার ছিল তা সারতে তিন-চার ঘণ্টার বেশি লাগবার কথা নয় ; কিন্তু এই খেয়ালী বাদীগুলিকে জুটিয়ে একত্র ক'রে যথাবিধি বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে কাজ সম্পন্ন করতে দিন তিন-চার লেগে গেল। মেজাজ মতো তাঁরা বৈঠকে এসে বসেন, এবং মেজাজ মতো উঠে পড়েন। দেড় ঘণ্টা যদি অবস্থান করেন, কাজ হয় আধ ঘণ্টার বেশি নয় ; সুদীর্ঘ রফানামা পাঠ ক'রে ক'রে অতি বিশদভাবে তার বাংলা অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা বোঝানো চলেছে, রফানামার প্রায় বারো আনা অংশ শেষ

হয়ে এসেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একজন কুমার হয়তো ব'লে বসলেন, "কিছুই বুঝলাম না, আবার গোড়া থেকে বুঝিয়ে বলুন।" ব'লেই অট্টহাসি। সঙ্গে সঙ্গে অপর কুমারদের সজোরে তাতে যোগদান। সেই কৌতুকহাস্যের উদ্দাম ঝটিকায় আইন-আদালতের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব এত দূরে ভেসে যায় যে, তাকে ফিরিয়ে এনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে বেগ পেতে হয় কম নয়। 'কিছুই বুঝলাম না' উক্তির ভিত্তিতে সই নেওয়া তো কিছুতেই চলে না।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহর বরাবর দস্তখৎ গ্রহণের কার্য যথোচিতভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর অপরাহ্ণের দিকে আমাদের বিদায় নেবার পালা আরম্ভ হ'ল। একদল যাবে ভাগলপুরে, আর একদল কলিকাতায়। মহেশপুর থেকে মাইল আষ্টেক দূরে ই. আই. আর. লুপ লাইনের উপর নিকটতম রেল-স্টেশন মুরারই। জিনিসপত্র নিয়ে কর্মচারী ও ভৃত্যের দল গরুর গাড়িতে যথেষ্ট সময় হাতে নিয়ে রওনা হয়ে গেছে, রাত্রি নটার মধ্যে তারা স্টেশনে পৌঁছবে। রাত দশটায় ট্রেন। খান তিন-চার ঘোড়ার গাড়িতে চাপাচাপি ক'রে আমরা যাব। চা-পান শেষ হ'লেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। কুমাররা এসে আমাদের দুই পক্ষকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, এমন সময়ে জন-তিনেক কুমার ও জন-দুই উচ্চ কর্মচারী আমাকে ও আমাদের পক্ষে জনৈক উকিল রণজিৎ সিংহকে একান্তে আহ্বান ক'রে নিয়ে গেলেন। রণজিৎ সিংহ বর্তমানে ভাগলপুরের সর্বপ্রধান উকিল,—পরলোকগত লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র।

কুমারদের মধ্যে একজন আমাকে বললেন, "আপনার ও রণজিৎ-বাবুর আজ ভাগলপুর যাওয়া হবে না উপেনবাবু,—আপনারা কাল যাবেন।"

এ আবার কোনো নতুন খেয়ালের উদয় না কি? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন বলুন দেখি?"

স্মিতমুখে বিনয়নম্র কণ্ঠে কুমার বললেন, "আপনার মতো ব্যক্তির পায়ের ধূলো যখন মহেশপুরে পড়েছে, তখন আজ আমরা আপনাকে কিছুতেই ছাড়ছি নে।"

শুনে পুলকিত খানিকটা হলাম, কিন্তু সন্ত্রস্ত হলাম তার চতুর্গুণ। এ আবার কি ফ্যাসাদে পড়া গেল! নিজের মধ্যে এমন কোনো গুণের অস্তিত্ব খুঁজে পেলাম না, যার জন্যে মহেশপুরে আমার একদিনের অতিরিক্ত অবস্থান সমর্থিত হতে পারে। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি করতে হবে বলুন তো?"

"গাইতে হবে।"

"গান?"

একটা অট্টহাস্য উত্থিত হ'ল।

"তা নয় তো আবার কি? ওকালতির গাওনা? সে তো তিন দিন ধ'রে আপনারা শোনালেন।"

গান আমি গাই বটে,—আর সে গানের জন্য খ্যাতি না থাক্, জনশ্রুতি কিছু থাকতে পারে, কিন্তু সে গান গাইবার জন্য একদিন মহেশপুরে থেকে যাওয়ার কোনো অর্থই হয় না। ব্যগ্রকণ্ঠে বললাম, "আজ্ঞে, না না,—এর জন্যে আমি নিশ্চয় থাকব না। গান আমি হয়তো গাই, কিন্তু সে গান শোনবার মতো কিছুই নয়।"

আমার কথা শুনে একজন কুমারের মুখে প্রশংসার দীপ্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; ধীরে ধীরে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন, "বা বা! যেমন গুণ, তেমনি বিনয়! ভারতবিখ্যাত গাইয়ে আপনি, আর বলেন কি-না আপনার গান শোনবার মতো নয়!"

সর্বনাশ! বলে কি এরা? ভাগলপুরবিখ্যাত হতে পারলে বেঁচে যাই, আর বলে কি-না ভারতবিখ্যাত! পরিহাস নয় তো? ব্যঙ্গ নয় তো? আর কিছু নয় তো?

এ অদ্ভুত কথার কি উত্তর দোব ঠিক বুঝে উঠতে পারছি নে, এমন সময়ে আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাব দেখে উৎসাহিত হয়ে একজন কুমার নির্বন্ধব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "না বাগচী মশায়, সে আমরা কিছুতেই শুনছি নে। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে আপনার মত ওস্তাদ গাইয়ে যখন এখানে এসে পড়েছেন, তখন আপনার গান শুনতেই হবে।"

দুশ্ছেদ্য সমস্যার কুজ্ঝটিকা ভেদ ক'রে সমাধানের আলোক দেখা দেবার উপক্রম করেছে। উল্লসিত কণ্ঠে বললাম, "রসুন, রসুন। আমি কে বলুন দেখি?"

একটা হাসির হর্‌রা উঠল।

"আপনি ভাগলপুরের বিখ্যাত উকিল উপেন বাগচী মশায়,—আপনাকে জানতে আমাদের বাকি আছে না কি?"

মনের মধ্যে কৌতুকের একটা তীব্র আনন্দ জেগে উঠল; বললাম, "ভাগলপুরের উকিল উপেন বাগচী মশায়ের গান শুনতে হ'লে আমাদের কিন্তু এখনি একটা বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।"

সাগ্রহ কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল, "কি ব্যবস্থা বলুন?"

"নিশ্চয়ই করা যাবে।"

"কি ব্যবস্থা শুনি?"

গম্ভীর মুখে বললাম, "সশরীরে আমাদের সকলের স্বর্গে যাওয়ার ব্যবস্থা।"

উৎকণ্ঠিত স্বরে একজন কুমার বললেন, "তার মানে?"

বললাম, "তার মানে, এখনো যদি বাগচী মশায় গান গাওয়ার

অভ্যাস রেখে থাকেন তো স্বর্গলোকেই রেখেছেন; কারণ দীর্ঘকাল হ'ল তিনি স্বর্গারোহণ করেছেন। তিনি হয়তো ভারতবিখ্যাত গাইয়ে ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁকে মর্ত্যলোকের গানের আসরে পাবার উপায় নেই।"

ইলেকট্রিক লাইটের সুইচ তুলে দিলে ঘরের অবস্থা যা হয়, একযোগে সকলের মুখের অবস্থা সেইরকম নিষ্প্রভ হয়ে গেল। বুঝলাম, কোনো একটা জায়গায় সকলে বিশেষ রকম ঘা খেয়েছেন। নানা লোকে নানাপ্রকার হতাশাব্যঞ্জক বাক্য প্রকাশ করতে লাগল।

"বাগচী মশায় মারা গেছেন?"

"বাগচী মশায় জীবিত নেই?"

"আপনি বাগচী মশায় নন?"

একজন দুঃখার্ত স্খলিত কণ্ঠে বললেন, "কিন্তু আপনিও তো ভাগলপুরের—"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিও ভাগলপুরের উপেন উকিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাগচী মশায় নই, গাঙ্গুলী মশায়।" করজোড়ে বললাম, "আমি অপরাধী,—আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধ আপনারা ক্ষমা করুন।"

উপেন্দ্রনাথ বাগচী তাঁর সময়ে ভাগলপুরের সর্বপ্রধান ফৌজদারী উকিল ছিলেন। সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁর ছিল অসাধারণ পারদর্শিতা। তিনি ছিলেন প্রধানত ধ্রুপদ-গায়ক। একজন উচ্চশ্রেণীর গায়ক হিসাবে বিহারে ও বঙ্গদেশে তাঁর সুবিস্তৃত খ্যাতি ছিল। সুতরাং ভাগলপুরের অনতিদূরবর্তী মহেশপুরে তাঁর নাম অবিদিত ছিল না। ওকালতি ব্যবসায়ে আমি যোগদান করবার কয়েক বৎসর পূর্বেই বাগচী মহাশয়ের মৃত্যু ঘটে।

আমিও উপেনবাবু, ওকালতিও করি ভাগলপুরে, গানও গেয়ে

থাকি,—এই যুক্তি-পরম্পরার বিচারে মহেশপুরের কুমারগণ সিদ্ধান্ত করেছিলেন, আমি উপেন্দ্র বাগচী। কালের সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমার বয়ঃক্রমের সঙ্গে উপেন্দ্র বাগচী মশায়ের খ্যাতি কিরূপ চড়ানো যায়, সে কথা খতিয়ে দেখবার ধৈর্য তাঁদের মধ্যে কারো ছিল না।

আমার কথার উত্তরে মধ্যমকুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আমাদেরও অপরাধী করবেন না উপেনবাবু। আপনি ভাগলপুরের উকিল উপেনবাবু, আর গাইয়েও আপনি; সুতরাং—"

"সুতরাং আপনাদের গান শোনাতে উনি বাধ্য।"—মৃদুস্বরে এ কথা বললেন রণজিৎবাবু, এতক্ষণ যিনি সমস্ত অবস্থার দ্বারা উৎপন্ন উদ্ভট কৌতুক রস নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন।

রণজিৎবাবুর প্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত ক'রে কুমার দেবেন্দ্র বললেন, "বলুন তো রণজিৎবাবু, উপেনবাবুর উচিত নয় আমাদের গান শোনানো?"

সহসা কেমন ক'রে রণজিৎবাবুর স্কন্ধে দুষ্ট সরস্বতী আরূঢ় হয়েছিল। বললেন, "একশো বার উচিত। তা ছাড়া, আপনারা বাগচী মশায়ের গান শোনবার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন;—তিনি অবশ্য ওস্তাদ গাইয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাজখেঁয়ে আওয়াজ আধ ঘণ্টার বেশি বরদাস্ত করা যেত না। আর ইনি? একেবারে মধু।—যত শুনবেন তত মনে হবে, আরও শুনি।"

উল্লাসধ্বনি ক'রে উঠলেন কুমারগণ, "চাই নে আমরা বাগচী মশায়ের গান,—আমরা গাঙ্গুলী মশায়ের গানই শুনতে চাই।"

যৎপরোনাস্তি কাতরভাবে রণজিৎবাবুর প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "পরিহাস ক'রেও এমন অন্যায় কথা বলতে নেই রণজিৎবাবু।"

রণজিৎবাবু বললেন, "অন্যায় কথা বলছি কি-না, পরীক্ষা নিলেই এঁরা তা জানতে পারবেন।"

একজন কুমার বললেন, "উত্তম প্রস্তাব।"

একদল খেয়ালী মানুষের পাল্লায় পড়েছি, তার উপর দোসর জুটেছেন ঘরের শত্রু রণজিৎবাবু,—বুঝলাম সহজে পরিত্রাণ নেই। বললাম, "তা হ'লে পরীক্ষাই দিই। আনান একটা হারমোনিয়ম, একখানা বিদায়-সঙ্গীত শুনিয়ে যাই।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষে একজন কুমার বললেন, "বিদায়-সঙ্গীত বলছেন কি মশায়? আজ তো রাত বারোটা পর্যন্ত গাওনা চলবে।"

সহাস্যমুখে বললাম, "বারোটার সময়ে গাওনা চলবে ভাগলপুরগামী লুপ প্যাসেঞ্জারে।"

মাথা নেড়ে দেবেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আজ কিন্তু আপনাদের দুজনের যাওয়া হবে না উপেনবাবু। আজ এঁরা আপনাদের কিছুতেই ছাড়বেন না।"

এ কথা শুনে কিন্তু রণজিৎবাবুর মুখ শুকালো। যে পরিহাসের মালা নিয়ে এতক্ষণ তিনি খেলা করছিলেন, এখন তা সাপ হয়ে দংশন করতে উদ্যত হয়েছে। ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন, "না না, আমার থাকা কিছুতেই হতে পারে না, কাল সেখানে আমার জরুরি কাজ আছে। উপেনবাবুকে ধরিয়ে দিলাম, রাত বারোটা পর্যন্ত ওঁর গান শুনুন। আমার থাকবার তো কোনো কারণ নেই।"

দেবেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "একা ওঁকে কি ক'রে রাখা যায় বলুন? একজন ওঁর সঙ্গী তো চাই।"

বিশেষ জোরের সঙ্গে আমি বললাম, "নিশ্চয়ই চাই। সঙ্গীছাড়া আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছি নে। উনি যদি আজ রাত দশটার গাড়িতে যান, তা হ'লে আমিও তাই যাচ্ছি। তা ছাড়া, উনি কেমন ক'রে জানলেন যে, কাল ভাগলপুরে আদালতে আমার জরুরি কাজ নেই?"

রণজিৎবাবুর বিরুদ্ধে একটা প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তির মতো কিছু বোধ হয় মনের মধ্যে জাগ্রত হয়েছিল।

একজন কুমার, বোধ হয় তিনিই বানরের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন, বললেন, "কুছপরওয়া নেই। আপনাদের দুজনকে একশো টাকা ক'রে ফি দেওয়া যাবে। তা হ'লে তো আর আপত্তি নেই?"

বললাম, "তা হ'লেও আছে। মক্কেলের বাড়ি, বিশেষত মক্কেলের তরফসানির (প্রতিপক্ষের) বাড়ি, গান গেয়ে একশো টাকা ফি নিয়েছি জানতে পারলে হাইকোর্ট আমার সনদ কেড়ে নেবে।"

কুমার দেবেন্দ্র বললেন, "এসব কথার আলোচনায় তা হ'লে আর কোনো ফল নেই। একদিন আপনাদের এখানে আটকে রাখা যাবে না, সে কথা আমরা কতকটা আন্দাজ করেছিলাম। তার ব্যবস্থাও ক'রে রেখেছি। রাত দশটার গাড়িতেই সকলের সঙ্গে আপনারা ভাগলপুর রওনা হতে পারবেন। এঁরা বেরিয়ে গেলে পাঁচটা থেকে আমরা গানের আসরে বসব,—রাত সাড়ে সাতটা আটটা পর্যন্ত গান হতে পারবে। তারপর আপনাদের খাইয়ে-দাইয়ে ধীরে-সুস্থে পাঠিয়ে দোব; সাড়ে নটা পৌনে দশটার মধ্যে অনায়াসে সুরারই পৌঁছে যাবেন। আমাদের সবচেয়ে fast (দ্রুতগামী) কালো mare (ঘোটকীটা) আপনাদের টমটমের জন্যে রেখে দিয়েছি। মিনিট চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মধ্যে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

এ আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও ক্ষণকাল আমরা আপত্তি চালালাম; কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজী হতেই হ'ল। যেরূপ ব্যবস্থা শোনা গেল, তাতে ক্ষতিও তেমন ছিল না।

আমি বললাম, "কিন্তু অতক্ষণ ধ'রে কি গান হবে কুমারসাহেব? আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা?"

স্মিতমুখে দেবেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "তা হবে বইকি; গল্প-গুজবও তো মাঝে মাঝে চলবে। তা ছাড়া, অত লোকের আসর—উপরোধ-অনুরোধও কিছু হওয়া অসম্ভব নয়।"

সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কত লোকের আসর?"

"তা, শতাবধি লোকের তো নিশ্চয়ই।"

শঙ্কিতকণ্ঠে বললাম, "এত লোক আসবে কোথা থেকে?"

স্মিতমুখে দেবেন্দ্রনারায়ণ বললেন, "আজ সকালে মহেশপুরের আশেপাশে পাঁচ-সাতখানা গ্রামে চিঠি পাঠিয়ে গাইয়ে বাজিয়ে ও সমঝদারদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আসরে উপস্থিত হয়ে দেখবেন, কত গুণী ব্যক্তি আপনার গান শুনতে হাজির হয়েছেন।"

মন তিক্ত হয়ে উঠল। বললাম, "সকাল থেকে এত ব্যবস্থা চলেছে, অথচ আমাকে কিছুই জানান নি?"

হা-হা ক'রে দেবেন্দ্রনারায়ণ হেসে উঠলেন।

"সে সব ব্যবস্থার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক? আপনি তো সেরেফ আসরে গিয়ে গাইতে বসবেন। এই যে আমাদের সভাগায়ক তানসেন আসর নিয়ে সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলেন, তাঁরই কি আপনাকে কিছু জানানো হয়েছে?"

"আসরের কি নিয়ে তিনি ব্যস্ত ছিলেন?"

"আসর গোছানো নিয়ে। তানপুরো, এসরাজ, হারমোনিয়ম, বাঁয়া-তবলা, পাখোয়াজ প্রভৃতি ঝাড়া-পোঁছা বাঁধাবাঁধি নিয়ে।" ব'লে দেবেন্দ্র মুচকে মুচকে হাসতে লাগলেন।

এত বড় বিপদে পড়বার মতো কোনো অপরাধ ছিল না আমার। মনে হ'ল, হিংস্র ক্রোধের সহিত রণজিৎবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। গাঙুলী মশায় হয়ে কতকটা বেঁচে যাওয়া গিয়েছিল—যত হাঙ্গামা বাধিয়েছেন উনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে।

স্টেশনগামীর দল গাড়িতে উঠতে আরম্ভ করেছেন। ব্যস্ত হয়ে কুমারগণ শেষ বিদায় দানের উদ্দেশে ছুটলেন।

বিরক্তিবিরূপ মুখে রণজিৎবাবুর প্রতি বললাম, "আচ্ছা হাঙ্গামা বাধিয়েছেন আপনি! এখন চালাকির দ্বারা অবস্থা সামলাতে হবে। সঙ্গীতের বিষয়ে ভাগলপুরের খ্যাতি আছে, তাকে এখানে সমাধি দিয়ে গেলে চলবে না।"

রণজিৎবাবু বললেন, "কিন্তু ভয় পাচ্ছেনই বা কেন? আপনি তো খাসা গান করেন।"

বললাম, "খাসা গান করি আপনাদের সভায়,—কাব্য আর সুরের আসরে। আজকের এ তাল আর কসরতের আসরের আমি গাইয়ে নই। চতুরতার দ্বারা আজকের আসর উত্তীর্ণ হতে হবে।"

"কি চতুরতা বলুন?"

"শুনলাম আসরে পাখোয়াজের ব্যবস্থা আছে। আমি গোটা তিন-চার ধ্রুপদ গাইলেই আপনি আমাকে কীর্তন গাইবার জন্য অনুরোধ করবেন। কুমারদের বলবেন, 'টপ্পা-খেয়ালে সময় নষ্ট করবেন না, গান যদি শুনতে হয় তো উপেনবাবুর মুখে কীর্তনগান শুনুন।' খেয়াল-টপ্পার চোরাবালিতে একেবারে ঢোকা হবে না।"

স্মিতমুখে রণজিৎবাবু বললেন, "বুঝেছি, আর বলতে হবে না।"

কলিকাতা ও ভাগলপুরের যাত্রীগণ প্রস্থান করলে কুমাররা আমাদের নিকট ফিরে এলেন এবং ক্ষণকাল পরে গানের আসর থেকে প্রস্তুতির সংবাদ এলে আমাদের তথায় নিয়ে চললেন।

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী বধ্যভূমিতে যেমনভাবে যায়, কতকটা সেইভাবে গানের আসরের দিকে অগ্রসর হলাম।

রাজপ্রাসাদের বৃহত্তম বৈঠকখানা-ঘরে গানের আসরের ব্যবস্থা হয়েছিল।

যুগে যুগে পুরুষানুক্রমের বিভিন্ন রুচির দ্বারা সঞ্চিত বিচিত্র আসবাবপত্রে পরিপূর্ণ ঐ বৈঠকখানা-ঘরে কয়েক দিনই আমরা চা-পানের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলাম। সবিস্ময়ে দেখি, সেই সংখ্যাবহুল গুরুভার নানা আকারের ও প্রকারের ছন্দোবিহীন আসবাবপুঞ্জ, যেন যাদুমন্ত্রের প্রভাবে, নিঃশেষে অপসারিত হয়েছে। কৌচ, কেদারা, সোফা, আলমারি, চেয়ার, টেবিল, অর্গ্যান, সেণ্টার-পীস, কর্নার-পীস, শ্বেতপাথরের গোল টেবিলের উপর লীলায়িত মর্মর নারীমূর্তি, কোনো পদার্থের চিহ্নমাত্র নেই। তৎপরিবর্তে, ঘরজোড়া এক বহুমূল্য পারস্য-দেশীয় সুদৃশ্য গালিচা পড়েছে। তার পশম এত ঘন কোমল ও পুরু যে, পা রাখলে পায়ের আধখানা পাতা ডুবে যায়।

ঘরের চতুর্দিকের দেওয়াল ভ'রে ঠেসান দিয়ে শ্রোতৃবর্গ খেজুরে গুড়ের নাগরির মতো উবু হয়ে ব'সে। ভিতরে আমরা প্রবেশ করতেই সকলে একযোগে উঠে দাঁড়াল। বসবার জন্য আমরা অনুরোধ করলাম, কিন্তু কেউ সে অনুরোধে কর্ণপাত করলে না। বোধ করি, আমরা, বিশেষত কুমারেরা, দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থায় বসবার কল্পনা করাও তারা অসমীচীন মনে করে।

শ্রোতাদের ভিতর থেকে একজন, বোধ হয় কুমারদের মধ্য থেকে কারো ইঙ্গিত পেয়েই, বিনয়পীড়িতভাবে আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে

করজোড়ে নতদেহে আমাকে অভিবাদন ক'রে একান্ত কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে দাঁড়ালেন।

কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ পরিচয় দিলেন, "ইনি আমাদের সভাগায়ক তানসেন। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু নামের অযোগ্যও খুব বেশি নন।"

চড়ুকে হাসি হেসে বললাম, "আপনার পরিচয় পেয়ে ধন্য হলাম, গান শুনেও তাই হব।"

কুণ্ঠিতব্যগ্র কণ্ঠে তানসেন বললেন, "আজ্ঞে, না না। মশায়ের মতো গুণী লোকের সামনে আমি কি গান করতে পারি? মশায়ের গান শুনেই আজ আমরা ধন্য হব।"

ধন্য তো পরে হবেন, কিন্তু আপাতত 'মশায়ের' প্রাণ যে আনচান করেছে, তার সন্ধান তো তিনি রাখেন না। উপরন্তু, আমার ভয়েই যেন তটস্থ! সব কিছু দেখে-শুনে শেষ পর্যন্ত কুমারদের কানে কানে তাঁর বিরুদ্ধে যদি কোনো দোষারোপ ক'রে যাই, এই কথা ভেবেই যেন কাঁটা হয়ে আছেন। ভালয় ভালয় আজকের আসরটা খণ্ডাতে পারলে হয়—এমন দুশ্চিন্তা শুধু আমারই নয়, তাঁরও। নেউলের ভয়ে সাপ চিন্তিত, সাপের ভয়ে নেউল।

সকলে উপবেশন করলাম।

আসরের এক দিক ঘেঁষে যন্ত্রপাতির অরণ্য। খান-দুই তানপুরা, দু জোড়া বাঁয়া তবলা, গোটা-দুই হারমোনিয়ম, একটা এস্রাজ, দুটো পাখোয়াজ। একটা পাখোয়াজে এক ব্যক্তি ময়দা লাগিয়ে লাগিয়ে বাজিয়ে নিনাদ পরীক্ষা করছে। সে নিনাদের ধাঁই ধাঁই সুগভীর শব্দ আমার বক্ষঃস্থলে প্রতিধ্বনি তুলতে লাগল—ধাঁই ধাঁই ধাঁই ধাঁই!

একটা দুর্বিষহ বিরক্তিতে মনটা বিষিয়ে উঠল। কি এমন অপরাধ করেছি আমি, যার জন্তে এমন এক উদ্ভট অবস্থায় জড়িয়ে পড়তে

পারি? উপেন বাগচীর হিসাবে যে বিরাট আয়োজনের ব্যবস্থা, তা আমার কাঁধে চাপে কোন্ হিসাবে? যে কঠিন কষ্টিপাথর চতুর্দিকের দেওয়ালে হেলান দিয়ে অবস্থান করছে, কি এমন শক্তি আমার আছে যার দ্বারা তার উপর উজ্জ্বল রেখাপাত করতে পারি?

গান অবশ্য গাইতে যে আমি একেবারে পারি নে, তা নয়। কলকাতায়, ভাগলপুরে, সিমলায় এবং আরও আরও স্থানে আধুনিক রুচির ছোটখাটো গানের আসর অনেক সময়ে একাই গেয়ে রক্ষা করেছি। আজো হয়তো প্রতিদিনকার অপরিবর্তিত বৈঠকখানায় টুলের উপর হারমোনিয়ম রেখে চেয়ারে ব'সে গান গেয়ে খানিকটা জমিয়ে দিতে পারতাম। কিন্তু এত হাঙ্গাম ক'রে খালি-করা ঘরে, তালা-খুলে-বার-করা বৃহৎ গালিচার উপর ব'সে, দূর-দূরান্তর-থেকে-আসা গাইয়ে-বাজিয়েদের সাক্ষী রেখে গান গাইতে গেলে গান বেচারা হয়তো দম আটকেই মারা পড়বে! একটা নিরুপায় দুশ্চিন্তার তাড়নায় হাত-পা সিরসির করতে লাগল। মনে হ'ল, কোনও একটা ছল ক'রে বেরিয়ে গিয়ে নির্জনে একটু অশ্রুপাত ক'রে আসি।

পার্শ্বে উপবিষ্ট রণজিৎবাবুর কানে কানে বললাম, "আজ দেখছি মজিয়ে ছাড়বে!"

মৃদুস্বরে রণজিৎবাবু বললেন, "আমারও মনে হচ্ছে, আজ আপনি মজিয়ে ছাড়বেন। আপনার গান তো সর্বদাই শুনি,—একেবারে আনাড়ি সমঝদার নই।"

বললাম, "যতটা পারা যায় ভাগলপুরের মুখ রাখবার চেষ্টা করতে হবে। মনে থাকে যেন, খান-চারেক গানের পরই কীর্তন গাইবার কথা বলবেন।"

ঘাড় নেড়ে রণজিৎবাবু বললেন, "নিশ্চয় মনে থাকবে।"

দু-চার মিনিট সাধারণ আলাপ-আলোচনার পর মধ্যমকুমার দেবেন্দ্রনারায়ণ গান আরম্ভ করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। হারমোনিয়মটা আমি টেনে নিতে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি গাইবেন উপেনবাবু?"

বললাম, "পাখোয়াজে ময়দা দিয়েছেন, প্রথমে দু-চারখানা ধ্রুপদই গাওয়া যাক।"

দেবেন্দ্রনারায়ণের মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল; বললেন, "সৌভাগ্যের কথা! উপেন বাগচী মশায়ের মুখে ধ্রুপদ শুনবেন আশা ক'রে এঁরা এসেছেন, নিরাশ হতে হবে না,—উপেন গাঙুলী মশায়ও তাই শোনাবেন।" ব'লে উচ্চ হাস্য ক'রে উঠলেন।

বললাম, "কিন্তু নাকুর বদলে নরুন পেয়ে আমাকে দোষ দিলে চলবে না।"

কয়েকজন হেসে উঠলেন,—নিতান্তই আমার কথার উপর কৌতুকের ছাপ-মারা তরল হাসি।

হারমোনিয়মে সুর দিলাম।

অবস্থা বিরূপ নয়, সহানুভূতিশীল। হারমোনিয়মের আওয়াজটি গোল, সুরেলা; বেলো নিশ্ছিদ্র হাওয়াদার; চাবিগুলি তৎপর, টিপলেই সুর ছাড়ে। ঘরের বায়ুপুঞ্জও সুরবিস্তারের পক্ষে অনুকূল।

যে ভদ্রলোক পাখোয়াজে ময়দা চড়াচ্ছিলেন, তিনি পাখোয়াজটা তুলে নিয়ে অল্প-স্বল্প ঠুকে-ঠাকে হারমোনিয়মের সুরের সঙ্গে সুর ভেড়াতে আরম্ভ করলেন। তানপুরা মিলিয়ে নিলেন তানসেন।

পাখোয়াজ বাঁধা হয়ে গেলে কুমার দেবেন্দ্রের দিকে ভদ্রলোক পাখোয়াজটা এগিয়ে ধরলেন। তাঁর হাত থেকে পাখোয়াজটা নিয়ে

নিজ ক্রোড়ে স্থাপিত ক'রে মধ্যমকুমার সজোরে ধড়াধাঁই ধড়াধাঁই ক'রে ক্ষণকাল আঘাত দিলেন।

উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। বিপদের ঘন অন্ধকারে পরিত্রাণের রশ্মিরেখা দেখা দিয়েছে। নিমেষের মধ্যে মনে মনে মতলব গঠিত হয়ে গেল। দৈব অনুকূল, তার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

বললাম, "আপনিই বাজাবেন না কি?"

হাত জোড় ক'রে কুমার বললেন, "যদি অনুমতি করেন।"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললাম, "অনুমতি করব কি? মহা সৌভাগ্যের কথা মনে করব আপনার বাজনার সঙ্গে গাইতে পেলে।"

তানপুরা ছাড়তে আরম্ভ করলেন তানসেন। সুর ধরলাম, আ—

গলাটা নেহাত মন্দ নেই, কণ্ঠের ভিতর থেকে গভীর অবিচল স্বরের সাড়া পেয়ে প্রতীতি ফিরে এল। সামান্য একটু আলাপের দ্বারা সুরটাকে অল্প জমিয়ে দিয়ে সুরফাঁক্তা তালে ইমনকল্যাণ রাগের গান ধরলাম—

আদিনাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ,
দাও হে তব প্রসাদ
শান্তিসিন্ধু মহেশ,
সকল গুণনিধান!

পাখোয়াজের গভীরগুরু নিনাদে চকিতোচ্ছল কক্ষ গম্‌গম্ করছে। আমার কণ্ঠস্বরও তার থেকে বিশেষ পেছিয়ে পড়ছে না। এই উভয়কে একত্রে জড়িয়ে জড়িয়ে চলেছে তানপুরার সুররজ্জু। মোটের উপর, পাখোয়াজের চামড়া, তানপুরার ধাতুপদার্থ এবং মানুষের কণ্ঠতালু—ত্রিবিধ বস্তুর মধ্যে একটা সুরেলা মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত ক'রে দেখলাম, শ্রোতাদের মুখে চোখে আনন্দের

দীপ্তি। রণজিৎবাবু ধীরে ধীরে ক্রমশ সম্মুখের দিকে স'রে বসেছেন, তাঁর মুখে সগর্ব হর্ষের উচ্ছ্বাস।

জমেছে তা হ'লে।

উৎসাহের সহিত অন্তরার মধ্যে প্রবেশ করলাম,—

অযুত লোক অকথিত বাণী তোমারি হে,
মোহন রব অনুপম,
পূরে মহাগগন,
ভাবে মোহে জগজন!

তারপর সঞ্চারী ও আভোগ শেষ ক'রে আস্থায়ীতে ফিরে এসে দু ফের গেয়ে তেহাই উত্তীর্ণ হয়ে সমের মাথায় দিলাম হঠাৎ ছেড়ে। পাখোয়াজে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিয়ে সিংহগর্জন ক'রে মধ্যমকুমার ইঞ্চি-দুই লাফিয়ে উঠলেন। শ্রোতাদের মধ্যে ধন্য ধন্য রব প'ড়ে গেল। যে কৌশলের কথা বলেছিলাম, তা প্রয়োগ করবার এই মাহেন্দ্র ক্ষণ উপস্থিত। বললাম, "বা, বা, বা, বা! অনেক জায়গায় অনেক বাজনা শুনেছি, কিন্তু এমন অপূর্ব বাজনা তো কোথাও শুনি নি!"

সঙ্গে সঙ্গে কুমার বললেন, "তা হবে না কেন গাঙ্গুলী মশায়? কে এমন বাজিয়ে আছে, যার হাত এমন অপূর্ব কণ্ঠের কাজে না খুলে থাকতে পারে? আপনার মতো মিঠে আওয়াজ ইদানীং বহুদিন আমাদের মহেশপুরের আসরে শোনা যায় নি।"

শ্রোতাদের মধ্যে দু-চারজন ব'লে উঠলেন, "ঠিক কথা। ঠিক কথা।"

আমার বিশ্বাস, এ কথা যাঁরা বললেন তাঁদের বিরুদ্ধে বাকি খাজনার মামলা উদ্যত হয়ে আছে।

উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে কুমারের বাজনার আমি বেশ খানিকটা অতিপ্রশস্তি করেছিলাম, যার ফলে কুমার হাতে হাতে ঋণ পরিশোধ

করলেন। টোপ ফেলে মাছ ধরবার মতো প্রশংসা আদায় করার এই অপকৌশলকে মনে মনে অপছন্দ ক'রে কতকটা পাপস্খালনের অভিপ্রায়ে বললাম, "আপনি কিন্তু আমাকে পাওনার অধিক প্রশংসা দিচ্ছেন কুমার বাহাদুর। আমি তো কর্তবহীন সাদামাটা গান করলাম। তার মধ্যে না ছিল তুনের কাজ, না ছিল বাঁটের, না ছিল আর কিছু।"

হাসিমুখে মধ্যমকুমার বললেন, "থাকবার কিছু দরকার ছিল কি? কন্যা যদি কুৎসিত হয় তবেই তা অলঙ্কারের প্রয়োজন। কিন্তু তাতেই কি ময়লা ঢাকা পড়ে? কত কর্কশ আওয়াজকে কর্তবের দ্বারা পণ্ডশ্রম করতে দেখেছি আমাদেরই এই আসরে। আপনি তো আমাদের দিলেন উপাদেয় জিনিস।"

যতই কৈফিয়ৎ দিন না কেন কুমার বাহাদুর, আমার বিশ্বাস, আমার গান শোনার পর একজন উঁচুদরের গাইয়ে ব'লে আমার প্রতি তানসেনের ভয় ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু বড় গাইয়ের প্রতি ভয়ই একজন গাইয়ের পক্ষে একমাত্র ভয় নয়। যে উপায়ে আমি কুমারকে হস্তগত করলাম তা লক্ষ্য ক'রে তানসেন মনে মনে নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। বড় গাইয়ে না হয়েও কূটবুদ্ধির প্রভাবে যে এমন ক'রে বড় গাইয়ের আসন অধিকার ক'রে নিতে পারে, সে ধড়িবাজ ব্যক্তি ভালয় ভালয় বিদায় না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া সত্যই কঠিন কাজ।

কুমার দেবেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, "এবার কি গাইবেন উপেনবাবু?"

বললাম, "সিন্ধুড়া ধামার।"

সহর্ষে মৃদঙ্গ তুলে নিয়ে কুমার বললেন, "চমৎকার!"

এই 'সিন্ধুড়া ধামার' আমাদের সাহিত্য-সমিতির উৎসব উপলক্ষে আমার দ্বারাই রচিত গান। এর তালের প্রত্যেকটি পদমাত্রা গুনে গুনে গঠিত। কান টানলে যেমন মাথা আসে, মাত্রা টানলে তালের

না এসে উপায় নেই। তা ছাড়া, প্রথম প্রয়োজনকালে বিশেষ যত্নের সহিত এ গানটি শিখেছিলাম, পরেও বরাবর মাঝে মাঝে গানটি গেয়ে অভ্যাস বজায় রেখেছি। সুতরাং বেশ-খানিকটা ভরসা রেখেই গান ধরলাম—

আজি এ উৎসবে কর…

সিন্ধুড়া অতিশয় মিষ্ট রাগ,—ধামারের সহিত এ রাগের মণি-কাঞ্চনের সৌহৃদ্য। ইমনকল্যাণের কল্যাণে কক্ষের বায়ুস্তরে সুরের আসন পাতাই ছিল, তার উপর অধিষ্ঠিত হয়ে সিন্ধুড়া নিমেষের মধ্যে তার সুরমাধুর্য বিকীর্ণ করতে লাগল। বিলম্বিত লয়ের গভীরমিষ্ট ধামার তাল তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অপূর্ব সুরসঙ্গতির সৃষ্টি ক'রে চলল।

কুমার সজোরে দু হাতের তাড়নায় ধাপড়ধাঁই ধাপড়ধাঁই ক'রে বাজিয়ে চলেছেন,—আমি গেয়ে চলেছি মনের আনন্দে মাত্রার টিকি ধ'রে ধ'রে। গানের প্রান্ত তালের প্রান্তর সহিত সর্বদাই মিলছে; কদাচিৎ যদি না মিলছে তো ব'য়েই যাচ্ছে। খুশি আছি আমরা উভয়েই—গাইয়ে এবং বাজিয়ে; হয়তো তৃতীয় পক্ষও।

শেষ সমের উপর কিন্তু গানের ও তালের পরিপূর্ণ মিলন সঙ্ঘটিত হ'ল। পূর্ববৎ কুমার দেবেন্দ্র দুই হাতের দ্বারা পাখোয়াজের দুই দিকে যুগপৎ আঘাত দিয়ে 'হা' শব্দ ক'রে উচ্ছলিত হয়ে উঠলেন। শ্রোতাগণ বিপুল হর্ষধ্বনির সহিত ধন্য ধন্য করতে লাগল।

তৃতীয় গান ধরলাম আলেয়া রাগের ঝাঁপতাল তালের সাবেক যুগের গান—

সঙ্কটনিবারিণী তারিণী শিবদায়িনী
কৃপানেত্রে হের গো হেরম্বজননী!

এ গানটিও একই ভাবে আদৃত হ'ল। প্রশংসা-রথের চাকা যে

খাত ধ'রে চলতে আরম্ভ করেছিল, তা থেকে উৎখাত হবার কোনও লক্ষণ দেখালে না।

কুমার দেবেন্দ্রনারায়ণের প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে বললাম, "তিনখানা তো গাইলাম, এবার আপনাদের মধ্যে কেউ ধরুন।"

ব্যস্ত হয়ে সজোরে মাথা নেড়ে অপর একজন কুমার বললেন, "আজ্ঞে না, এখানকার কেউ গাইবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই। যা গাইবেন, আপনিই গাইবেন।"

সুরটা জাগিয়ে রাখবার জন্যে তানসেন ধীরে ধীরে তানপুরা ছাড়ছিলেন; বললেন, "এবার তা হ'লে খেয়াল হোক।"

সুযোগের সন্ধানে ছিলেন রণজিৎবাবু; মাথা নেড়ে ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, "না না, খেয়াল-টেয়াল গাওয়াবেন না উপেনবাবুকে দিয়ে। যে বিষয়ে ওঁর আসল অধিকার সেই জিনিস নিন ওঁর কাছ থেকে। কীর্তন গাওয়ান ওঁকে।"

তানসেন বললেন, "কীর্তন গান উনি?"

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রণজিৎবাবু বললেন, "গান বললে কিছুই বলা হয় না, অদ্ভুত গান—মধুর, মধুর! শুনবেন যখন, তখন এই কথা ভেবে অনুতাপ হবে যে ধ্রুপদ শুনে এতখানি সময় নষ্ট করেছেন।"

বিস্ফারিত নেত্রে একজন কুমার বললেন, "বলেন কি!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

শ্রোতাগণের ভিতর থেকে একজন মাতব্বর গোছের ব্যক্তি বললেন, "খুব ভাল কথা। আমরা কীর্তনই শুনব।"

কুমার দেবেন্দ্র বললেন, "কিন্তু খোলের কি হবে? খোল তো নেই।"

এ কথা এতক্ষণ কারও খেয়াল হয় নি; উৎসাহের মুখে একটা স্তুরপনের বিঘ্ন দেখা দিলে। রাজবাড়ির খোলটা বেমেরামত অবস্থায়

প'ড়ে আছে। পোয়াখানেক পথ দূরে একজনের গৃহে খোল আছে বটে, কিন্তু সেটা আনিয়ে নিতে অনেক সময় যাবে, তা ছাড়া, শোনা গেল, সেটাও হয়তো ঠিক ব্যবহার্য অবস্থায় নেই।

সেদিনকার সভায় তবলা বাজাবার যাঁর কথা তিনি বললেন, "আপনি ধরুন গাঙ্গুলী মশায়, আমি বাঁয়া-তবলায় চালিয়ে নোব।"

শুনে বিরক্তি বোধ করলাম। কীর্তনের যে গানগুলো গাইবার ইচ্ছা, তার মধ্যে কয়েকটা শ্রেষ্ঠ গানের তালের বিষয়ে হয়তো একটু গোল ছিল; খোল নেই দেখে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। এ আপদ আবার পিছনে লাগবার চেষ্টায় আছে! মৃদু হেসে বললাম, "খুব সুবিধে হবে না,—যার যা অঙ্গ। কীর্তনের সঙ্গে বাঁয়া-তবলার সঙ্গত হ'লে হবে গোবিন্দের ভোগে পাঁঠার মাংস।"

কুমার দেবেন্দ্র বললেন, "না, বাঁয়া-তবলা কীর্তনে চলবে না।"

রণজিৎবাবু বললেন, "কোনও চিন্তা করবেন না সেজন্যে। বিনা খোলে উপেনবাবু গাইবেন, কিন্তু খোল বাজবে আপনাদের মনের মধ্যে। দেখুন না বিনা খোলে উনি কি কাণ্ড করেন!"

চা বিতরিত হচ্ছিল। কুমার দেবেন্দ্র বললেন, "এক পেয়ালা চা খেয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিন উপেনবাবু।"

চা-পান শেষ ক'রে গান আরম্ভ করলাম। প্রথমে ধরলাম বৈষ্ণব কবি জ্ঞানদাসের প্রসিদ্ধ পদ—

শুনিয়া দেখিনু দেখিয়া ভুলিনু
ভুলিয়া পীরিতি কৈনু।
পীরিতি বিরহে পরাণ না রহে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মৈনু।

সে গান শেষ ক'রে ধরলাম—

কান্ত সনে কলহ করি কঠিনা কুলকামিনী
বৈঠি রহল নিজ ধামে।

তারপর গাইলাম—

বাজত ত্রিগি ত্রিগি থো ত্রিমি ত্রিমিয়া।

তারপর আরও গোটা-দুই গেয়ে সর্বশেষে ধরলাম চণ্ডীদাসের বিখ্যাত গান—

সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম!
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ॥

পূর্বে এ গান বহুবার গেয়েছি, কিন্তু আজকের মতো এমন আকুল প্রাণে আর কখনও গেয়েছি কি-না সন্দেহ। কোথা থেকে এতটা উগ্র প্রেরণা পেয়েছিলাম জানি নে, হয়তো বা আমার বিষয়ে রণজিৎবাবুর অতিশয়োক্তি থেকেই পেয়েছিলাম, গাইতে গাইতে মনে হচ্ছিল সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত বিগলিত হয়ে আমি যেন এক হয়ে গেছি, যেন আমার আর কোনো পৃথক সত্তা নেই।

গান শেষ হ'ল, কিন্তু কুমার দেবেন্দ্র উচ্ছ্বসিত হলেন না, শ্রোতারা হর্ষধ্বনি করলেন না; মুহূর্তকাল সকলে বাক্যহারা হয়ে রইলেন। মৌনভঙ্গ করলেন কুমার দেবেন্দ্র; ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, "বলিহারি উপেনবাবু! ধন্য আপনি! যে আনন্দ আজ আমাদের দিলেন, তার জন্য আমরা কত যে কৃতজ্ঞ তা বলতে পারি নে।"

ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠিতভাবে তানসেন বললেন, "সত্যিই এখন মনে হচ্ছে, ধ্রুপদ শুনে আমরা সময় নষ্ট করেছি।"

প্রশংসাটা কিন্তু দ্ব্যর্থক। এর অর্থ আমার কীর্তনগানের পরোক্ষ

প্রশস্তি অবশ্য হতে পারে ; কিন্তু এ যদি রণজিৎবাবুর কথার সমর্থনের ছলে আমার ধ্রুপদ গানের প্রচ্ছন্ন সমালোচনা হয়, তা হ'লেই বা কে কি করছে ?

হল-ঘরের ঘড়িতে আটটা বেজে গিয়েছিল। হারমোনিয়মটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললাম, "এবার আপনাদের কিছু হোক।"

এ প্রস্তাবে কেউ রাজী তো হলেনই না, অধিকন্তু আরও কিছু কীর্তন-গান শোনবার জন্য শ্রোতারা আমাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন।

কুমার দেবেন্দ্র বললেন, "আটটা বেজে গেছে। দশটার গাড়িতে যেতে হ'লে এখনি না উঠলে খাওয়া-দাওয়ার কিন্তু তাড়াতাড়ি হবে।"

এ কথার ফলে সভা শেষ করতেই হ'ল। অপরিসীম প্রশংসাবাণীর ভিড় ঠেলে রণজিৎবাবু ও আমি সঙ্গীতের আসর উত্তীর্ণ হয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এলাম।

তারপর মুখ-হাত ধুয়ে আহার-কক্ষে প্রবেশ ক'রে ব্যাপার দেখে আমাদের চক্ষুঃস্থির হ'ল। একটি মাঝারি সাইজের ঘরের প্রায় অর্ধাংশ আমাদের দুজনের আহার-সামগ্রীতে পূর্ণ। একজন ব্রাহ্মণ নিকটে ব'সে আছে আমাদের ফরমাশমতো আহারের পাত্র এগিয়ে দেবার জন্যে।

গানের আসর মানে মানে উত্তীর্ণ হয়ে এসে এ আবার এক নূতন বিপদে পড়া গেল। যা হোক, সাধ্যমতো আহার্য-বস্তুর প্রতি সুবিচার ক'রে প্রাণে প্রাণে উঠে পড়লাম।

বিদায়ের আর একদফা পালা শেষ ক'রে আমরা যখন টমটমে আরোহণ করলাম, তখন রাত্রি নটা।

সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎবেগে গাড়ি ছুটে চলল। সত্যি, ঘোড়া তো নয়, যেন পক্ষিরাজ!—অবশ্য ঘোটকী যখন, তখন পক্ষিরাণী। স্টেশনের

নিকটে যখন আমরা উপস্থিত হলাম, তখন হোম সিগ্‌নাল ডাউন হয় নি, কিন্তু ডিস্ট্যান্ট সিগ্‌নাল ডাউন হয়েছে।

আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে হাসিমুখে রণজিৎবাবু বললেন, "কি উপেনবাবু, গাড়িও পাওয়া গেল, মহেশপুরও জয় ক'রে এলেন,—আর কিছু বলবার আছে আপনার ?"

বললাম, "বলবার আছে, মহেশপুর যদি নিতান্তই জয় ক'রে থাকি, তা হ'লে শুধু সুরের জোরে করি নি, দুজনের ওকালতির জোরেও করেছি।"

রণজিৎবাবু হাসতে লাগলেন।

১৮

১৯১৯ কিংবা ১৯২০ সালের কথা। ভাগলপুরে ওকালতি করি; কার্যোপলক্ষে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় এসেছি। পাকাপাকিভাবে রেঙ্গুন ত্যাগ ক'রে শরৎচন্দ্র তখন বাজে-শিবপুরে বাসা ভাড়া ক'রে বাস করছেন। খ্যাতি এবং অর্থাগম প্রতিদিন লাউগাছের ডগার মতো বেড়ে চলেছে।

কলিকাতায় এলে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা না ক'রে যাই নে। সেবারও একদিন প্রত্যুষে চা-পানের পর শরতের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। বাইরের ঘরে ব'সে শরৎ নিবিষ্ট মনে একটা বই পড়ছে, হাতে আলবোলার নল। পায়ের কাছে শুয়ে আছে ভেলি—শরতের পেয়ারের কুকুর।

ভেলির বংশপরিচয় সুবিধাজনক নয়। পথে-ঘাটে যে সকল সরমার অপত্য বেওয়ারিশ ঘুরে বেড়ায়, চলিত কথায় যাদের বলে 'নেড়ী-কুত্তা'—ভেলি তাদেরই একজন। শুধু অপরিমিত মাংস খেয়ে খেয়ে এবং শরৎচন্দ্রের কাছে অসঙ্গত আদর পেয়ে পেয়ে সে যেমন হয়ে উঠেছে মোটা, তেমনি রাগী। আমি একদিনও তাকে ঠাণ্ডা মেজাজে দেখি নি। ভেলির ধারণা, শরতের বাড়িতে যারা বাস না করে, তারা সকলেই তার শত্রু। তাই বাইরে থেকে কেউ এলেই প্রথমে সে দন্তাস্ফালন করে, তারপর তেড়ে যায়। এ বিষয়ে তার ভদ্র-অভদ্র বাছবিচার নেই।

একজনের কাছে কিন্তু ভেলি ভারি জব্দ হয়েছিল। তিনি শিবপুরের তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাঝে মাঝে

প্রবোধবাবু শরতের বাড়ি আসেন—কোনদিন ডাক্তাররূপে, কোনদিন বা এমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একবার উঁকি মেরে যেতে। ভেলি কিন্তু প্রতিদিনই তাঁকে আক্রমণ করতে যায়। স্মরণশক্তি তার ভাল নয়। কারো সঙ্গে পরিচয় হ'লেও পরদিনই তাকে ভুলে গিয়ে তাড়া করা তার অভ্যাস।

একদিন প্রবোধবাবু এসে দাঁড়াতে ভেলি যথানিয়মে দন্তাস্ফালন আরম্ভ করেছে। কি খেয়াল হ'ল, পকেট থেকে স্টেথিসকোপটা বার ক'রে প্রবোধবাবু দু-হাত দিয়ে ভেলির দিকে মেলে ধরলেন। দেখে ভেলির মুখ শুকিয়ে উঠল; ভাবলে, 'গেছি আজকে। ঐ সাঁড়াশির মতো জটিল যন্ত্র, যা থেকে আবার নলের আকারের কি একটা ব্যাপার নীচের দিকে নেমেছে, একবার গলায় চেপে বসলে আর রক্ষে নেই।'

মনেও হওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ ভরে দুদ্দাড়িয়ে পালিয়ে গিয়ে ভিতর-বাড়িতে ঢুকে চক্ষের পলকে দু দফা সিঁড়ি ভেঙে দোতলার ছাদের উপর উঠে বাইরের ঘরের দিকে মুখ ক'রে বিষম চীৎকার লাগাল—ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ!

এর পর থেকে প্রবোধবাবুকে দেখামাত্র ভেলি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াত, তারপর প্রবোধবাবু পকেটের দিকে হাত বাড়ালেই সোৎসাহে দৌড় মেরে ছাদে উপনীত হয়ে বীরবিক্রমে চীৎকার লাগাত—ভেউ ভেউ ভেউ ভেউ!

আমাকে দেখে ভেলি একবার দন্তাস্ফালন করলে, তারপর আমার অবাঞ্ছনীয় আবির্ভাবে অসন্তোষের প্রকাশস্বরূপ গুরগুর শব্দ করতে লাগল। বোধ হয় সেই শব্দেই সচেতন হয়ে মুখ তুলে আমাকে দেখে প্রসন্নকণ্ঠে শরৎ বললে, "আরে, এস, এস উপীন। কবে এলে?"

বললাম, "যেতেই তো চাই, কিন্তু যাওয়ার পথে তোমার ভেলি বিষম বাধা।"

ভেলির গায়ে হাত দিয়ে শরৎ বললে, "খবরদার ভেলি, দুষ্টুমি করিস নে। কামড়াতে নেই রে। মামা। কামড়াতে নেই।"

ভেলি শরতের এত কথা বুঝলে কি-না বলতে পারি নে, কিন্তু এটুকু সে উপলব্ধি করলে, আগন্তুকের বিরুদ্ধে হিংস্র হবার পক্ষে তার প্রতি নিষেধ হয়েছে। তার গুরগুরুনি ক'মে আসতে লাগল। শরতের কাছে গিয়ে একটা চেয়ারে উপবেশন ক'রে বললাম, "শুনতে পাই, ভেলি তার বাবাকে দু-দুবার কামড়েছে; সুতরাং তোমার মামাকে যদি একবার কামড়ায়, তা হ'লে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না।"

স্মিতমুখে শরৎ বললে, "দুবার নয়, চারবার।" তারপর এক মুহূর্ত চুপ ক'রে থেকে বললে, "সে কথা মিছে বল নি,—রাগ হ'লে মামার চামড়ায় দাঁত বসাতে ভেলি এক মুহূর্তও ইতস্তত করবে না।"

বললাম, "আর রাগ তার অনেক সময়ে বিনা প্ররোচনাতেও হয়।"

হেসে ফেলে শরৎ বললে, "তা হয়।" তারপর উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল, "ভোলা! ভোলা!"

ভোলা শরতের চাকর। ভোলা এলে শরৎ বললে, "বাড়িতে ব'লে দে, ভাগলপুর থেকে উপীনমামা এসেছেন, এইখানে নাওয়া-খাওয়া করবেন।"

ভোলা চ'লে গেল।

বললাম, "একবার আমাকে জিজ্ঞাসাও করলে না শরৎ? ব্যবস্থাটা একতরফাই করলে?"

আলবোলায় একটা দীর্ঘ টান দিয়ে শরৎ বললে, এসব ব্যবস্থা এক-তরফাই হয়ে থাকে, যেহেতু অপর পক্ষ আপত্তি করলেও সে আপত্তি টেঁকে না।"

সে কথা আমিও জানতাম, তাই আসবার সময়ে বাড়িতে ব'লে এসেছিলাম, আজ সেখানে আহার করব না।

কিছুক্ষণ পরে আমার জন্ম চা ও খাবার এবং শরতের জন্ম চা এল। চা-পান করতে করতে আমরা গভীরভাবে গল্পে নিমগ্ন হলাম।

আহারাদি সারতে বেলা একটার কাছাকাছি হ'ল। ভোজনটা ভূরি-পর্যায়ের হয়েছিল, সুতরাং আহারের পর ভারাক্রান্ত দেহকে ক্ষণকাল বিশ্রামের ক্রোড়ে সমর্পণ করলাম। সেই সুযোগে শরৎ বেশ বড় এক ছিলিম তামাক পুড়িয়ে শেষ করলে।

বেলা তখন দেড়টা—শরৎ বললে, "চল উপীন, একটা সওদা করতে হবে।"

উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি সওদা হে?"

শরৎ বললে, "হোয়াইটওয়ের দোকানে একজোড়া রেক্স-শু কিনব।"

বললাম, "চল। কিন্তু হঠাৎ রেক্স-শুর শখ হ'ল কেন?"

শরৎ বললে, "শুনেছি, রেক্স-শু যেমন আরামের তেমনি মজবুত।"

হোয়াইটওয়ের রেক্স-শুর মতো মূল্যবান এবং অভিজাত জুতো কলিকাতার বাজারে খুব বেশি ছিল না। তখনকার দিনে একজোড়া রেক্স-শুর মূল্য ছিল সাড়ে বত্রিশ টাকা।

শরৎ বললে, "চল, স্টীমারে যাওয়া যাক, শীঘ্র হবে।"

বললাম, "চল।"

পথে বেরিয়ে দুজনে পাশাপাশি গল্প করতে করতে স্টীমার ঘাটের দিকে অগ্রসর হলাম। শরতের পায়ে একজোড়া ছিন্ন মলিন চটিজুতা। যৌবনকালে তার রঙ কালো ছিল অথবা বাদামি, তা সহজে ঠাহর করা যায় না। কোন জায়গা দেখলে মনে হয় কালো, কোন জায়গায় বাদামি। শুনলাম, জুতাজোড়া পাইখানা যাবার সময়ে শরতের কাজে লাগে।

স্টীমার-ঘাটের কাছ বরাবর পোয়াটাক পথের মতো অত ধূলি-বহুল পথ ওই শহরে আর দ্বিতীয় আছে কি-না সন্দেহ। ছিন্ন চটির তাড়নায় উৎক্ষিপ্ত ধূলিজালের কল্যাণে শরতের জুতার বর্ণবিভেদ দেখতে দেখতে এক এবং অভেদ ধূসর বর্ণে ঢাকা প'ড়ে গেল। সেই অতিশয় শুষ্ক এবং লঘু ধূলিকণিকাসমূহ শুধু তার জুতার অবস্থান্তর ঘটিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না, ক্রমশ তার দু পায়ে একজোড়া ধূসরবর্ণের স্টকিং পরিয়েও দিলে। আমার জুতো ছিল শু, তার উপর আমি সন্তর্পণে পা চেপে চেপে চলছিলাম; কিন্তু সতর্কতার যে কোন মাত্রা সেই তৎপর ধূলিজালের কাছে পরাভূত হতে বাধ্য।

গঙ্গা পেরিয়ে পরপারে হাইকোর্ট-ঘাটে উঠে শরৎ বললে, "কি করবে উপীন? ট্রামে চ'ড়ে এস্‌প্ল্যানেড যাবে, না, মাঠ ভেঙে সোজা হোয়াইটওয়ের দোকানে উঠবে?"

সামান্য ওটুকু পথের জন্য ট্রামে আরোহণের হাঙ্গামা পোয়াতে মন চাইল না; বললাম, "গল্প করতে করতে সোজা মাঠ ভাঙা অনেক ভাল লাগবে।"

দুজনে মাঠ উত্তীর্ণ হয়ে হোয়াইটওয়ের দোকানের সামনের ফুটপাথে উঠলাম। শরৎকে বললাম, "শরৎ, তোমার পায়ের আর জুতোর যা অবস্থা, অত দামি রেক্স-শু তোমাকে দেখাবেই না।"

"বল কি উপীন!" ব'লে একটু উদ্বিগ্নমুখে শরৎ কোঁচা দিয়ে পা আর জুতো দু চারবার ঝাড়লে। তার দ্বারা ধূলি হয়তো খানিকটা অপসৃত হ'ল, কিন্তু জুতোর অবস্থা বিশেষ উন্নতি লাভ করলে না।

বললাম, "আগের অবস্থা বরং ভাল ছিল, এ আরও খারাপ হ'ল শরৎ।"

মাথা নেড়ে শরৎ বললে, "হোক্‌গে। চল তো ঢুকি। না দেখাতে

চায়, সঙ্গে টাকা তো আছে, চারখানা নোট মুখের কাছে নেড়ে বলব—ডিয়ার ইস দি মানি।

গুটিগুটি দুজনে যেখানে ঢুকলাম, সৌভাগ্যক্রমে তার পাশেই জুতো-বিভাগ। অদূরে একজন শপ-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দাঁড়িয়ে ছিল, আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলে, "হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ, জেণ্টেল্‌মেন ?"

শরৎ বললে, "আমি এক জোড়া রেক্স-শু কিনতে চাই।"

আমাদের দুজনকে একটা সোফায় বসিয়ে ঘাড় এঁকিয়ে-বেঁকিয়ে শরতের পায়ের আকারটা ভাল ক'রে দেখে নিয়ে শপ-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট জুতো আনতে গেল।

জাত-বণিক এই ইংরেজেরা। পায়ের ধূলা অথবা ছিন্ন চটিজুতো এদের কি বিভ্রান্ত করতে পারে ? শরৎচন্দ্রের পদধূলি ইংরেজের স্পর্শের অপেক্ষায় উৎফুল্ল হয়ে রইল।

নিশ্চয় বলতে পারি, ঐ ধূলা আর ঐ ছিন্ন চটি নিয়ে তখনকার দিনের চাঁদনির কোনো জুতোওয়ালার দোকানে গিয়ে সাড়ে বত্রিশ টাকা মূল্যের জুতো দেখতে চাইলে দেখাত না তো বটেই, অধিকন্তু বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলত, "আজ হবে না, আর একদিন আসবেন।' চাঁদনির দোকানে জুতোর দর করতে গিয়ে বহুবার এমন কথা শুনতে হয়েছে, 'ও-দামে এক জোড়া হবে না, এক পাটি হবে।' এক পাটি জুতো কেনার কথা অবশ্য উঠত না, কিন্তু সেই এক পাটি জুতোর আঘাতটা আমাদের আত্ম-সম্মানের ওপরই পড়ত।

চীনা-বাড়িতে জুতো কিনতে গিয়ে কত যে দুর্ভোগ হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। দর একটু বেশি ক'রে করেছি কি আর রক্ষা নেই। কাঁধে হাত দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে, আর অবোধ্য চীনা ভাষায় অশ্রাব্য

গাল দিতে দিতে ফুটপাথে বার ক'রে দিয়েছে। অশ্রাব্য, তা ভাষা না বুঝেও বুঝতাম তাদের কুৎসিত মুখভঙ্গী দেখে। অপর পক্ষে আমরাও একেবারে ছেড়ে কথা কইতাম না। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে মার্জিত বাংলা ভাষার এমন সাঙ্ঘাতিক গুলি বর্ষণ করতাম, যা কোনো বাঙালীর প্রতি বর্ষণ করলে হাতাহাতি হবার কথা। সুমার্জিত বাংলা ভাষা না বুঝেও তারা বুঝতে পারত, আমরা তাদের প্রশস্তি গাচ্ছি নে, গালিই দিচ্ছি। দোকানের ভেতর থেকে তারা হাত নেড়ে নেড়ে স'রে পড়াবার জন্যে আমাদিগকে ইঙ্গিত করত; কখনও বা মুখভঙ্গীর দ্বারা নিঃশব্দ তিরস্কার করত; কিন্তু নিজেদের এলাকা অতিক্রম ক'রে ফুটপাথে কখনো অনধিকার প্রবেশ করত না।

তখনকার দিনের এই সকল দোকানদারদের ধারণা ছিল, এইরূপ দুর্ব্যবহারের দ্বারাই তাদের দাবির সমীচীনতার বিষয়ে খরিদ্দারকে বিশ্বাস করানো সহজ হয়।

আট-দশ জোড়া জুতার বাক্স দুই বগলে চেপে ধ'রে শপ-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট এসে হাজির হ'ল; তারপর হাঁটু গেড়ে শরতের সামনে ব'সে প'ড়ে এক এক জোড়া পরিয়ে পরিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল। কিছুতেই তার মন আর সন্তুষ্ট হয় না; পুনরায় চার-পাঁচ জোড়া নিয়ে এসে পরীক্ষা করতে লাগল। আমরা হয়তো মনে মনে একটু অধীর হয়ে উঠছিলাম, তার কিন্তু আদৌ অধৈর্য ছিল না। অবশেষে এক জোড়া পরিয়ে খুশি হয়ে মাথা নড়লে; তারপর ভাল ক'রে লেস বেঁধে দিয়ে বললে, "একটু চ'লে ফিরে দেখুন তো! আমার মনে হচ্ছে, এই জোড়া ঠিক ফিট্ করেছে।"

ঘুরে ফিরে বেড়াতে বেড়াতে শরতের মুখে খুশি হওয়ার হাসি ফুটে উঠল।

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেমন লাগছে?"

শরৎ বললে, "চমৎকার! জুতো পরেছি ব'লে মনেই হচ্ছে না।" মানি-ব্যাগ থেকে চারখানা দশ টাকার নোট বার ক'রে সে শপ-অ্যাসিস্ট্যাণ্টের হাতে দিলে।

সাড়ে বত্রিশ টাকার ক্যাশমেমো ও বাকি সাড়ে সাত টাকা নিয়ে এসে শপ-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট দেখে, প্রসন্ন মুখে শরৎ নূতন জুতা পায়ে আমার পাশে সোফার ব'সে আছে।

টাকা আর ক্যাশমেমো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে শরৎ বললে, "চল।"

নূতন জুতা থেকে পা খোলবার কোনো লক্ষণ নেই দেখে শপ-অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বললে, "আপনার স্লিপারটা জুতার বাক্সে দিয়ে দোব?"

"না, ওর আর কোনো দরকার নেই।" ব'লে শরৎ আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। জুতা আর নূতন বাক্স উভয়েই নাথহীন হয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে দোকানে প'ড়ে রইল। এখন বুঝতে পারলাম, জুতার বাক্স বহন করার কদর্যতা হতে অব্যাহতি লাভের জন্যেই শরৎ ঐ পাইখানার জুতা-জোড়া প'রে এসেছিল।

পথে বেরিয়ে শরৎ উত্তর দিকে চলতে লাগল।

ধর্মতলার মোড়ের মাথায় পৌঁছে শরতের দিকে তাকিয়ে বললাম, "শরৎ, ছ পয়সা ক্ষইল।"

আমার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে শরৎ বললে, "তার মানে?"

"তার মানে, অত দামি জুতো,—হোয়াইটওয়ে থেকে এ পর্যন্ত আসতে যেটুকু চামড়া ক্ষয়েছে, তার দাম ছ পয়সা নিশ্চয় হবে।"

কোনো কথা না ব'লে আমার প্রতি একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে শরৎ ধর্মতলা স্ট্রীট পার হয়ে অপর দিকের ফুটপাথে উঠল। তারপর

ডান দিকে মসজিদ রেখে সেণ্ট্রাল অ্যাভেনিউ ধ'রে হনহন ক'রে এগিয়ে চলল।

খানিকটা পথ গিয়ে বললাম, "শরৎ, তিন আনা ক্ষইল।"

কোনো মন্তব্য না ক'রে শরৎ যেমন চলছিল, হনহন ক'রে তেমনি চলতে লাগল। সম্ভবত সে আরামদায়ক মূল্যবান জুতা প'রে পথ চলার শখ মেটাচ্ছিল। আরও খানিকটা গিয়ে বললাম, "শরৎ, সাড়ে চার আনা ক্ষইল।"

এবার শরৎ গতি রোধ ক'রে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, "আরে, তুমি তো ভারি পেছনে লাগলে দেখছি!" তারপর অদূরে একটা চলন্ত খালি ট্যাক্সি দেখতে পেয়ে ডান হাত তুলে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে লাগল, "এই ট্যাক্সি ট্যাক্সি!"

ট্যাক্সি চালকের মনোযোগ আকৃষ্ট হ'ল। সবেগে গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে নিমেষের মধ্যে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দরজা খুলে দিলে।

আমার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে শরৎ বললে, "নাও, ওঠ।"

আমি ওঠার পর শরৎ উঠে ব'সে ট্যাক্সি ড্রাইভারকে বললে, "মেডিক্যাল কলেজের সামনে দিয়ে চল।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায় চলেছ শরৎ?"

শরৎ বললে, "হরিদাসের দোকানে।"

হরিদাসের দোকান অর্থে হরিদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকান —গুরুদাস লাইব্রেরি।

গুরুদাস লাইব্রেরিতে উপস্থিত হয়ে ঘণ্টাখানেক তথায় নিবিড়ভাবে আড্ডা দিয়ে বিদায় গ্রহণ করলাম। তারপর কলিকাতার কাজকর্ম শেষ ক'রে তিন-চার দিন পরে ভাগলপুরে ফিরে গেলাম।

মাস ছয়েক পরে আবার কলকাতায় এসেছি। যথানিয়মে সকালে শরতের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

আমাকে দেখামাত্র শরৎ উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলে, "ওরে ভোলা, মামা এসেছে, আমার জুতো জোড়া নিয়ে আয়।"

বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, "মামার প্রতি এ কি রকম অভ্যর্থনা, তা তো বুঝলাম না।"

কোনো উত্তর না দিয়ে শরৎ শুধু মুচকে একটু হাসলে।

ভোলা উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কি বলছেন?"

শরৎ বললে, "যে জুতো-জোড়া প'রে আমি প্রতিদিন বেড়াতে যাই, চট্ ক'রে নিয়ে আয়।"

তখনও পর্যন্ত জুতা-রহস্যের উদ্ঘাটনে আমি সমর্থ হই নি; রেক্স-শু নিয়ে ভোলা উপস্থিত হ'লে কথাটা বুঝতে পারলাম।

জুতা-জোড়া হাতে নিয়ে উল্টে ধ'রে তলাটা দেখিয়ে শরৎ বললে, "যেদিন জুতা-জোড়া কিনি, তুমি বলেছিলে—তিন আনা ক্ষইল, সাড়ে চার আনা ক্ষইল। নরম আর হালকা ব'লে মাস ছয়েক ধ'রে এই জুতো-জোড়াই সমানে ব্যবহার করছি। আচ্ছা, ভাল ক'রে লক্ষ্য ক'রে দেখে বল তো উপীন, আজ পর্যন্ত ক আনা ক্ষয়েছে? চার আনাও বোধ হয় নয়?"

বললাম, "নিশ্চয় নয়। দু আনাও বোধ হয় নয়।"

খুশি হয়ে শরৎ বললে, "ঠিক বলেছ। লোহার সোল হ'লে এত দিনে ক্ষ'য়ে যেত; কিন্তু এ এমন অদ্ভুত পেটা চামড়া যে, ক্ষইতে জানে না। দাম ওরা নেয় বটে, কিন্তু তার বদলাও দেয়।"

বললাম, "সে কথায় সন্দেহ নেই।"

জুতো-জোড়া ভোলার হাতে দিয়ে শরৎ বললে, "রেখে দিগে যা। আর বাড়িতে বলিস, মামা এসেছেন, এইখানে নাওয়া-খাওয়া করবেন।"

১৯১১ সালের ১১ই নবেম্বর আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। যে বিশেষ কারণে ঐ দিনটি স্মরণীয়, সে কাহিনী পরে বলছি; আপাতত পাঠকবর্গকে খেয়াল করিয়ে দিতে চাই, একটি বিশেষ কারণে ঐ দিনের তারিখটিও অবিস্মরণীয়।

১১ই নবেম্বর, ১৯১১ সংক্ষেপে লিখতে হ'লে আমরা লিখি—১১-১১-১১। ছটি একই সংখ্যার যোগে গঠিত এই ধরনের তারিখ মানুষের জীবনে কদাচিৎ দেখা দেয়। জীবনের বিস্তৃতি নিরানব্বই বৎসর হ'লেও সে-জীবনে একবার যে দেখা দেবেই তার কোনো কথা নেই; অথচ মাত্র একদিনের স্বল্পায়ু জীবনেও অনায়াসে একবার দেখা দিতে পারে। মোট কথা, একমাত্র সুদূর ভবিষ্যতের ইংরেজী ২২২২ সাল ব্যতীত প্রত্যেক শতাব্দীর মাত্র ১১ সালের ১১ই নবেম্বরে এই বিচিত্র তারিখটি উপস্থিত হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তিকে এমন তারিখ জীবনে দুবার দেখতে হ'লে ন্যূনপক্ষে কোন এক শতাব্দীর ১১ সালের ১১ই নবেম্বর থেকে পরবর্তী শতাব্দীর ১১ই নবেম্বর পর্যন্ত বাঁচা দরকার। বাংলা তারিখ সম্বন্ধেও ঠিক এই নিয়মই খাটে; তবে বাংলা তারিখের ক্ষেত্রে নবেম্বর মাস হবে ফাল্গুন মাস। তারিখ সম্বন্ধে গবেষণা এই পর্যন্তই থাক্, এবার মূল কাহিনীতে প্রবেশ করি।

Will force অথবা ইচ্ছাশক্তি সংক্রান্ত একটি মতবাদ শুনতে পাওয়া যায়। অত্যুগ্র ইচ্ছাশক্তির দ্বারা কোন দুর্লভ বস্তুকে যদি একান্তভাবে কামনা করা যায়, তা হ'লে শেষ পর্যন্ত সে বস্তু হাতে এসে ধরা দেয়, এই ধরনের মতবাদ।

মানুষের মনের ওপর অপর এক মানুষ ইচ্ছাশক্তির প্রভাব বিস্তার ক'রে প্রথমোক্ত মানুষের মনকে নিজের করতলগত করতে পারে, সে কথা স্বীকার করি। ভারতবর্ষীয় যোগবল ও পাশ্চাত্য দেশে মেস্‌মেরিজম্‌ ও হিপ্‌নটিজম্‌ প্রভৃতির দ্বারা এ হয়তো সম্ভব। কিন্তু মানুষের ইচ্ছাশক্তি নৈসর্গিক ক্রিয়াশীলতার উপর প্রভাব বিস্তার ক'রে তার রূপ অথবা গতি পরিবর্তিত করতে পারে—এমন কথা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। অথচ ১৯১১ সালে ১১ই নভেম্বর আমার জীবনে এমন একটি ঘটনাই ঘটেছিল। এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, একমাত্র ভগবানের হস্তক্ষেপের ফলে, অবশ্য ভগবান একান্তই যদি থাকেন এবং মানুষের আকুল প্রার্থনায় কর্ণপাত করবার অভ্যাস যদি তাঁর থাকে, তবেই।

১৯১১ সালে অক্টোবর মাসে আমি সিমলা পাহাড়ে অবস্থান করছিলাম। সিমলায় ইম্পিরিয়াল সেক্রেটারিয়েটে হোম ডিপার্টমেন্টে আমার মেজদাদা শ্রীযুক্ত রমণীমোহন গঙ্গোপাধ্যায় চাকরি করতেন। সেই সুযোগে আমি কয়েকবারই সিমলায় বেড়াতে গিয়েছিলাম।

অক্টোবর মাসের একেবারে শেষের দিক থেকে শীতটা চেপে নামতে আরম্ভ করল। মেঘলা দিন; মাঝে মাঝে এক-আধ পসলা হাল্‌কা বৃষ্টিও হয়ে যায়; বায়ু আর্দ্র শীতল; অভ্রভেদী জ্যাকো পাহাড়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, মাথায় যেন সে কুজ্ঝটিকার পাগড়ি বেঁধে ব'সে আছে। আমার সর্বপ্রধান কাজ হ'ল দিনের মধ্যে বার পাঁচ-সাত কাঠের দেওয়ালে বিলম্বিত থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এবং গভীর আকুতির সহিত প্রার্থনা করা—হে ভগবান, তোমার যে-লীলা দেখে এ পর্যন্ত চক্ষু সার্থক হয় নি, দয়া ক'রে তা একবার প্রকট কর। থার্মোমিটারের অধোগতিশীল পারদরেখার শীর্ষদেশকে হিড়হিড়িয়ে

৩২ ডিগ্রির হিমাঙ্কে (freezing point) অবনত করিয়ে প্রকৃতির অঞ্চল খসিয়ে একবার তুষারপাত করাও।

নবেম্বর মাসের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে পারদরেখার অধোগতি দ্রুততর হ'তে আরম্ভ করে, তার সঙ্গে সমান লয়ে আমার অন্তরের প্রার্থনাও প্রবলতর হ'তে থাকে। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আমার মনের দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনে হাসে; বলে, তোমার প্রার্থনায় বিগলিত হয়ে নবেম্বর মাসে তুষারপাত করাবেন, ঈশ্বরকে এত ভাল মানুষ পাও নি। এক ভদ্রলোক বললেন, "আবহাওয়া-অফিসের রেকর্ড থেকে দেখা যায়, ত্রিশ বৎসর পূর্বে নবেম্বর মাসে একবার তুষারপাত হয়েছিল; কিন্তু এই সুদীর্ঘ ব্যবধানের মধ্যে আর কোনোদিন হয় নি।"

তা না হোক, যা একদিন হয়েছিল, তা আর একদিন হবার পথে আটক নেই। মনের মধ্যে আশার দীপ উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল। ইচ্ছাশক্তির মাত্রা দিলাম বাড়িয়ে। রাত্রে শয্যা গ্রহণ ক'রে মনে মনে বলি—হে ভগবান! প্রত্যুষে চক্ষুরুন্মীলন ক'রে ডাকি—হে ঈশ্বর!

ঈশ্বর শেষ পর্যন্ত কর্ণপাত না ক'রে থাকতে পারলেন না।

১১ই নবেম্বর, অর্থাৎ ১১-১১-১১ তারিখের অপরাহ্ণ। কন্‌কনে ছুঁচ-ফোটানো শীত পড়েছে। শয্যার উপর অর্ধদেহে লেপ ঢাকা দিয়ে শুয়ে একখানা বই পড়ছি, ক্ষণকাল পরে চা ও খাবারের দ্বারা দেহ এঞ্জিনে কয়লা ও জল পুরে নিয়ে বৈকালিক ভ্রমণে নির্গত হওয়া যাবে, এমন সময়ে মেজদাদাকে টিফিন খাইয়ে ঝিল্লু চাকর এসে বললে, "বাবুজী, উপর সড়কমে বরফ গির রহা হৈ।" আমি যে বরফের জন্য আগ্রহ-পীড়িত মনে অবস্থান করছি, আমার অন্তরের এটুকু সন্ধান সে রাখত।

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে লেপের নরম ও গরম আবেষ্টন থেকে মুক্ত

হয়ে উপর সড়কে উপনীত হবার জন্য তৎপর হলাম। সিমলার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা ম্যালকে সাধারণত 'উপর সড়ক' বলে। আমরা সেবার থাকতাম কার্ট রোডেরও নিম্নে এগল্যাণ্টাইন কটেজে। ম্যালে পৌঁছতে হ'লে রিপন হাসপাতালের রাস্তা ধ'রে অনেকখানি চড়াই ভাঙতে হয়।

বাহিরে যেতে আমি উদ্যত হয়েছি দেখে, ব্যস্ত হয়ে মেজবউদিদি বললেন, "ঠাকুরপো, ঝিল্লু এসে গেছে, মিনিট-দশেকের মধ্যে চা হয়ে যাবে, চ-খাবার খেয়ে তারপর যেয়ো।"

আমি তখন বাইরের দিকে পা চালিয়েছি; যেতে যেতে ফিরে না চেয়েই বললাম, "তোমার চা-খাবার অপেক্ষা করবে, কিন্তু শ্রীমান্ তুষার হয়তো অপেক্ষা করবে না। অতএব দশ মিনিটও বিলম্ব করা নয়।"

ম্যালে উপস্থিত হয়ে দেখি, সকলেই বিস্মিত পুলকিত, সকলেরই মুখে হাসি। ঝিরঝির ক'রে নিঃশব্দে তুষারপাত হচ্ছে, চিনির মতো গুঁড়ো গুঁড়ো। গায়ের কাপড়ের খাঁজে পড়লে আটকে থাকে; ঝেড়ে ফেললে নিঃশেষে ঝ'রে যায়, পশ্চাতে গাত্রবস্ত্রের উপর কিছুমাত্র আর্দ্রতা রেখে যায় না,—একেবারে ঝরঝরে শুকনো তুষার।

তুষারপাত অবশ্য হচ্ছিল, কিন্তু নিতান্তই পিত্তরক্ষার মাত্রায়; প্লেনে চ'ড়ে একটা শহরের উপর দিয়ে উড়ে গেলে যেমন সে শহরটা দেখেছি বলাও চলে না, দেখি নি বলাও যায় না—কতকটা সেই ধরনের। অবশ্য, তুষারপাত দেখেছি—এর দ্বারা সে গল্প করা চলবে, কিন্তু তা নিয়ে দর্প করা চলবে না।

কিন্তু এ সকল কথা গৌণ,—আসল কথা হচ্ছে, নবেম্বর মাসে তুষারপাত হয়েছে। এর সম্ভাব্যতা নিয়ে অপর পক্ষের নিকট আমাকে এত ঠাট্টা-পরিহাস পরিপাক করতে হয়েছিল যে, এখন যদি আমি দাবি

করি, এ ঘটনা আমার ইচ্ছাশক্তির প্রভাবেই ঘটেছে, তাহ'লে অপর পক্ষকে নিশ্চয়ই একটু বিপন্ন হতে হয়। ইচ্ছা হ'ল, বিশেষ ক'রে যে দু-চার জন বন্ধু আমার প্রদীপ্ত কামনার উত্তপ্ত দেহে পরিহাসের শীতল জল ছিটিয়েছিল, তাদের আড্ডায় একটু গিয়ে বসি; কিন্তু তুষার দেখার লোভে যে চা এবং খাবারকে অবহেলার সহিত পিছনে ফেলে এসেছিলাম, তারই আকর্ষণে বাড়ির দিকেই অগ্রসর হলাম।

রাত্রে ঝিল্লুর মুখে শুনলাম, জ্যাকো পাহাড়ের উপর জোর বরফ পড়েছে। এত ঘন হয়ে পড়েছে যে, সাত দিনেও বোধ হয় তা বিগলিত হয়ে নিঃশেষ হবে না। জ্যাকোর শীর্ষদেশ সিমলা শহরের সাধারণ স্তর হতে অনেক উচ্চ,—যতদূর মনে পড়ছে ৮০০ ফুট।

পরদিন প্রত্যুষে তাড়াতাড়ি চা-পান শেষ ক'রে জ্যাকোর উপর উঠে দুটি ব্যাপার দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম;—প্রথমত সুবিস্তৃত এবং সুগভীর তুষারপাত; এবং দ্বিতীয়ত আলগা তুষার দু হাত তুলে নিয়ে নিয়ে তাল পাকিয়ে সাহেব-মেমদের তুষারকন্দুক (snowball) খেলা। এই খেলাটি তাদের নিজ দেশের অতিশয় প্রিয় খেলা, এবং এ খেলার সুযোগও তথায় প্রচুর।

ভারতবর্ষের সমতলভূমিতে এ খেলার প্রশ্নই ওঠে না; একমাত্র সু-উচ্চ শৈলনিবাসগুলিতে এর সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত যে সময়ে তুষারপাত হয়, তার পূর্বেই নিম্নভূমিতে বহু সাহেব-মেমকে নেমে আসতে হয় ব'লে অনেকের ভাগ্যেই সে সুযোগ দেখা দেয় না। নবেম্বর মাসের প্রথম দিকে অধিকাংশ সাহেব-মেম সিমলা শহরে অবস্থান করে ব'লে আজ জ্যাকো পাহাড়ের উপর ইয়োরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকার এমন কি প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধার আমদানি তাজ

রকমই হয়েছে। যে অংশে আমি উপস্থিত হয়েছিলাম, সেখানে অন্তত শ-দেড়েক ইয়োরোপীয় তুষার-বল খেলায় মত্ত।

রাশি রাশি তুষার কাছে প'ড়ে আছে, দু হাত দিয়ে তার খানিকটা তুলে নিয়ে একটু চাপ দিয়ে বলের মত ক'রে পরস্পর পরস্পরকে ছুঁড়ে মারছে, আর সঙ্গে সঙ্গে উগ্র কৌতুকের একটা উচ্ছল হাস্যধ্বনিতে পর্বতের চতুর্দিক চকিত হয়ে উঠছে। আঘাত করার স্থান-অস্থানের কোন বিচার নেই,—বুক, পিঠ, মাথা, মুখ, কান, গাল—যেখানে যে সুবিধা পাচ্ছে, সেখানেই মারছে। দেখতে দেখতে এইটুকু কিন্তু লক্ষ্য করলাম, পুরুষেরা স্ত্রীলোকদের মুখে বল ছুঁড়ে আঘাত মারছে না; আর স্ত্রীলোকেরা আঘাত করছে সুবিধামাফিক একমাত্র পুরুষদের মুখেই; পুরুষেরা নিজেরাই এই সুবিধার যোগান দিচ্ছে স্ত্রীলোকদের মুখপদ্মের প্রতি নিজেদের সাগ্রহ দৃষ্টি নিয়োজিত ক'রে। যে পুরুষ যত কঠিন বলের দ্বারা স্ত্রীলোক কর্তৃক আহত হচ্ছে, সে নিজেকে তত অনুগৃহীত মনে ক'রে তত উচ্ছ্বসিত হাস্যের দ্বারা সে কথার প্রমাণ দিচ্ছে। অবশ্য এক-আধবার পুরুষকেও স্ত্রীলোকের মুখে তুষার-বল ছুঁড়ে মারতে যে দেখলাম না তা নয়; কিন্তু মনে হয়, সে সকল স্থলে পরস্পরের প্রতি ঘনিষ্ঠতার মাত্রা কিছু বেশি এবং আলগা চাপের সাহায্যে প্রস্তুত স্নো-বলের কাঠিন্য কিছু কম।

নিশ্চিন্ত চিত্তে পুলকিত মনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অদৃষ্টপূর্ব অপরূপ তুষারক্রীড়া দেখছিলাম, এমন সময়ে অকস্মাৎ অতর্কিতে পিছন দিক থেকে সজোরে একটা স্নো-বল এসে আমার ঘাড়ে লেগে চূর্ণ হয়ে গেল। বলটি আলগা চাপের নয়, বেশ কঠিন। এই অনাশঙ্কিত আঘাতের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না, সুতরাং দেহে না হ'লেও মনে মনে বেশ একটু চমকে উঠলাম। ভয় হ'ল, অনধিকার প্রবেশের জন্য এ হয়তো

অপরাধীর প্রতি বহির্গমনের নোটিস। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে মন কিন্তু খুশিতে ভ'রে উঠল। আঘাতকারী একটি পনের-ষোল বৎসর বয়সের সুশ্রী ইংরেজ-বালক হাস্যকুঞ্চিত চক্ষে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে। ঢিল মেরে পাটকেলটি খাবার প্রত্যাশায় অর্থপূর্ণভাবে তার পিঠখানার অপরূপ ভঙ্গী। আঘাত খাবার জন্যে এমন সুস্পষ্ট আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলাম না,—মুহূর্তের মধ্যে দু হাত দিয়ে একরাশ শুকনো তুষার তুলে নিয়ে চাপ দিয়ে বল প্রস্তুত ক'রে বালকটির পিঠ লক্ষ্য ক'রে সবেগে ছুঁড়লাম। আঘাত থেকে পরিত্রাণ পাবার ভান ক'রে বালকটি একটু স'রে যাবার ভাব দেখালে,—কিন্তু আমার বলটি দ্রুতবেগে তার পাঁজরায় লেগে চূর্ণ হয়ে গেল। আহত বালক এবং তার আশপাশের কয়েক ব্যক্তি এমন উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল যে, আমার মনের মধ্যে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না, একজন বিজাতীয় কালা-আদমিকে শ্বেতাঙ্গেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের জাতীয় খেলায় যোগ দিতে আমন্ত্রিত করেছে এবং সে কালা-আদমি তাদের আঘাতের পাল্টা দেওয়াতে খুশিই হয়েছে। এ উদারতা তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি নয়, শুধু একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের অত্যুগ্র আনন্দে সাময়িকভাবে তাদের হৃদয়ের লৌহ-দরজা উন্মুক্ত হওয়ার ফলে এমন হতে পেরেছে।

সে যাই হোক, সোৎসাহে আমি তুষারকন্দুক ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হলাম এবং আমার দেখাদেখি আরও কয়েকজন কালা-কাদমি সে খেলায় যোগ দিলে। এক সময়ে আমরা চার-পাঁচ জন ভারতবর্ষীয় এক পক্ষে এবং অপর পক্ষে চার-পাঁচ জন ইয়োরোপীয় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুর্দান্ত তুষারগোলা-রণে প্রবৃত্ত হলাম।

এ বিষয়ে একটা কথা বলবার আছে। আমাদের সঙ্গে স্নো-বল

খেলায় ইয়োরোপীয় মেয়েদের কোনো অংশ ছিল না। তাদের মধ্যে একজনও বল ছুঁড়ে আমাদের আঘাত করে নি; পক্ষান্তরে আমরা তো নিঃসন্দেহ করি নি। অত অবারিত আনন্দের মুখেও এ দুটি দলের মধ্যবর্তী পাষাণ-প্রাচীর অভগ্ন অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল।

বাড়ি যখন ফিরলাম, তখন বেলা বারোটা বেজে গেছে। আমার ঐকান্তিক কামনার প্রতি কর্ণপাত ক'রে ভগবান যে প্রচুর অনুগ্রহ দেখিয়েছেন, তার জন্ম মনের মধ্যে কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। দেনা-পাওনার কারবার শেষ ক'রে মনে মনে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

কিন্তু তখনো বিধাতা-পুরুষের অনুগ্রহশালায় আমার জন্য যে ব্যবস্থাটুকু বাকি ছিল, এবার তার কাহিনী বলি।

নবেম্বর মাসে তুষারপাত দর্শনের উদ্ভট প্রত্যাশার জন্তে যাঁরা আমার প্রতি পরিহাসপরায়ণ হয়েছিলেন, মনে মনে নিঃশব্দে তাঁদের ক্ষমা করলাম। ১১ই নবেম্বর তুষারপাতের পর তাঁরা সদলে এমন কাবু হয়ে পড়েছিলেন যে, তার ফলে মনের পক্ষে উদার না হয়ে উপায় ছিল না।

ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়েছিলাম সন্দেহ নেই, কিন্তু তৎসত্ত্বেও মনের এক দিকে একটা ক্ষীণ অনুযোগও লেগে ছিল। সেই যদি দয়া করলে প্রভু, তা হ'লে সে দয়ার মধ্যে প্রাচুর্যের অবতারণা করলে না কেন? আমরা যেটাকে প্রচুর মনে করি, তোমার কাছে তা তো প্রচুরও নয়, সামান্তও নয়; তবে ১১ই নবেম্বরের তুষারপাতের মধ্যে কৃপণতার কি অর্থ থাকতে পারে?

এ অনুযোগ অবশ্য আমার অজ্ঞ মনের কথা। বিধাতার অনুগ্রহ-শালায় তখনো আমার জন্ত কিছু ব্যবস্থার বাকি ছিল, সে কথা পূর্বেই বলেছি।

ঠিক সাত দিন পরের কথা। ১৮ই নবেম্বরের প্রত্যূষ। তখনো আমরা ঘরে ঘরে আপন আপন শয্যায় লেপ মুড়ি দিয়ে জড়পদার্থের মতো নিশ্চল হয়ে অবস্থান করছি। শীতটা কদিন থেকেই এমন জোর চেপে রয়েছে যে, জড়পদার্থের মতো অবস্থান না ক'রে উপায় নেই। লেপের মধ্যে এ-পাশ থেকে একবার ও-পাশ হয়েছ কি, কিছুক্ষণের জন্তে ঠাণ্ডা! অনড় অবস্থায় প'ড়ে থেকে পূর্বের গরম অবস্থা ফিরিয়ে আনতে মিনিট-দশেকের কম নয়।

কানের কাছে ঝিল্লুর ডাক শুনলাম, "বাবুজী!"

লেপের ভিতর থেকেই উত্তর দিলাম, "কিয়া?"

"সারা রাত বরফ গিরা, দুনিয়া সফেদ হো গিয়া!"

সত্যি না-কি!

মুহূর্তের মধ্যে লেপের আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুতপদে জানলার কাছে উপস্থিত হয়ে জানলা খুলে চোখ জুড়িয়ে গেল। ভাগ্যে তখনো সূর্যোদয় হয় নি, তাই রক্ষে! নইলে জুড়িয়ে না গিয়ে ঝলসে যেত। গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, ঘর-বাড়ি, এমন কি ক্ষুদ্রতম লতাগ্রভাগ পর্যন্ত শুভ্র নির্মল তুষারের দ্বারা মণ্ডিত। উষার স্তিমিত উদাস রশ্মি সেই তুষারের ধবল গাত্রের উপর পতিত এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হয়ে দিকে দিকে ছুটোছুটি ক'রেও নিজেকে নিমজ্জিত করবার অনাবৃত ভূমি খুঁজে পাচ্ছে না। নিরাশ্রয় আলোকের অনুগ্র প্রভায় আকাশ পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

ধরিত্রীর মহা-আসনে অধিষ্ঠিত সেই অনাবিল শুভ্রের উৎসব-লীলা দেখে জীবন ধন্য বোধ করলাম। অনন্ত রস এবং সৌন্দর্যের উৎস আদিত্যবর্ণ বিরাট পুরুষকে মনে মনে সম্বোধন ক'রে বললাম, পরিপূর্ণ প্রতীতির মধ্যে তোমাকে ধারণ করি, সে সবল মন আমার নয়। তথাপি আজকের এই অপরূপ লীলা প্রকাশের দ্বারা আমার অবিশ্বাসের মধ্যে যে সংশয় ঘটালে, সে জন্য তোমাকে প্রণাম করি। যুক্তকর কতকটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কপালে গিয়ে ঠেকল।

অবিলম্বে বেরিয়ে পড়বার জন্য তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হতে লাগলাম। মেজদাদা তখনো লেপের মধ্যে; কিন্তু আমার চলাফেরার নানাবিধ শব্দ ও গতি লক্ষ্য ক'রে তাঁর বুঝতে বাকি ছিল না, কি উদ্দেশ্য নিয়ে

আমি তৎপর হয়েছি। ঈষৎ গভীর স্বরে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই এত ঠাণ্ডায় বাইরে যাচ্ছ না ?"

মনে মনে বললাম, নিশ্চয়ই যাচ্ছি। প্রকাশ্যে বললাম, "একটু ঘুরে-ফিরে দেখে আসি,—এমন সুযোগ তো আর পাব না।"

অপ্রসন্ন কণ্ঠে মেজদাদা বললেন, "ঠাণ্ডা লাগিয়ে কঠিন রোগে পড়তে পার, সে কথা ভেবেছ ?"

বললাম, "সর্বাঙ্গ এমন ক'রে ঢেকে নিচ্ছি যাতে ঠাণ্ডা লাগবার ভয় থাকবে না। তা ছাড়া শুনেছি বরফ পড়বার সময়ে সিমলায় কোনো অসুখ-বিসুখ থাকে না; এমন কি নিউমোনিয়ার যা-কিছু ঘটনা, সবই বরফের পর গরমের প্রথম মুখে এপ্রিল-মে মাসে হয়।"

কথাটা সত্য, এবং স্বয়ং মেজদাদার মুখেও এ কথা শুনেছিলাম; সুতরাং তিনি প্রতিবাদ করতে পারলেন না। উপরন্তু, বুঝতে তাঁর বাকি রইল না, বেড়াতে যাওয়ার বিরুদ্ধে যে আপত্তিই তিনি তুলুন না কেন, যে দুরাত্মা সে বিষয়ে বদ্ধপরিকর হয়েছে, তার ছলের অসদ্ভাব হবে না।

জিজ্ঞাসা করলেন, "ফিরে আসছ কতক্ষণে ?"

বললাম, "যত শীঘ্র পারি ফিরব।"

যৎপরোনাস্তি অনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি। বোধ করি, হতাশ হয়ে মেজদাদা লেপটা টেনে মুড়ি দিলেন।

ইত্যবসরে ঝিল্লু চা ক'রে ফেলেছিল। চা ও খাবার খেয়ে সদর-দরজা খুলতে গিয়ে দেখি, চৌকাঠের বাইরে পদার্পণ করে কার সাধ্য! আমাদের বাড়ি থেকে ভূমিতে অবতরণ করতে হ'লে কয়েক ধাপ কাঠের সিঁড়ি ভাঙতে হয়। প্রত্যেক ধাপে এত উঁচু হয়ে বরফ জ'মে রয়েছে যে, সে বরফ অপসারিত না ক'রে সিঁড়িতে পদার্পণ করা একেবারেই

নিরাপদ নয়। ঝিনুকে ডেকে কোনোপ্রকারে বরফ সরিয়ে তারপর অবতরণ করলাম।

পথ পরিপূর্ণভাবে তুষারে আবৃত। তুষার মাড়িয়ে মাড়িয়ে লাঠির সাহায্যে সন্তর্পণে সামান্য একটু চড়াই ভেঙে কার্ট রোডে উঠলাম। প্রশস্ত ও বিস্তৃত কার্ট রোডের দুই দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও একটু অনাবৃত ভূমি অথবা অপর কোনপ্রকার মলিনতার চিহ্ন নেই। ঠিক যেন এক স্রোতোহীন নিস্তরঙ্গ তুষার-নদী এঁকে-বেঁকে সরীসৃপ গতিতে এক দিক থেকে অপর দিকে চ'লে গিয়েছে।

হঠাৎ বরফের উপর একটা ব্যাপারে দৃষ্টি পড়ায় যেমন হলাম পুলকিত, তেমনি বিস্মিত। আমাদের গৃহের ঠিক সম্মুখে কার্ট রোডের উপর লাঠির সাহায্যে সুস্পষ্ট বড় বড় অক্ষরে লেখা—

"উপেনবাবু,

ছোট সিমলায় চললাম। আপনি আসুন।

—করুণা"

পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষর। নির্বাত পরিবেশ এবং অতি শুষ্ক তুষারকণা সযত্নে তাকে অবিকৃত রেখেছে। কার্ট রোডের সমস্ত প্রস্থটা লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, একটি মাত্র পদাঙ্করেখা পশ্চিম দিক থেকে এসে পূর্ব দিকে চ'লে গিয়েছে। বলা বাহুল্য, সেটি তুষারলিপি-লেখক বন্ধুবর করুণা মজুমদারের। দ্বিতীয় পদাঙ্করেখা টেনে যাব আমি।

সারা সিমলা শহর তখনো লেপের মধ্যে আড়ামোড়া ভাঙছে,—এমন কি, তুষার সরিয়ে পথচারীদের যাতায়াতের ব্যবস্থা ক'রে দেবার জন্ম ঝুড়ি ও কোদাল হস্তে মিউনিসিপ্যালিটির শ্রমিকরাও তখনো দেখা দেয় নি। বোঝা গেল, সিমলা শহরের, অন্তত কার্ট রোড অঞ্চলের

অধিবাসীদের, মধ্যে পয়লা নম্বর বাতিকগ্রস্ত করুণা মজুমদার এবং দোসরা নম্বর আমি।

আমার অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু যোগেশচন্দ্র মজুমদার সিমলা রেলওয়ে বোর্ডের কর্মচারী। করুণা মজুমদার এবং যোগেশ খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। যোগেশের মাধ্যমেই করুণা মজুমদারের সহিত আমার পরিচয়। দুজনেই পয়লা নম্বরের আড্ডাবাজ এবং অনেক বিষয়ে সমরুচির মানুষ ব'লে এই পরিচয় অচিরকালের মধ্যে প্রগাঢ় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছিল। করুণাবাবু অকৃতদার বেপরোয়া সদালাপী লোক ছিলেন। মাঝে মাঝে বুকে বেদনা ধ'রে কষ্ট পেতেন। বোধ হয় অ্যানজাইনার ব্যাধি ছিল। ঐ রোগেই তিনি অল্পবয়সে মারা যান। সিমলায় করুণাবাবু সেক্রেটারিয়েটে চাকরি করতেন, এবং বাস করতেন বড় সিমলায় কার্ট রোডের উপর গভর্মেণ্ট ব্লকে। যোগেশ বাস করত বড় সিমলা থেকে আড়াই-তিন মাইল দূরবর্তী ছোট সিমলায়।

যোগেশ আমার ভাগলপুরের বাল্যবন্ধু। ভাগলপুরে আমাদের একটি উৎকৃষ্ট বন্ধুগোষ্ঠী ছিল। খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গল্পলেখক গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র মজুমদার, সুপ্রসিদ্ধা উপন্যাসরচয়িত্রী নিরুপমা দেবীর দাদা বিভূতিভূষণ ভট্ট, কলিকাতা সায়ান্স কলেজের সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক ডক্টর শিশিরকুমার মিত্রের অগ্রজ পরলোকগত সতীশচন্দ্র মিত্র, আমি এবং আরও কয়েকজন এই গোষ্ঠীর সদস্য। এই গোষ্ঠীর মধ্য দিয়েই যোগেশের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গতা।

সুতরাং সিমলায় যোগেশ ছিল আমার প্রিয় সহচর। অনেক দিন অপরাহ্ণে ছুটির সময়ে তার অফিসে গিয়ে হাজির হতাম। ছুটি হ'লে তাকে বেশ খানিকটা এগিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরতাম। ছুটির দিনে

কখনো-সখনো যোগেশ ও আমি একত্র হয়ে জ্যাকো রাউণ্ড দিতাম। সিমলায় জ্যাকো রাউণ্ড দীর্ঘতম রাউণ্ড—মাইল সাতেকের কম নয়। লক্কড়বাজার ছাড়িয়ে মাইল তিনেক অগ্রসর হ'লে নিম্ন উপত্যকা-ভূমিতে অপূর্ব শোভা-সৌন্দর্যশালী সন্‌জৌলি অঞ্চল দেখা যায়। এই সন্‌জৌলির মনোরম ক্রোড়েই সিমলার হিন্দুদের শেষদিনের আশ্রয় মহাশ্মশান অবস্থিত।

জ্যাকো রাউণ্ড দিতে দিতে একদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প'ড়ে যোগেশ এবং আমি একটি যে কার্য করেছিলাম, তা মনে পড়লে এখনো মনের মধ্যে কৌতুক অনুভব করি। স্থানটি তখন একেবারে নির্জন, পথের দুই দিকে বহুদূর পর্যন্ত জনমানবের চিহ্ন নেই। হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল, আমরা দুজনে একের পর অন্যে আমাদের মনের গোপন কথা সমুচ্চ কণ্ঠে উন্মুক্ত বায়ুস্তরে চালান দিতে লাগলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে সমীপবর্তী পর্বত আমাদেরই সে-সকল কথা নিঃশেষে ফেরত দিতে লাগল। পাহাড়ের নিকট থেকে আমাদের মনের অতি-গোপন কথা সুস্পষ্ট স্বরে শুনতে পেয়ে অননুভূতপূর্ব আনন্দের নেশায় মত্ত হয়ে উঠলাম। কিন্তু নেশা কাটতে বিলম্ব হ'ল না। দূরে মনুষ্যমূর্তি দেখা মাত্র, আমরা আমাদের উদ্ভট খেলা পরিত্যাগ ক'রে পুনরায় পদচালনা আরম্ভ করলাম।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটি ক'রে ছেলেমানুষ বসে করে, সুযোগ পেলেই সে বেরিয়ে এসে ছেলেখেলায় লিপ্ত হয়। সেদিন আমাদের ভিতর থেকে সেইরূপ দুটি ছেলেমানুষ নির্গত হয়েছিল।

অবান্তরের প্রান্তরে বিচরণ অনেক হ'ল, এবার যা বলছিলাম তাই বলি।

মনের মধ্যে উগ্র আনন্দের স্টীম ভ'রে নিয়ে দ্রুতপদে এবং দ্রুততর

মনে ছোট সিমলার দিকে এগিয়ে চললাম। গতিশীল স্টীমারের দুই পার্শ্বে দ্বিধাবিভক্ত জলরাশি যেমন উচ্ছ্বসিত ক্রোধে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, ঠিক সেইরূপে আমার দুই পার্শ্বেও লাঠির আঘাতে উৎক্ষিপ্ত তুষাররাশি ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

খানিকটা পূর্ব-দিকে অগ্রসর হওয়ার পর যেখানে পথটা সহসা দক্ষিণ দিকে একটা তীব্র বাঁক নিয়েছে, তখনকার দিনে সেখানে একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অতি সুদৃশ্য ডাকঘর ছিল, যার শ্রুতিমধুর ইংরেজী নামটা কিছুতেই আমার মনে পড়ছে না। সেই ডাকঘরের সামনে পৌঁছে আর একটি ক্ষুদ্র তুষারলিপি দেখতে পেলাম,—

"উপেনবাবু, আসছেন তো?—করুণ."

এর পরও কোথাও 'উপেনবাবু' কোথাও বা 'করুণা' এই দুটি নাম দেখতে দেখতে অবশেষে ছোট সিমলার এলাকায় উপনীত হলাম। তখন উদিত সূর্যের কিরণচ্ছটায় ক্রমশ তুষার উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে; পথে জনসমাগমও যথেষ্ট হয়েছে।

করুণাবাবু আমার খুব বেশি পূর্বে পৌঁছন নি; কিন্তু যতটুকু আগে পৌঁছেছিলেন তারই মধ্যে তিনি উদ্যোগ-পর্বটি শেষ করিয়ে রেখেছিলেন। আমি পৌঁছলাম সৌভাগ্যের মাহেন্দ্রক্ষণে। টী-পটে তখন গরম জল এবং চা-র মধ্যে বোঝাপড়া চলেছে, আর বাড়ির ভিতর থেকে সদ্যভর্জিত মুখরোচক খাদ্যবস্তু আসতে আরম্ভ করেছে। আমার আগমনে একটা স্বতোচ্ছ্বসিত হর্ষধ্বনির দ্বারা আড্ডা সজীবতর হয়ে উঠল।

চা এবং খাবারের দ্বারা অপচিত স্টীমের পূরণ ক'রে নিয়ে ঘণ্টা-খানেক নিবিড় ও উচ্ছলভাবে আড্ডা দিয়ে আমি এবং করুণাবাবু উঠে পড়লাম। অফিসে বেরোবার সময় হয়ে আসছে। যোগেশ আমাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল,—তারও অফিসের তাড়া

আছে। করুণাবাবু এবং আমি দ্রুতপদে বড় সিমলার দিকে অগ্রসর হলাম।

পথ চলতে চলতে এক সময়ে করুণাবাবুকে বললাম, "আজ বোধ হয় অফিস যেতে আপনার একটু লেট হয়ে যাবে।"

মৃদু হেসে করুণাবাবু বললেন, "অফিসে গেলে তো লেট হবে। আজ আমার 'স্নোয়ি ডে'।

জিজ্ঞাসা করলাম, "'স্নোয়ি ডে'ও আপনাদের আছে না-কি ?"

সোচ্ছ্বাসে করুণাবাবু বললেন, "নিশ্চয়ই আছে। বৃষ্টি হ'লে 'রেনি-ডে' আছে, আর এত বড় তুষারপাতে 'স্নোয়ি ডে' নেই ? খাওয়া-দাওয়া সেরে লেপ মুড়ি দিয়ে মৌজ না ক'রে, আজ যে তুষার ঠেলে কাঁপতে কাঁপতে অফিস গিয়ে আগুন জেলে কলম পেষে তার মত অরসিক কেউ আছে কি ?"

নেই, সে বিষয়ে আমি তাঁর সঙ্গে একমত হলাম।

বড় সিমলায় পৌঁছে করুণাবাবু নিজের আস্তানার দিকে অগ্রসর হলেন ; আমি এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে দেখে-শুনে অশুভস্য কালহরণং করতে লাগলাম। মনে মনে স্থির করলাম, মেজদাদা অফিস যাওয়ার পূর্বে বাড়ি ঢুকলে দু দফা বকুনি—অর্থাৎ অফিস যাওয়ার মুখে এক দফা তাড়াতাড়ি, আর অফিস থেকে ফিরে চা-খাবার খেয়ে আর এক দফা ধীরে সুস্থে—কিছুতেই খাওয়া নয়। যা খাবার, সন্ধ্যার পর একবারেই চোকানো যাবে।

বেলা এগারোটা আন্দাজ বাড়ি ঢুকে দেখি, মেজদাদা আমার জন্য অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে অফিস চ'লে গেছেন। মেজবউদিদিকে বললাম, "অফিস থেকে এলে ওঁকে ঠাণ্ডা করা যাবে, আপাতত কুলফি বরফ খাওয়ার ব্যবস্থা কর।"

আমার প্রস্তাব শুনে তিনি তো অবাক! বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "বল কি ঠাকুরপো! এই ঠাণ্ডায় কুলফি বরফ খাবে?"

বললাম, "নিশ্চয় খাব। চতুর্দিকে রাশি রাশি বরফ প'ড়ে রয়েছে, তোমার ভাঁড়ারেও নুনের অভাব নেই। এমন সুযোগে কুলফি বরফ না খেলে কলকাতায় গিয়ে মুখ দেখানো যাবে না।"

কুলফি খাওয়ার প্রস্তাব শুনে আমার ভাইঝিরা খুব উৎফুল্ল হ'ল। ঝল্লুকে দিয়ে এক চুপড়ি বরফ আনিয়ে নিয়ে তার সঙ্গে পরিমাণ মতো লবণ মিশিয়ে ফ্রীজিং মিক্সচার ক'রে নিলাম। ছেলেবেলায় শীত ঋতুর বর্ণনায় পড়েছিলাম, জলে উঠেছে কি দাঁত, জলে উঠেছে কি দাঁত, নহে কেন ছুঁতে গেলে কেটে ফেলে হাত! আজ ফ্রীজিং মিক্সচারে হাত দিয়ে দেখি—

ওঠে নি ক দাঁত,
উঠেছে করাত!

একটা আধসেরী ঘটিতে দুধ চিনি মিশিয়ে চুপড়ির মধ্যে বসিয়েও দেওয়া, আর মিনিট দুয়েকের মধ্যে দুধ-চিনির কঠিন পাথরে পরিণত হওয়া।

ব্যাপার দেখে কৌতূহলপরায়ণ দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে উল্লাসধ্বনি প'ড়ে গেল,—কিন্তু বিপদ হ'ল পেট-ফোলা সরু-গলা ঘটির ভিতর থেকে কুলফি বার করা যায় না। আগে এ ব্যাপারটুকু খেয়াল করা হয় নি। অগত্যা, আগুনের উত্তাপে ঘটিটা ধ'রে কুলফি গলিয়ে নিয়ে কাঁসার একটা বড় টাম্‌ব্লার গ্লাসে ঢেলে পুনরায় চুবড়ির মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হ'ল। অবিলম্বে দুধ জ'মে একেবারে পাথর!

এবার সহজেই কুলফি তার আধার থেকে বেরিয়ে এসে ধীরে ধীরে কাচের প্লেটের উপর অধিষ্ঠিত হ'ল,—সাত ইঞ্চি দীর্ঘ এবং তদনুপাতে

আয়ত একটি রাম-কুলফি। সেই শুভ্র এবং নধর দেহে ছুরি চালাতে মায়া হচ্ছিল; কিন্তু লোভও হচ্ছিল কম নয়। সুতরাং সকলে মিলে পরম পরিতৃপ্তির সহিত সেই শীতল এবং সুমিষ্ট বস্তুটির সদ্ব্যবহার করা গেল।

আমাদের এই কুলফি খাওয়ার কাহিনী সিমলার বাঙালী মহলে বেশ একটু পুলক এবং কৌতুকের সৃষ্টি করেছিল।

দিন-তিনেক পরে একটা ছুটির দিনে বরফের উপর শুয়ে ব'সে, সর্বাঙ্গে বরফ ছড়িয়ে, দুই হাতে তুষারকন্দুক ধারণ ক'রে, আমরা কয়েক বন্ধু মিলে অতি কৌতুকাবহ কয়েকটি ফোটো তুলেছিলাম। করুণাবাবু, যোগেশ, করুণাবাবুর ভাই শিশির, আমি এবং আর একটি বন্ধু, যার নাম উপস্থিত মনে পড়ছে না—এই পঞ্চ পাণ্ডবে মিলে সেই ফোটোগুলি রচিত হয়েছিল। ভীষণ বিহার ভূমিকম্পের ফলে ভাগলপুরে আমার ফোটোগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যোগেশচন্দ্র পেন্‌শন নিয়ে উপস্থিত দিল্লীতে বাস করছেন,—তাঁর কাছে থাকলেও থাকতে পারে।

বিহার ভূমিকম্পের সময়ে আমি অবশ্য কলিকাতায় ছিলাম। কিন্তু উক্ত ফোটোগুলি অন্যান্য বহুতর মূল্যবান জিনিসের সঙ্গে রাজা শিবচন্দ্রের গৃহে একটি বৃহৎ কাঠের সিন্দুকের মধ্যে বন্ধ ছিল।

শিমলা পাহাড়ের তুষারপাতের কথা বলতে গিয়ে সেখানকার আর একটা কাহিনীর কথা মনে প'ড়ে গেল। ব্যাপারটা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর এক অভিজ্ঞতার হাল্কা কথা; কিন্তু আমার জীবনে ঠিক সে ধরনের অভিজ্ঞতা একাধিক বার ঘটেছে ব'লে মনে পড়ে না। হরিষে বিষাদ ব'লে একটা কথা প্রচলিত আছে। যে কাহিনী বলতে উদ্যত হয়েছি, তা হরিষে বিষাদেরই এক ঘটনা। সাধারণত যে সব ক্ষেত্রে আমরা 'হরিষে বিষাদ' কথা প্রয়োগ করি, সেখানে হর্ষ এবং বিষাদের দুটি স্বতন্ত্র কারণ পাশাপাশি একসঙ্গে উদিত হওয়ায় আমাদের মনে যুগপৎ হর্ষ এবং বিষাদের অবস্থা নিয়ে আসে। কিন্তু এই দুটি স্বতন্ত্র কারণের অস্তিত্ব পূর্ব হতেই জানা থাকে ব'লে উভয়ের একসঙ্গে মিলিত হবার আঘাতটা আকস্মিক না হওয়ার দরুন ততটা তীব্র হতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যেতে পারে, পিতার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কন্যার বিবাহ অনুষ্ঠিত হওয়ার ঘটনা। দুঃখ সম্পূর্ণভাবে অপসৃত হতে না হতেই আনন্দের কারণ উপস্থিত হয়েছে। সেদিন আত্মীয়স্বজনের মনে হরিষে বিষাদের অবস্থা।

আমার ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা একটু পৃথক রকমের হয়েছিল। যে চকমকি হর্ষের দীপ্তি উৎপাদন করেছিল, বিষাদের দাহও উৎপন্ন করেছিল সেই একই চকমকি। আর, একটি আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই অপর আঘাতটা ঘটেছিল ব'লে আঘাতের বেদনাও হয়েছিল অত্যন্ত তীব্র।

যে সময়কার কথা বলছি, তখনকার দিনে কলিকাতা টার্ফ ক্লাবের ডার্বি-লটারির প্রথম পুরস্কারের পরিমাণ সারা জগতের আকাঙ্ক্ষা, লোভ

এবং বিস্ময়ের বস্তু ছিল। কোনও কোনও বৎসরে প্রথম পুরস্কারের তায়দাদ চল্লিশ লক্ষ টাকাও অতিক্রম ক'রে যেত। পৃথিবীর আর কোনও দেশের লটারির প্রথম পুরস্কার বোধ হয় এত অধিক ছিল না; সেইজন্য প্রত্যেক দেশের এবং জাতির লোক ক্যালকাটা টার্ফ ক্লাবের লটারির টিকিট ক্রয় ক'রে কিছুদিন ধ'রে ঐশ্বর্যের স্বপ্ন দেখত।

প্রথম পুরস্কারের কথা তো ছিল বিপুল ঐশ্বর্যের কথা। প্রথমেতর পুরস্কারও যারা লাভ করত, তারাও নিজেদের ভাগ্যবান ব'লে বিবেচিত করত। এমন কি, যার টিকিটের ঘোড়া শেষ পর্যন্ত নন-স্টার্টার হ'ত, তার ভাগ্যেও আট-দশ হাজার টাকা এসে জুটত। যে সকল ঘোড়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করে, কিন্তু কোনও কারণে শেষ পর্যন্ত ঘোড়দৌড়ে শরিক হতে পারে না, তাদের নন-স্টার্টার বলে। এ কথা অবশ্য সকলেরই জানা আছে, ডার্বি রেস হয় বিলাতে, কিন্তু তার ফলাফলের উপর কলিকাতার টার্ফ ক্লাব এবং নানান দেশের নানা প্রতিষ্ঠান পুরস্কারের লটারি চালায়।

প্রতিযোগিতায় ঘোড়ার প্রবেশ লাভের শেষ তারিখ উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর এবং ঘোড়দৌড়ের তারিখের কিছুদিন পূর্বে, লটারি টানা হয়। এই লটারি ঠিক কি পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়, তা হয়তো আমার জানা নেই; কিন্তু মোটামুটি সাধারণ লটারির যে পদ্ধতি, সেই পদ্ধতিই অনুসৃত হয়। যতগুলি ঘোড়া প্রতিযোগিতায় প্রবেশ করেছে ঘোড়ার নামসমন্বিত ততগুলি টিকিট থাকে এক দিকে; অপর দিকে থাকে ভাগ্যান্বেষীদের নামাঙ্কিত আবর্তিত এবং ওলটপালট করা টিকিটের রাশি। এক দিক থেকে একটি ক'রে ঘোড়ার টিকিট নেওয়া হয় এবং অপর দিক থেকে একটি ক'রে মানুষের টিকিট। যে সৌভাগ্যবানের নামে যে ঘোড়ার নাম উঠল, সে হ'ল সেই ঘোড়ার ফলাফলের অধিকারী।

অর্থাৎ ঘোড়দৌড়ের দিন সে ঘোড়া যেরূপ কৃতিত্ব দেখাবে, তদনুসারে সে ঘোড়ার টিকিটের অধিকারীও পুরস্কার লাভ করবে।

টিকিট ওঠা এবং ঘোড়দৌড়ের দ্বারা সে টিকিটের পরিণতি নির্ণীত হওয়ার মধ্যে সময়ের যেটুকু ব্যবধান, তার মধ্যেও টিকিটের ঘোড়া যদি তেমন জোর নামজাদা (hot favourite) কোনো ঘোড়া হয়, তা হ'লে তার ওপর ফটকা চলতে থাকে।

ধরুন, নরেন বসু নামে কোনও ভদ্রলোকের নামে ফ্লাইং ফক্স্ ঘোড়া উঠেছে। বাজারে ফ্লাইং ফক্সের উপর প্রথম পুরস্কার লাভের জোর প্রত্যাশা। ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় ফ্লাইং ফক্স যদি প্রথম স্থান অধিকার করে, তা হ'লে নরেনবাবু লাখ চল্লিশের কাছাকাছি একটা বিপুল অর্থের অধিকারী হন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও কারণে ফ্লাইং ফক্স যদি দৌড়ে নামতেই অসমর্থ হয়, তা হ'লে মাত্র আট-দশ হাজার টাকার ওপর দিয়েই তাঁর ভাগ্যের দৌড় অবসিত হবে। এই চল্লিশ লক্ষ এবং আট হাজারের মধ্যবর্তী যে অনিশ্চয়তা, সেই অনিশ্চয়তার উপরই ফটকার অবকাশ।

এই অনিশ্চয়তার সুযোগ নিয়ে হয়তো মুরলীধর ঝুনঝুনওয়ালা নরেন-বাবুর কাছে উপস্থিত হয়ে দু'লক্ষ টাকা দিয়ে টিকিটের স্বত্ব ক্রয়ের প্রস্তাব করলেন। ফ্লাইং ফক্স যদি প্রথম না হয়ে দ্বিতীয়-তৃতীয়ও হয়, তা হ'লেও অনেক টাকাই তার লাভ; আর যদি দুর্ভাগ্যক্রমে অদৃষ্টে নন্-স্টার্টারই থাকে, তা হ'লে বেশ কিছু টাকা লোকসান। কিন্তু লোকসানের ঝুঁকি না নিলে লাভের সম্ভাবনাও থাকে না। অনিশ্চয়তার লতায় লাভ-লোকসানের মধু এবং কণ্টক দুইয়েরই আশ্রয়।

নরেনবাবুর দিকে বিচারশীলতার, বিচক্ষণতার কথা। অধ্রুব চল্লিশ লক্ষের লোভে ধ্রুব দুই লক্ষ যদি হারাতে হয়, তা হ'লে পরে অনুশোচনা

রাখবার জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না। অথচ চল্লিশ লক্ষের সম্ভাবনাকে একেবারে বিসর্জন দিয়ে দুই লক্ষকেই বা বরণ করা যায় কি প্রকারে? তখন হয়তো তিনি দু কূল রক্ষার অভিপ্রায়ে একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করলেন। দর-কষাকষি ক'রে সমগ্র টিকিটের মূল্য চার লক্ষ টাকায় তুললেন, আর আধখানা টিকিটের স্বত্ব বিক্রয় করিলেন দু লক্ষ টাকায়। তার ফলে হালফিল দু লক্ষ টাকা ঘরে উঠল, ফাউস্বরূপ আরও চার-পাঁচ হাজার তো ঘোড়দৌড়ের পর আর একদিন উঠবেই, অধিকন্তু আরও লাখ বিশেক টাকা পাওয়ার সম্ভাবনাও হাতে রইল।

কিন্তু এত বুদ্ধি খাটিয়েও নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। ঘোড়দৌড়ের কাছাকাছি প্রতিদিন খবরের কাগজে ফ্লাইং ফক্স এবং অপরাপর নামজাদা ঘোড়ার বিবরণ প্রকাশিত হয়। দৌড়ের ঠিক পূর্ব দিনের কাগজে ফ্লাইং ফক্সের স্বাস্থ্য, ওজন, মেজাজ, গতিবেগ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হ'ল, তাতে তার প্রথম স্থান অধিকার করবার সম্ভাবনা ষোল আনাই বলা চলে; দ্বিতীয় ফেভারিট ইভনিং স্টারের মোট যোগ্যতার নিরিখ অনেক নিম্নে। বেলা বারোটা আন্দাজ নরেনবাবুর কাছে সুরজলাল ঢনঢনিয়া এসে হাজির হলেন,—"বাবুজী, আপনার আধখানা টিকিট আমাকে চার লক্ষ টাকায় বিক্রি করুন।"

পুনরায় নরেনবাবু ধ্রুব ও অধ্রুবর সমস্যার দ্বারা পীড়িত হয়ে উঠলেন। চার লক্ষ টাকাকে গ্রহণ ক'রে মোট লাভের পরিমাণ ছয় লক্ষে দাঁড় করাবেন, অথবা মনে মনে 'বিশ লাখ রূপেয়া দিলা দেও রাম' প্রার্থনা ক'রে দ্বারপ্রান্ত থেকে চার লক্ষ টাকাকে বিদায় দেবেন—এই হ'ল সমস্যা। রাতারাতি ষোল লক্ষ টাকার সুবিধা করতে এসে ঢনঢনিয়া কী নরেনবাবুকে রাতারাতি ষোল লক্ষ টাকার অসুবিধায় ফেলবার উপক্রম করেছেন।

নরেন বসু, ঝুনঝুনওয়ালা, ঢনঢনিয়ার গল্পটা অবশ্য কাল্পনিক; কিন্তু আমি যে কালের কথা বলছি, যখন কলকাতা টার্ফ ক্লাবের ডার্বি-লটারি-সূর্য মধ্যগগনে অবস্থিত, যে সময়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা থেকে চল্লিশ লক্ষ টাকার মধ্যে ওঠা-নামা করত, সে সময়ে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঘোড়াগুলির উপর ঐভাবেই জনপ্রিয় ফটকা খেলা চলত। আমার মনে পড়ে, অন্তত একবার টার্ফ ক্লাবের ডার্বির প্রথম পুরস্কারের মূল্য চল্লিশ লক্ষ টাকা অতিক্রম ক'রে গিয়েছিল। পরে ডার্বি লটারিকে অধিকতর জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে একটি প্রথম পুরস্কারকে ভাগ ক'রে তিনটি অথবা চারটি সমমূল্যের প্রথম পুরস্কার করা করা হয়। পরে টার্ফ ক্লাবের অবনতির সহিত ডার্বি পুরস্কারের মূল্যও অনেক কমে গিয়েছিল।

ডার্বির টিকিট পৃথিবীর অন্যান্য দেশের লোকেরাই বেশি কিনত, সে কথা অবশ্য সত্য; কিন্তু ভারতবর্ষে দেশীয় লোকের মধ্যেও সংখ্যা কম ছিল না। বাঙালীদের মধ্যেও বহু ক্রেতা ছিল। কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন বিশ্ববিখ্যাত অ্যাডভোকেট সার্ রাসবিহারী ঘোষ বিশ বৎসর যাবৎ নিয়মিতভাবে প্রতি বৎসর দুখানা ক'রে ডার্বি টিকিট কিনে আসছিলেন, যদিচ কোনো বৎসর তাঁর অদৃষ্টে সামান্যতম পুরস্কারও জোটে নি। একদিন হাইকোর্টের উকিলদের লাইব্রেরিতে জনৈক উকিল সার্ রাসবিহারীকে প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, আপনি তো কোনো বৎসর একটা সামান্য পুরস্কারও পান না, তবু প্রতি বৎসর টিকিট কেনেন কেন? তা ছাড়া আপনার আর টাকার দরকারই-বা কি?" উত্তরে সার্ রাসবিহারী বলেছিলেন, "ওহে, আমি তো টাকার জন্যে টিকিট কিনি নে,—কিনি আনন্দের জন্যে। টিকিট কেনার পর কিছুদিন মনটা যে-পরিমাণ প্রফুল্ল থাকে তার মূল্য কুড়ি টাকার অনেক বেশি।"

টাকার প্রয়োজনে টিকিট না কিনেও সার্ রাসবিহারীর মন কিছুদিন প্রফুল্ল হয়ে থাকত; কিন্তু টাকার প্রয়োজনেও যারা টিকিট কিনত, তাদের মন সেই সময় থাকত উৎফুল্ল হয়ে। আমার মেজদাদা রমণী-মোহন ছিলেন সেই দলের মানুষ। তিনি প্রতি বৎসর টিকিট কিনতেন, এবং টিকিট কেনার দিন থেকে ড্রইং হওয়ার দিন পর্যন্ত শুধু নিজেই উৎফুল্ল হয়ে থাকতেন না, সমস্ত পরিবারকে উৎফুল্ল ক'রে রাখতেন। তাঁর এই উৎফুল্ল হওয়া আর উৎফুল্ল করা ছিল অবশ্য চল্লিশ লক্ষ টাকার ভিত্তিতে। স্বপ্নই যদি দেখতে হ'ল, তা হ'লে চল্লিশ লক্ষ টাকার না দেখে আট-দশ হাজার টাকার দেখার কোনো অর্থ হয় কি? কৃপণতা কোন ক্ষেত্রেই সমর্থনীয় নয়, কল্পনা-বিলাসের ক্ষেত্রে তা নিঃসন্দেহ অপরাধ।

টিকিট কেনার দিন থেকেই স্বপ্ন দেখা আরম্ভ হয়ে যেত, কিন্তু যেমন-যেমন ঘোড়া ওঠার দিন এগিয়ে আসত—স্বপ্ন দেখার আড়ম্বর, বোধ করি গুণোত্তর হিসাবেই তেমনি বেড়ে উঠতে থাকত। যে বারের কথা বলছি, সেবার আমি সিমলায় বেড়াতে গিয়াছিলাম। অফিস থেকে আসার পর চা-খাবার খেয়ে সকলকে নিয়ে জাঁকিয়ে ব'সে কতকটা নিম্নলিখিতভাবে মেজদাদা স্বপ্ন দেখতে এবং দেখাতে আরম্ভ করতেন।

লটারির ফলে ঘোড়া উঠলে ঝুনঝুনওয়ালা-টনটনিয়াদের কিছুতেই আমল দেওয়া হবে না; সৌভাগ্যের যে দ্বার অদৃষ্টপুরুষ নিজ হাতে খুলতে আরম্ভ করেছেন, তাকে সর্বতোভাবে অবারিত করতে হবে, লোভে প'ড়ে তার একখানা পাল্লা রুদ্ধ করলে নিজের হাতে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা হবে। ব্যাঙ্ক এবং অ্যাটর্নির মারফৎ টার্ফ ক্লাব থেকে টাকাটা পাওয়া গেলে অফিসে গিয়ে চাকরিতে ইস্তফা দেওয়া; সাহেবেরা অবশ্য চাকরি না ছাড়বার জন্যে পীড়াপীড়ি করবে, কিন্তু কিছুতেই রাজী

হওয়া নয়,—যে কারণে চাকরি করা তাই যখন বিপুল পরিমাণে হস্তগত হ'ল, তখন অপর একজনের স্থান জুড়ে আর কেন অকারণ ব'সে থাকা? অফিসের আরদালি, দফ্‌তরি, ঝাড়ুদার, জমাদার, চাকর-বাকরদের হাজার খানেক টাকা বকশিশ দিয়ে, বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনকে একটা বড় রকম বিদায়ভোজে আপ্যায়িত ক'রে প্রথম শ্রেণীর ব্যবস্থা অবলম্বনে কাশীধামে উপস্থিত হওয়া, সেখানে হাজার এক টাকা ব্যয়ে বাবা বিশ্বনাথের পূজা দিয়ে কলিকাতা যাত্রা।

এইখানে হয়তো আমি আপত্তি তুলে বলতাম, "বাবা বিশ্বনাথের পুজোয় গোটা পঞ্চাশেক টাকা খরচ ক'রে বাকি ন শো একান্ন টাকা গরিব-দুঃখীকে দান করা ভাল।"

আমার এ কথার প্রতিবাদ ক'রে মেজবউদিদি হয়তো বলতেন, "গরিব-দুঃখীদের দানে না-হয় হাজার টাকাই পুরিয়ে দাও ঠাকুরপো, কিন্তু দেবতার টাকা কমিও না।"

উত্তরে আমি হয়তো বলতাম, "দেবতার টাকা তো কমাচ্ছি নে, কমাচ্ছি মানুষের টাকা, পাণ্ডার টাকা।"

এই নিয়ে হয়তো একটু বাদ-প্রতিবাদও হয়ে যেত।

তারপর আরম্ভ হ'ত কলকাতার কাহিনী। কলকাতায় পৌঁছে সাধারণ দাতব্য বিষয়ে লাখ খানেক টাকা দান; লাখ খানেক টাকা দুঃস্থ আত্মীয়বর্গের আর্থিক উন্নতিকল্পে প্রয়োগ; কলকাতায় তিন ভাইয়ের নামে তিনখানা বাড়ি খরিদ; সিমলা দার্জিলিং ও পুরীতে আপাতত আরও তিনখানা প্রবাস-যাপনের জন্য।

এরূপ বহুতর কল্পনা-জল্পনা, প্রস্তাব-প্রতিপ্রস্তাব, বাদ-প্রতিবাদ চলতে চলতে অবশেষে একদিন ড্রয়িং হবার দিন উপস্থিত হ'ল। সন্ধ্যার পর কলকাতায় টার্ফ ক্লাবের লটারির দ্বারা টিকিট-ক্রেতাদের ভাগ্য

নির্ণীত হবে। সর্বশ্রেষ্ঠ চার-পাঁচটা ঘোড়া যে ভাগ্যবানদের নামে উঠবে, আর্জেন্ট টেলিগ্রামের দ্বারা তাদের আজই সুসংবাদ দেওয়া হবে।

মেঘসঞ্চয়ের কাল গত হয়েছে, আজ বৃষ্টিপাতের দিন। সকাল থেকে সকলের মনের আকাশ প্রত্যাশার বেগে চকিত হয়ে উঠেছে। এতদিন যে জিনিস কল্পনা-জল্পনা হাস্য-পরিহাসের বস্তু ছিল, আজ তা সকলের মনে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। এতদিনকার ফুল আজ ফলে পরিণত হবে। সে ফল মধুর রস দান করবে, অথবা তিক্ত?—তাই হচ্ছে আজকের প্রশ্ন।

সন্ধ্যার পর মেজদাদা চা-খাবার খেয়ে শয্যায় গিয়ে ব'সে আবার আমাদের অল্প স্বল্প স্বপ্ন দেখাতে আরম্ভ করলেন; বললেন, "বিশ্বাস হারিও না তোমরা। এবার নির্ঘাত ঘোড়া উঠবে আমাদের টিকিটে। আটটার সময়ে ড্রয়িং শেষ হবে, নটার সময়ে টেলিগ্রাম করবে, মিনিট কুড়িকের মধ্যে সে টেলিগ্রাম সিমলায় এসে পৌঁছবে—আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছতে বড়জোর আরও মিনিট দশেক। অর্থাৎ সাড়ে নটা আন্দাজ আমরা টেলিগ্রাম পাচ্ছি।"

রাত্রি সওয়া নটার সময়ে আমরা আহারে বসলাম। মেজদাদা বললেন, "ঘোড়া যদি উঠে থাকে আমাদের টিকিটে, তা হ'লে এতক্ষণে সিমলা টেলিগ্রাম-অফিসে আমাদের টেলিগ্রাম নিশ্চয় পৌঁছেছে।"

অফিস থেকে আসার পর মেজদাদা কিছুক্ষণ একটু চুপচাপ হয়ে ছিলেন;—প্রত্যাশার উদ্বেগ হয়তো তাঁকে একটু গুমিয়ে দিয়েছিল। এখন কিন্তু যে কারণেই হোক পুনরায় স্ব-মেজাজে ফিরে এসে তাঁর আপন ভঙ্গীতে রঙ চড়িয়ে কথা কইতে আরম্ভ করেছেন। হয়তো বা মনে মনে হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ব'লেই ব্যাপারটাকে সরস ভঙ্গীর মধ্য দিয়ে হাল্কা ক'রে দেবার মতলব।

মিনিট-দুয়েক পরে মেজদাদা বললেন, "আমাদের টেলিগ্রাম যদি এসে থাকে, পিয়ন তা হ'লে এতক্ষণ হনহন ক'রে আমাদের বাড়ির দিকে এগিয়ে আসছে।"

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ পুলকিত হয়ে হেসে উঠলাম বটে, কিন্তু মেজদাদার কথা বলার স্বর ও ভঙ্গীর গুণে একজন দ্রুত-আগমনশীল পিয়নের মূর্তি আমাদের চক্ষের সম্মুখে যেন স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

পুনরায় মেজদাদা বললেন, "হাসছ বটে, কিন্তু বকশিশ পাওয়ার লোভে পিয়ন যে রকম তাড়াতাড়ি আসছে, মিনিট দুয়েকের মধ্যে আমাদের বাড়ির কড়া ন'ড়ে উঠবে।"

এ যে মেজদাদার বিশ্বাসের কথা নয়—পরিহাসের কথা, তা বুঝতে আমাদের ভুল হচ্ছিল না। সহাস্যমুখে মেজবউদিদি বললেন, "তোমার পিয়নের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে।"

দু মিনিট তো হয়ে গেলই, সাড়ে নটাও বেজে গেল। ঈষৎ নৈরাশ্য-সহকারে মেজদাদা বললেন, "তাই তো!' এবারও অন্যবারের মতো ভেস্তে গেল নাকি?"

এ কথাও বলা, আর সঙ্গে সঙ্গে সদর-দরজায় কড়া ন'ড়ে ওঠা—খটাখট্ খটাখট্।

তড়িৎস্পৃষ্টের মতো আমরা সকলে একযোগে চকিত হয়ে উঠলাম। কি ব্যাপার?

মুহূর্ত পরেই পুনরায় খটাখট্ খটাখট্ শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক, "তার হ্যায় বাবু!"

একটা অস্ফুট কিন্তু সমবেত উল্লাস-রব ধ্বনিত হয়ে উঠল। মেজবউ-দিদি বললেন, "ঐ! এসে গেছে তা হ'লে!"

একটা সুদৃঢ় প্রতীতি সকলের মনে জাগ্রত হয়ে দেখা দিলে।

কড়া নড়ার শব্দ শুনেই ভৃত্য ছুটে গিয়েছিল, অবিলম্বে একটা টেলি-গ্রামের খাম এনে মেজদাদার হাতে দিলে। সেই পীতাভ খামের নয়নাভিরাম মূর্তি দেখে সকলের চক্ষু জুড়িয়ে গেল। ইত্যবসরে মেজদাদা গেলাসের জলে হাত ধুয়ে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছেন, ভৃত্যের হাত থেকে তাড়াতাড়ি খামখানা নিয়ে কম্পিত হস্তে ছিঁড়তে আরম্ভ করলেন।

এদিকে আমি সঙ্কোচে এবং ভয়ে সিটিয়ে গিয়েছি! সর্বনাশ! শেষ পর্যন্ত তাই যদি হয়, তা হ'লে তো মুখ দেখাবার জো থাকবে না! মনে মনে কাতরকণ্ঠে বললাম, হে বাবা বিশ্বনাথ! রাগ ক'রো না বাবা। তোমার পূজো হাজার এক টাকাতেই দোব। ও দুর্ঘটনা যেন ঘটিয়ো না।

খাম থেকে কোন রকমে টেলিগ্রামটা খুলে বার ক'রে তার ওপর দৃষ্টিপাত মাত্র মেজদাদার উত্তেজনাদীপ্ত মুখ সীসের মতো পাংশু হয়ে গেল। আর্তনেত্রে আমার দিকে তাকিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, "তুমি পাস হয়েছ।"

লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল। ও-রকম প্রত্যাশার মুখে আইন পাস করার মতো এত বড় অপকর্ম আমার পূর্বে বোধ হয় কেউ কখনো করে নি।

বেদনাহত কণ্ঠে মেজবউদিদি বললেন, "লটারির টেলিগ্রাম নয়?"

মুখে উত্তর না দিয়ে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে মেজদাদা জানালেন, লটারির টেলিগ্রাম নয়। তখন তিনি টেলিগ্রামের রসিদের স্লিপে সই করছেন।

দুঃখের স্তূপে পাসের আনন্দ চাপা প'ড়ে গেছে। আমাকে অভি-নন্দিত করবার জন্যে সকলেরই মন তখন বহু পশ্চাতে প'ড়ে।

আকস্মিক মুখে আমার প্রতি দৃষ্টিপাত ক'রে মেজবউদিদি বললেন, "যা! সব ফুস্ হয়ে গেল!"

ফুস্ ব'লে ফুস্! এত বৃহৎ ক্ষতিকর ফুস্ আমাদের সংসারে আর কোনোদিন ঘটে নি। চল্লিশ লক্ষ টাকার ফুস্!

আঘাত পাবার তখনো কিছু বাকি ছিল। রসিদের স্লিপ ফিরিয়ে দিয়ে এসে চাকর বললে, "খুশ-খবরের জন্যে পিয়ন বকশিশ চাচ্ছে।"

মনে মনে বললাম, হে মা ধরিত্রী, তুমি দ্বিধা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। এ যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে!

এক টাকা বকশিশ দেবার আদেশ দিয়ে মেজদাদা আমাদের সকলের মনের ঐকান্তিক কথাটি ব্যক্ত করলেন, "এর চেয়ে লটারির টেলিগ্রাম এসে তুমি ফেল হ'লে বেশি খুশি হতাম।"

তাতে আর সন্দেহ আছে! আমি বোধ হয় সকলের বেশি হতাম!

হরিষে বিষাদের অভিজ্ঞতা জীবনে আরও হয়েছে, কিন্তু এত আকস্মিক ও তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা আর কখনো হয় নি।

॥ তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥